

ହୀମାଂଶୁ ମିଠା



ହୀମାଂଶୁ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

সত্যের সন্ধানে

৫১ পীঠ

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

pathagar.net
850

দীপ প্রকল্পনা

১৪বি, বঙ্গিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

SCARRED BY
DAKERYS



MOTHER OF
DRAGONS

51 PITH
by
Himansu Chattopadhyay

গ্রন্থস্বত্ত্ব : সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়

ছবি
সিন্ধা স্টুডিও, সাঁইথিয়া
কিছুক্ষণ স্টুডিও, লাভপুর
গোপাল দেবনাথ
ইন্ডোনেশ ব্যানার্জী
অনিবাগ সেন
অন্যান্য ছবি : সংগৃহীত

কৃতজ্ঞতা
রামেন্দ ইকবাল, বাংলাদেশ
দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদ
নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেতুগ্রাম
সীপিকা ভট্টাচার্য, কলকাতা
মষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৬ • প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

পরিবর্ধিত সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১০

সংযোজিত সংস্করণ : জুন ২০১১

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১২

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সংরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

দাম : ১৫০ টাকা

উৎসর্গ

কুলকুণ্ডলিনী নামে একটা অংশ আমাদের শরীরের
মধ্যেই থাকে বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যার সন্ধান পাওয়া
খুবই কঠিন ব্যাপার। আমার জ্ঞান হ্বার পর দেহের মধ্যে
লুকিয়ে থাকা এই দুর্ভ বস্ত্র সন্ধান করার তাগিদ যিনি
আমার মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন—

সেই স্নেহময়, বহু দুরদর্শী পিতা
°বেণীমাথৰ চট্টোপাধ্যায়কে

pathagar.net

এই পর্যায়ে বই-এর কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না যদি না বাংলাদেশের রাসেদ
ইকবাল, মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত দিলীপ ভট্টাচার্য, কেতুগ্রামের কালো
মায়ের পুরোহিত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক মষ্টীপদ চট্টোপাধ্যায় সক্রিয়ভাবে
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।

পরিশেষে, আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শঙ্কর মণ্ডলের কাছে।
তিনি এই বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে উদ্যোগী না হলে অধরাই থেকে যেত এই গৃহ
তথ্যানুসন্ধানের প্রচেষ্টা।

স্থান : কলকাতা

২১ নভেম্বর, ২০০৯

বিনীত

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

pathagar.net

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

যেদিন শুনেছিলাম একান্নটি সতীপীঠের কথা, সেদিন থেকেই ভাবতে শুরু করেছি সৃষ্টির এই বিচিত্র রহস্য। ১৯৮২ সালে একটি বিশেষ কাজে গিয়েছিলাম গুয়াহাটিতে। এক পড়স্ত বিকেলে প্রথম গিয়েছিলাম সতীপীঠ কামাখ্যায়। সেদিন মা-কে স্পর্শ করতেই শিহরণ জেগেছিল সারা শরীরে। বুবলে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে মা সেখানে ‘স্ব’শরীরে অবস্থিত। তারও অনেকদিন আগে জানি না কিসের টানে গিয়েছিলাম বীরভূমের কঙ্কালীতলায়। শেষ সতীপীঠ। এখানে নাকি সতীর শেষ দেহথঙ্গ কাঁকাল অর্থাৎ কঙ্কাল পড়েছিল। জানি না, এ-সব কথার কোনও ভিত্তি আছে কিনা। কিন্তু যুগ যুগ ধরে যা শোনা যায়, তার কি কোনও সারবস্তু নেই? আছে বৈকি, তা না হলে আজও কেন অগণিত মানুষ ছুটছে অজানাকে জানা তথা অচেনাকে চেনার সন্ধানে। আমিও একই প্রশ্নের উত্তর ফৌজার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছি কয়েক দশক ধরে। সতীপীঠের অনুসন্ধান করার সময় ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়েছে অনেক মানুষের সঙ্গে। সতীপীঠ তথা দেব-দেবীর সমষ্টকে তাঁদের ধারণা এতই দৃঢ় যে তা দেখার পর আমার মনও ক্রমশ সংশয়মুক্ত হচ্ছে। সেই বিশ্বাস আর উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করেই এই প্রতিবেদন আমার প্রিয়-পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে নিবেদন করছি।

পীঠ শব্দের অর্থ হল আসন। দেবী যেখানে অসীম সোটাই হল পীঠ। তবে তন্ত্রমতে সবপীঠই সতী-পীঠ নয়। অনেক জায়গায় দেবীর মন্দিরের চৌহন্দির মধ্যে সিদ্ধিলাভ করেছেন অনেক সাধক-সাধিক। কালক্রমে তা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে হতে খ্যাতিলাভ করেছে। সেইসব জায়গা পীঠ হিসেবে পঞ্জিচিতি পেলেও একান্নটি নির্দিষ্ট পীঠের মধ্যে অনেকগুলি চিহ্নিত হয়নি। কারণ, সেখানে সতীর কোনও অঙ্গ পড়েনি।

দেবী ভাগবতে একশ অটটি পীঠের বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু অবশ্যই সব ক্ষেত্রে দেবীর কোনও অঙ্গ পড়েনি। অবশ্যই জানতে ইচ্ছে করে, কিভাবে তৈরি হয়েছে একান্নটি সতীপীঠ। শোনা যায়, দক্ষ্যজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের পর তাঁর দেহ কাঁধে (মতান্তরে মাথায়) করে নিয়ে মহাদেব উচ্চান্তের মতো সারা পৃথিবী নৃত্য করে বেড়াতে শুরু করলেন। একসময় মনে হল, সৃষ্টি বুঝি রসাতলে চলে যাবে। ধৰংস হয়ে যাবে ত্রিভুবন। তখন এই মহাপ্লয়ের হাত থেকে ত্রিভুবনকে রক্ষা করার জন্য সবাই শরণাপন্ন হলেন ভগবান বিষ্ণুর। সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। একসময় ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শনি সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটতে থাকেন।

স্বাভাবিক ভাবেই সেইসব খণ্ড ছড়িয়ে পড়ে নানাদিকে। এ নিয়ে অনেক মতান্তর আছে। একটি মত হল, স্বয়ং মহাদেব নাকি তাঁর প্রিয়তমার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটার পর তা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন প্রান্তের। মতান্তর যাই হোক না কেন, সতীর দেহের অংশ যেখানে যেখানে

পড়েছে সেখানেই তৈরি হচ্ছে সতীপোঁ। পুরাণে আছে, স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ড করে ফেলেন।

মহাভারতে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে কিন্তু মহাদেবের স্তু সতী দক্ষরাজের মেয়ে হিসাবে বর্ণিত হননি এবং দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগও করেননি। বিজ্ঞনের মতে, চতুর্থ শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের সময়কালে দক্ষযজ্ঞের কথা মানুষের মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। ব্রহ্ম পুরাণ, মৎসপুরাণ, কর্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণে দক্ষযজ্ঞের উল্লেখ আছে। দক্ষযজ্ঞ এবং সতীর দেহত্যাগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, দেবী ভাগবত ও কালিকা পুরাণে।

প্রাচীন তত্ত্বাতে চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। এগুলি হল, জলঙ্কর, উড়ৌয়ান বা ওডিয়ান, পূর্ণগিরি বা পূর্ণশৈল ও কামরূপ (প্রাণ তোষিণী তত্ত্ব)। বৌদ্ধতত্ত্বেও (হে বস্তু তত্ত্ব) চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। কোনও কোনও বৌদ্ধগ্রন্থে (সাধনমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৩) জলঙ্করের পরিবর্তে শ্রীহট্ট, বা সিরি হট্টের উল্লেখ করা হয়েছে। তত্ত্বসারের এক জায়গায়, জলঙ্কর-কামরূপ-শ্রীহট্ট-উড়ৌয়ান এবং পূর্ণগিরি, এই পাঁচটি পীঠের উল্লেখ আছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন তত্ত্বে বিভিন্ন পীঠের সঙ্কান পাওয়া যায়। যেমন, তত্ত্বসারে উল্লেখ আছে একান্নটি পীঠের। কুজিকাতন্ত্র বিয়ালিশ, পীঠ নির্ণয়-একান্ন এবং শিবচরিতে একান্ন পীঠের উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে ছারিশিটি উপপীঠেরও সঙ্কান পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, শক্তি পীঠের উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনীর সঙ্গে প্রায় অবিকল এক কাহিনীর সঙ্কান পাওয়া যায় মিশের দেশে। সেখানে ওসাইরিসের ভাই সেথ ওসাইরিসের আস্তিগুলি দেশের দূর দূরান্তের ছড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে মিশের মন্দিরগুলিতে ওসাইরিসের যে-সব দেহাবশেষ দেখানো হত, বলা হত সেগুলি তার অস্তি।

কালিকাপুরাণের চতুর্তিংশোহধ্যায়ে মার্কণ্ডেয় মূনির মাধ্যমে জানা যায়, একসময়ে ঘটেছিল মহাপ্রলয়। পরমেশ্বর বিষ্ণু, প্রলয়-ব্রেগ-নিবৃত্ত হইলে কুর্মরূপ ধারণ করে পর্বতের সহিত পৃথিবীকে পৃতে গ্রহণ করত উন্নত অবনতি দেশসকল সমান করলেন। শরত এবং বরাহের যুদ্ধ কালে পৃথিবীর যে সকল দেশ বিদ্যুৎ হইয়াছিল, সেইসকল দেশকেও সমভূমি করিলেন। এই প্রকারে সকল দেশ সমভাগে পরিণত হইলে ভগবান বরাবর অনন্তকে কুর্মরূপে ধারণ করিলেন। তদন্তের ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, মনু সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং দক্ষকে সম্মোধন করত নরনারায়ণের উদ্দেশে বলিলেন,—হে মহাজ্ঞাগণ, বরাহ এবং শরতের যুদ্ধে সৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়াছে, পুনর্বার যে রূপে সৃষ্টি করিতে হইত তাহা শ্রবণ কর। ...স্বয়ংস্তুব মনো! তুমি ধ্রাতলে বীজ বপন কর; পৃথিবীও সকলদিকে শসা-রাশিতে পরিপূর্ণ হউন। ওষধি লতা বৃক্ষ বক্ষী প্রত্তি নানা জাতীয় উদ্ভিজ্ব বসন্ত রোপণ কর। দক্ষ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল, ইহাদের অমৃত সদৃশ ফলদ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরিকে তৃপ্ত করুন এবং যজ্ঞ-বরাহের পুত্রদেহ হইতে উৎপন্ন অগ্নিগ্রায় দ্বারা যজ্ঞ করুন।

কালিকাপুরাণের চতুর্তিংশোহধ্যায়ে আরও উল্লেখ করা আছে দক্ষের উদ্দেশে:

মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন, দক্ষ-যজ্ঞীয় বৃক্ষ এবং লতা শয্যাদি সকল সম্যাকরণে উৎপন্ন এবং দিকপাল দেবগণ পৃথক পৃথক রূপে প্রতিপন্ন হইলে কশ্যপ, অতি, বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র, গৌতম, জমদগ্ধি, ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষিমণ্ডলকে সদস্যরূপে পরিগণিত করিয়া দাদশ-বৎসর-সাধ্য জ্যোতিস্টোম নামক মহাযজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ অগ্নিত্রয়কে বারংবার হোমদ্বারা আরাধনা করিলে এবং বরাহদেব যজ্ঞদ্বারা আরাধিত হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুন্দ এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি হইল। তদন্তের দক্ষ, পুত্র-গৌত্রাদিত্রিমে প্রজাবিস্তারে ছায়-রূপ-স্তন-প্রভৃতি সুলক্ষণ সম্পন্না হয়ে দশটি কল্যাণ সৃষ্টি করিলেন এবং মহাজ্ঞা মুনিকে ত্রয়োদশ সম্প্রদান করিলেন।

কশ্যপের ওরসে দক্ষের ত্রয়োদশ কল্যাণ গর্ভ সত্ত্বত প্রজাপতিই সকলের জনক। উক্ত পুত্রগণ মাতৃ-নামেই প্রসিদ্ধ হইল। এরাই অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, প্রবা, বরিষ্ঠা, বিনতা, কপিলা, কদ্র—এই ত্রয়োদশ দক্ষকল্যাণ জগৎ বিখ্যাত।

প্রসঙ্গত জানা যেতে পারে, দক্ষের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? কালিকাপুরাণের উল্লেখ অনুযায়ী, ব্রহ্মার ধ্যানকালে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় স্বর্গে-মর্ত্যে তিনি দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হন।

কশ্যপের ওরসে দক্ষকল্যাণ অদিতির গর্ভে ধাতা, মিত্র, অর্যামা, শুক্র, বরুণ, সোম, ভগ, বিবস্তান, পৃষ্ঠা, সবিতা, তৃষ্ণা—এই বারোজন জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠজন সূর্যালোকে নিজ কিরণ বিস্তার করতে থাকেন এবং তাঁর বংশই বেশি সম্প্রসারিত হয়। দক্ষের দ্বিতীয় কল্যাণ দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু নামে এক বলবান ছেলে জন্মগ্রহণ করে। এই হিরণ্যকশিপু-র চারাটি ছেলে— প্রহুদ, সংহুদ, বাস্তুল এবং শিবি। প্রহুদের তিন ছেলে— বিরোচন হল জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ দুজন— কুস্ত ও নিকুস্ত।

বিরোচনের ওরসে বলি নামে এক ছেলের জন্ম হয়। যাঁকে মহান দাতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বলির ছেলের নাম বনি। তিনি মহাবলী ছিলেন বনিকে স্বয়ং মহাদেব থাইয়ে দাইয়ে লালনপালন করতেন। হয়ত সেই কারণে বনিকে বলা হয় মহাকাল।

দক্ষ প্রজাপতির তৃতীয় কল্যাণ দনু-র গর্ভে বিষ্ণু, চিত্তি, শশ্বর, নমুচি, পুলোমা, অসিলোমা, কেশী, দুর্জ্যম, অয়ঃশিরা, অশশীয়, ক্ষয়, শঙ্খ, বিয়নমূর্ধা, বেগবান, কেতুমান, সূক্ষ, তুরুণ, নহষ, উর্বরবাহ, একচক্র, বিরুপক্ষ, হুর, অহর, নিশ্চিক্র, অঘচক্র, কুপট, চপট, সুরভ, শালভ, দিবাকর ও নিশানাথ এই চাহিশজন মহাবলশালী ছেলের জন্ম হয়। দক্ষের চতুর্থ মেয়ে দনায়ুর বীরভদ্র, বীক্ষ্ম, রস এবং বৃত্ত নামে মহাপরাক্রমশালী চারাটি ছেলের রূপ-গুণ-বল সমন্বিত একশটি করে ছেলে হয়। দক্ষের পঞ্চম মেয়ে কলার গর্ভে বিনাশন, ক্রোধ, ক্রোধ-হস্তা ও ক্রোধশক্তি নামে চারাটি ছেলের জন্ম হয়।

ষষ্ঠ মেয়ে সিংহিকার গর্ভে চন্দ্ৰ, সূর্য, বিমদ্দন, রাত্র, সুচন্দ্ৰ, চন্দ্ৰহস্তা, চন্দ্ৰ বিম দুর্গের জন্ম হয়। সপ্তম মেয়ে ক্রোধার গর্ভে ক্রোধ-বশ ত্বুরকর্মা এবং বিমদ্দনের উৎপত্তি হয়।

দক্ষের মেয়েদের মধ্যে ক্রোধ-বশ ত্বুরকর্মা এবং সিংহিকা—এই দুজন অত্যন্ত ত্বুর— তাই এদের গর্ভে যাদের জন্ম হয়, তারাও মাতৃদোষে ত্বুর হয়েছিল।

দক্ষের অষ্টম মেয়ে বিনতার গর্ভে তাৰ্ক্য অরিষ্ঠ নেমি অনুর গড়ুর অৱণ এবং অৱণদের জন্ম হয়।

নবম মেয়ে রূদ্রের গর্ভে অনন্ত, বাসুকি, ঈশ, তক্ষক, কুলিক, কৃম্ব সুমনাদের জন্ম হয়।

দক্ষকল্যাণ বরিষ্ঠার গর্ভে ভীমসেন, উগ্রসেন, সূর্পণ, গরুড়, গোপতি, ধৃতরাষ্ট্র, সূর্য, চন্দ্ৰ পুষ্টবান অৰ্কণ্পৃষ্ঠ, প্রমুক্ত, বিশ্রুত, সুশ্রুতি, ভীম, চিত্ররথ, বিখ্যাত, সৰ্ববিশ্ব, বলী, শালিশীৰ্ষ, পজ্জন্য,

কলি এবং নারদের জন্ম হয়। এন্দেরই কেউ দেব, কেউ গন্ধৰ্বতে পরিণত হন।

দক্ষ প্রজাপতির দ্বিতীয় মেয়ে দিতি—অনবদ্যা, সানুরাগা, সমুরা, মাগণী, প্রিয়া, অসূয়া, সুভগ্না, ভীমা—এই আটটি মেয়ের জন্ম দেন।

দক্ষের দশম মেয়ে প্রধান গর্ভে কশ্যপ ঔরসে বিশ্বসু, সুচন্দ, সুপর্ণ, সিদ্ধি, বর্হিঃ, পূর্ণ, পূর্ণাঙ্ক, ব্ৰহ্মাচারী, রতিপিয় এবং ভানু নামে দশটি ছেলের জন্ম হয়।

দক্ষের মেয়ে—অলমুষা, মিশ্রকেশী, গামিনী, মনোরমা, বিদ্যুৎপৱা, রস্তা, অকুণা, রক্ষিতা, তুলা, সুবাহ, সুরতা, তিলোত্মা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অঙ্গরাদের জননী। অতিবাহ, তুম্বুরু, হাহা, হহ ইত্যাদি নামের গন্ধৰ্বশ্রেষ্ঠেরা প্রধার ছেলে।

মার্কণ্ডেয় মুনি জানিয়েছেন, দ্বাপরের শৈষদিকে শোণিতপুরে বাগ ও সুরে বনি নামে অসুরের জন্ম হয়। বন্ধু ছিলেন শিব। বলিপুত্র এই মহাত্মা ক্রমে প্রবল প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন এবং নরক রাজার সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। একসময় বাগ মহাদেবকে আরাধনা করে অকুতোভয়ে অসুরের মতো বিচরণ করতে থাকে। তাঁর সংসর্গে নরকও একই ধরনের আচরণ করতে থাকেন।

একদিন কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন বশিষ্ঠ মুনি। কিন্তু নরক তাঁকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেননি। তখন মুনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, তুই যাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিস, মানুষের রূপ ধারণ করে সেই মহাত্মা তোর বিনাশ করবেন। তুই যতদিন জীবিত থাকবি, ততদিন জগজ্জলনী কামাখ্যা এখান থেকে অস্তর্ধান করবেন।

এরপর রাজ্য নামে ঘোর অঙ্গকার। একসময় নরক বুঝতে পারলেন, ব্ৰহ্মশাপে তাঁর মৃণ খুব কাছে এসে গেছে। তিনি তখন ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুত্র। নরক সমস্ত পরিস্থিতির কথা দৃতমারফৎ জানালেন বলিপুত্র বাগকে। তিনি নরককে বললেন, এই পৃথিবীতে মানুষ, দানব, অসুর, রাক্ষস, কিম্বর কেউ ঐশ্বর্যশালী হবেন—ইন্ত তা কিছুতেই সহ্য করবেন না। তাদের মনমতো দেবতা নিত্য সনাতন বিষ্ণু। তাই তাঁর আরাধনা করলেও ইন্ত ও বিষ্ণু কখনই তার অন্যায় বৰদাস্ত করবেন না।

কালক্রমে নরকের চারটি ছেলে হয়। এন্দের নাম হল, ভগদন্ত, মহাশীর্ষ, মদবান ও সুমালী। বশিষ্ঠ মুনির শাপের পর নরক প্রাথমিকভাবে মুষড়ে পড়লেও পরে তিনি অনেককে সংঘবদ্ধ করে দেবতাদের উৎপীড়ন শুর করেন। এমনকি তারা ইন্দ্র ও অন্যান্য মুনিদেরও পীড়ন করতে থাকেন। এইসব অসুরদের মধ্যে অত্যন্ত বলবান হিসেবে পরিচিত ছিলেন, বলিপুত্র বাগ, বীর কংস, ধেনুক, অরিষ্ঠ, প্রলম্ব, মল্লচাণুর, জরাসন্ধ, নরক, সুগ্রীব, নিসুন্দ, সুন্দ, বিরুপাক্ষ, পঞ্চজন, হিডিপ্স, বক, জটাসুর, কিশীর, অনাযুধ, অলমুষ, গৌত, শ্রতযুধ, ঘৰাশৃঙ্গপুত্র সুবাহ, অতিবাহ, হিরণ্যপুরনিবাসী, কালকঞ্জ প্রমুখ।

এই অবস্থায় ভগবান অসুরদের হাত থেকে জগতকে মুক্ত করতে স্বয়ং দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। দেবতারা সনাতন হারি অবতীর্ণ হয়েছে শুনে, রস্তা, তিলোত্মার মতো রূপ ও গুণসম্পন্ন ঘোড়শ সহস্র স্ত্রী উৎপাদন করেন। তাদের হরণ করে ভূমিপুত্র নরক প্রাগজ্যোতিষপুরে নিয়ে আসেন। এর মধ্যে বিষ্ণু, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নন্দগৃহে বড় হচ্ছিলেন। তিনিই বিনাশ করেন কংস, কেশী ও প্রলম্বের মতো দৈতাদের।

পুরাণের ঋষিদের মতো আমরাও জানার জন্য সচেষ্ট হব, কৌতাবে জগৎপ্রসবিনী কালী

দাক্ষায়ণী গিরিসূতা হলেন? কীভাবে তিনি মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন? কী জন্যই বা তিনি পিনাকীর অর্ধ শরীর গ্রহণ করেছিলেন?

মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন, যে সময় দক্ষকল্যা সতী শিবসহ হিমালয়ে খেলা করেছেন, সেইসময় মেনকা তাঁর হিতৈষিণী ছিলেন। তাই আমি তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করব, একথা মনে করে সতী প্রাণত্যাগ করে হিমালয়সূতা হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সময়ে দাক্ষায়ণী দক্ষের প্রতি কোপে পড়ে প্রাণত্যাগ করেন সেই সময়ে মেনকা, শিবকে আরাধনা করতেন।

মহামায়া জগন্মাত্রী সনাতনী যোগনিদ্রাস্থরূপা সর্বভূতমোহিনী সর্বলোকের শরণ সেই জগদস্থাকে চৈত্রমাসের অষ্টমীতে উপবাস করে নবমীতে মোদক, পিষ্টক, পায়েস, ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সপ্তবিংশতি বছর পর্যন্ত পুত্র কামনা করে মেনকা প্রত্যহ পুজো করতেন।

গঙ্গাতে মৃগায়ী মূর্তি তৈরি করে কোনওসময় নিরাহারে, কোনওসময় মহামায়াতে মন অর্পণ করে সপ্তবিংশতি বছর পর্যন্ত মেনকাদেবী তাঁর পুজো করেছেন। এইভাবে পুজো করার সময় একদিন জগন্মাতা মহামায়া তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, তুমি যা প্রার্থনা করছ আমি তা প্রৱণ করব। তখন মেনকাদেবী প্রত্যক্ষভাবে কালীরূপ দেখে প্রণাম করলেন। দেবী তখন আশীর্বাদ করে মেনকাকে বলেন, তুমি তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। মেনকা প্রথমে বীর্যবান, আযুস্মান এবং ধনসম্পদ শত পুত্র প্রার্থনা করেন। তার পরে সূর্যপ ও গুণশালিনী কুলদ্বয়ের আনন্দরূপা ও ত্রিভুবন-দুর্ঘাতা একটি কল্যাণ প্রার্থনা করেন। সেই প্রার্থনা শুনে দেবী বললেন, তোমার বীর্যবান একশটি ছেলে হবে। তার মধ্যে প্রথম ছেলে অত্যন্ত বলবান হবে। দেবতা, রাক্ষস ও মানুষের তথ্য জগতের হিতের জন্য আমি তোমার মেয়ে হয়ে জন্মাব। তুমি নিত্য, সুখপ্রসবা, নিত্য পত্রিতা এবং অল্লান-রূপ-সম্পন্না ও সুভগ্না হবে। একথা শুনে মা জগন্মাত্রী অন্তর্ধান করলেন। তারপর কালক্রমে মেনকাদেবী মৈনাককে প্রসব করেন। তারপর জগন্মায়া যোগনিদ্রা কালিকা আগের সতীদেহ ত্যাগ করে আবার জন্মের জন্য মেনকার কাছে যান। সেই পূর্বসূর্যেই দেবী বসন্তকালে মৃগশিরা নক্ষত্রে নবমীতে মাঘারাতে জন্মগ্রহণ করেন।

হিমালয় তাঁকে ‘কালী’ ও বস্তুরা ‘পার্বতী’ নাম রাখেন। একসময় নারদ স্বর্গ থেকে সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি গিরিরাজ হিমালয়কে বলেন, এই মেয়েকে শিব ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা ভাববেন না। এটা অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। এমনকি দেবতাদের কাছেও একথা প্রকাশ করবেন না। তিনি আরও জানান, আপনার মেয়েই হলেন সতী। এ বিষয়ে কোনও সংশয়ই নেই যে তিনি শিবের জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সতীপীঠগুলির উন্নত কি করে হল তার উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে, দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের পর তাঁর দেহ কাঁধে করে মহাদেবে উন্মত্তের মতো সারা পৃথিবী নেচে বেড়াতে লাগলেন। একসময় রসাতলে যাবার উপক্রম হয় সৃষ্টির। এই ধ্বংসের হাত থেকে সৃষ্টিকে বাঁচানোর জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন বিষ্ণু। ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শনি সতীদেহে প্রবেশ করে তা খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলেন। কোনও কোনও মুনিশ্বারির মতে, স্বয়ং মহাদেব নাকি সতীদেহ কাটার সময় সে ব্যাপারে তৎপরতা দেখান। যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাবিশ্বের চক্র দিয়ে কেটে মহাদেবী সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে সব জায়গায় ফেলেছিলেন, ব্ৰহ্মজ্যোতি স্বরূপিণী জগন্মাতা ভক্তদের মুক্তি ও সাধকদের সিদ্ধির জন্য পাথরের

মূর্তি ধারণ করে নিত্য পূজিতা হচ্ছেন। শিবও প্রতিটি ক্ষেত্রে ভৈরব হিসেবে উপস্থিত। সাধক মনমোহন বলেছেন,

**দেহের সর্ববিদ্যা সকল দেবতা
সর্বতীর্থ বিরাজিত আছে মাতা পিতা।।**

কুন্দ্রযামলতঙ্গে দশটি প্রধান পীঠের স্থান উল্লেখ করা আছে। (১) মেরুদণ্ডমূলের মূলধারাচক্রে রামরূপ পীঠ (২) হৃদয়ে জলঞ্চর পীঠ (৩) ললাটে পূর্ণগিরি, (৪) তার সামান্য ওপরে উজ্জীয়ান পীঠ (৫) লুদ্ধয়ের মধ্যে বারাণসী (৬) নয়নত্রয়ে জ্বালামুখী, (৭) মুখবিবরে মায়াবতী (৮) কঠে মধুপুরী বা মথুরা (৯) নাভিদেশে অযোধ্যা এবং (১০) কাঞ্চীপীঠ। ‘তন্ত্রসারে’ দেহের একান্নটি দেবীপীঠের যে ভাবনা আছে তা হল (১১) মূলাধারে কামরূপ (২) মুখবৃত্তে বারাণসী, (৩) ডান চোখে নেপাল (৪) বাঁ চোখে পৌন্ড্রবর্ধন, (৫) ডান কানে কাশ্মীর (৬) বাঁ কানে কান্যকুজ (৭) ডান নাকে পুরস্থিত (৮) বাঁ নাকে চরস্থিত (৯) ডান গালে পূর্ণশিল (১০) বাঁ গালে অর্বুদ (১১) ওষ্ঠে আশ্রাতকেশ্বর (১২) অধরে একাশ (১৩) উপরের দাঁতে ত্রিশ্রোত (১৪) নীচের দাঁতে কামকোট্টি (১৫) ব্রহ্মরঞ্জে কৈলাস (১৬) মুখে ভৃগু (১৭) ডান বাহ্যমূলে কেদার (১৮) ডান কল্পুইতে (কৃপর) চন্দ্রপুর (১৯) ডান মনিবঞ্চে শ্রী, (২০) ডান অঙ্গুলি মূলে ওকার (২১) ডান অঙ্গুলির অগ্রভাগে জলঞ্চর (২২) বাম বাহ্যমূলে মালব (২৩) বাম কল্পুইতে কুলান্তক (২৪) বাঁ মনিবঞ্চে দেবীকোট্টি (২৫) বাম অঙ্গুলিমূলে গোকৰ্ণ (২৬) বাম অঙ্গুলির অগ্রভাগে মারুতেশ্বর (২৭) দক্ষিণ পাদমূলে অট্টহাস (২৮) দক্ষিণ জানুতে বিরজ (২৯) ডান গুলফে রাজগৃহ (৩০) ডান পদাঙ্গুলিমূলে কোষগিরি (৩১) ডান অঙ্গুলির অগ্রে এলাপুর (৩২) বাম পাদমূলে কামেশ্বর (৩৩) বামজানুতে জয়ন্তী (৩৪) বামগুলফে উজ্জয়িনী (৩৫) বাম পাদাঙ্গুলিমূলে ক্ষীরিকা (৩৬) বামপাদঙ্গুলির অগ্রে হস্তিনাপুর (৩৭) ডান পাৰ্শ্বে উজ্জীশ (৩৮) বাম পাৰ্শ্বে প্রয়াগ (৩৯) পিঠে বিষ্ণু (৪০) নাভিতে মায়াপুর (৪১) উদয়ে জলেশ্বর (৪২) হৃদয়ে ঘলয় (৪৩) ডান কাঁধে শৈল (৪৪) ক্ষক্ষের ঝুঁটিতে (কুকুদ) মেরু (৪৫) বামক্ষকে গিরি (৪৬) হৃদাদি ডান করে মহেন্দ্র (৪৭) হৃদাদি বাম করে বামন (৪৮) হৃদাদি ডান পায়ে হিরণ্যপুর (৪৯) হৃদাদি বামপদে মহালক্ষ্মীপুর (৫০) হৃদাদি উদরে উজ্জীয়ান (৫১) হৃদাদিপুরে ছায়াছত্রপুর পীঠ।

শ্রীমদ্বাগবতে (৪৬ স্কন্দ-২-৪ অধ্যায়) উল্লেখ আছে, একদা বিশ্বস্তাদের যজ্ঞে সমস্ত দেব ও ঋষিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হন দক্ষ প্রজাপতি। তিনি আসায় দেবতা ও ঋষিরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানালো এবং শিব কিন্তু তাঁর জ্যাগায় বসে থাকেন। নিজের জামাই-এর এহেন আচরণে দক্ষ প্রজাপতি শিবের নিন্দা করেন ও অভিশাপ দিয়ে বলেন, ওই ব্যক্তি যেন যজ্ঞের ভাগ না পায়। সেই ক্ষেত্রের ওপর ভিত্তি করে দক্ষ, শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেন। ওই যজ্ঞে সব দেবতা ও ঋষিদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও নিম্নলিখিত করা হয়নি শিব ও সতীকে। বাপের বাড়িতে যজ্ঞ হচ্ছে শুনে সতী সেখানে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে সেখানে যেতে বারণ করেন শিব। কিন্তু একসময় সতী বাপের বাড়ি যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে শুরু করেন।

ভাগবতে বলা হয়েছে, সতী এই সময় দশমহাবিদ্যা রূপ দেখিয়ে তাঁর স্বামীকে হতচকিত করে দেন। তিনি তাঁর স্বামীকে বলেন, হে শিব, আমি সৃষ্টিস্থিতি সংহারকারণী সৃষ্টা প্রকৃতি। পূর্ব স্বীকৃতির জন্য পুরুষকূপী তোমাকে পেতে ইচ্ছুক হয়ে তোমার পত্নী হ্বার জন্য গৌরদেহ ধারণ করেছি। সেই আমিই এখন পিতার মহাযজ্ঞ বিনাশ করার জন্য ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করেছি। হে মহেশ্বর তুমি ভয় পেয়ো না। এই ভয়ঙ্করী দশমূর্তি ওঁরা সবাই আমারই স্বরূপ। তোমাকে মহাভিত্তিচিত্তে দশদিকে ধাবিত হতে দেখে আমি দশদিক নিবারণ করে দশরূপে নিবারণ করছি।

তিনি মহাদেবকে বলেন, আমি তোমার সতী। তুমি আমার অতি প্রিয়। আমি পিতা দক্ষ প্রজাপতির দর্পনাশের জন্য সন্তুর সেখানে যাব। তুমি নিজে সেখানে না গেলে, আমায় যাবার অনুমতি দাও। প্রত্যন্তে শিব বলেন, তুমি যে পূর্ণা পরমা প্রকৃতি তা আমি জানি। তুমি আদ্যা, পরমা বিদ্যা, তুমি সর্বভূতে অবস্থিতা, তুমি স্বতন্ত্র পরমাশক্তি। তুমি দক্ষ্যজ্ঞে যেতে চাইলে আমার এমন কোনও শক্তি নেই যে তোমায় আটকাতে পারি, হে মহেশানি, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।

সতী যজ্ঞস্থলে পৌছে বাবার কাছে জানতে চান, তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে এই যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি কেন? দক্ষ বলেন, শিবের বেশভূষা রুচিসম্মত নয়। তিনি সবসময় ভূত পিশাচদের সঙ্গ করেন। তাঁর অনুচরেরা সবসময় নশ অবস্থায় থাকে। তাই তাঁর স্বামীকে নিমন্ত্রণ করলে সব দেবতা ও ধায়দের সামনে তাকে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। দক্ষ বলেন, সতীকে ব্রহ্মার অনুরোধে যখন আমি শিবের কাছে সম্প্রদান করি, তখন আমি জানতাম না তিনি শিবরূপী। আমি জানতাম না শিব বিরুপাক্ষ, বৃষবাহন, বিষপায়ী, শশানচারী, শূলী, নরকপালধারী, নাগসংসগ্রী ও জটাধারী। তিনি জানতেন না যে, শিখ কখনও দিগন্ধর, কখনও বা কৌপিনধারী, আবার কখনও চামড়া পরে ভিক্ষ করে বেড়ান। তাঁর জাতি বলতে কিছুই নেই। কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় জানে না। তাই যজ্ঞের মতো মঙ্গলকাজে কোনও অমঙ্গলের প্রতীককে তিনি আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না। দক্ষ প্রজাপতির এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ডে।

দক্ষ প্রজাপতির মুখে এ ধরনের পতি নিন্দা শুনে সতী বলেন, ইহলোকে যাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, কারও সঙ্গে যাঁর বিরোধ নেই, আমার স্বামীর প্রতি আপনি ছাড়া আর কে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে? দেবতারা জানেন, শিবই মঙ্গলস্বরূপ। আপনি ভগবান নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী। আপনার থেকে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হয়েছে, তা আমি আর ধারণ করব না। সিদ্ধ সাধক স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী তার 'জপসূত্রম' গ্রন্থে বলেছেন, 'দক্ষ প্রজাপতি শিবহীন যজ্ঞে (সৃষ্টিকর্মে) প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে সতীর দেহত্যাগ। শিবের স্ফক্ষে সতীশব।.... এখানে তিনিই তাণ্ডব নৃত্যপর। সৃষ্টি প্রলয়োন্মুখ। বিষ্ণু তাঁর 'সুদর্শন' চক্রে সতী অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিলেন। তাতে সৃষ্টির রক্ষা ও পালন হইল। সতী-অঙ্গ সমূহে হইল একপঞ্চাশৎ মহাপীঠ। এক পঞ্চাশৎ মাত্রকাবর্ণ জানা আছে। কিন্তু এটি এক রহস্য সংখ্যা $5 \times 10+1=51$; $2 \times 25+1=51$; $3 \times 17=51$; পাঁচে পঞ্চ মহাভূত; দশে দশধা অভিব্যক্ত প্রাণ; এবং মূলে অক্ষর বস্তু এক। পাঁচটি ভূতসৃষ্টি (তন্মাত্র), দশপ্রাণ (অথবা ইন্দ্রিয়), মন এবং বুদ্ধি (অথবা অহংকার

ও বৃদ্ধি) — এইসব মিলে ১৭। (জপসূত্রম, চতুর্থ খণ্ড ১৩৬৩ পৃষ্ঠা ২৪৬)। স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী মাতৃকার্বণে বলেছেন, সতীদেবীর পবিত্র দেহ বিষুচক্রে খণ্ডিত হয়ে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঘং, ঝং, ঙং, শং, এং এং, ওং, ঔং ইত্যাদি একান্নটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। এই একান্নটি বর্ণই হল একান্ন পীঠ।

‘সতীপীঠ পরিক্রমা’ গ্রন্থের লেখক অমিয় কুমার মজুমদার তাঁর বই—এর মুখবক্ষে লিখেছেন, শক্ররাচার্য, তাঁর আনন্দলোহীর স্তোত্রে একান্ন পীঠের তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, গঙ্গাদি, পঞ্চ তন্মাত্র, চক্র-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ত্বগাদি সপ্তধাতু, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, অহংকার, খ্যাতি (জ্ঞান), সদ্বাদি গুণত্বয়, প্রকৃতি, পুরুষ, রাগ, বিদ্যা, কলা, নিয়তি, কাল, মায়া, শুন্দি বিদ্যা, মহেশ্বর (রঞ্জোগুণাবিষ্টা সৃষ্টিকর্তা), সদাশিব (সৃষ্টিস্থিতিকর্তা), শক্তি (মহেশ্বর ও সদাশিবের রক্ষণ-সর্জনশক্তি এবং কালাঞ্চিকা সংহারিনী শক্তি) এবং শিবতত্ত্ব (শুন্দি বুদ্ধি মুক্তি স্বরূপ) ইত্যাদি একান্নটি পীঠ। ‘ললিতা সহস্র নাম’ গ্রন্থে ত্রীচক্রের মুখ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্রীবিদ্যা বা ললিতাম্বাৰ একটি নাম ‘মাতৃকার্বণরূপিনী’। কোনও যুগে সত্যি সত্যিই সতীর অঙ্গছেদ করা হয়েছিল কিনা সে নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে বা আজও চলছে। কিন্তু কথায় আছে না, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। এছাড়াও এবিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন কিছু মানসিক অনুভূতি হয়েছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। শুরু করছি, সতীপীঠ নিয়ে নানান পীঠের বিস্তৃত অনুসন্ধান।

କେନ ଏହି ବହି

ଉପନୟନେର ଦୁଃଖର ପର ଥେକେଇ ପ୍ରଥାଗତ ପୁଜୋର ବ୍ୟାପାରେ ମନ କଥନୀ ସାଯ ଦେଇନି । କିନ୍ତୁ କେମି ଜାଣି ନା, କୈଶୋର ଥେକେଇ ବିଚିତ୍ର ଟାନ ଅନୁଭବ କରତାମ ବିଭିନ୍ନ ସତୀପୀଠ ସମ୍ପର୍କେ । କୁଲେର ପଡ଼ା ଶେଷ କରାର ମୁଖେ ଏକା ଏକାଇ ଚଳେ ଗିଯେଛିଲାମ ଅନ୍ୟତମ ସତୀପୀଠ ବୀରଭୂମେର କଙ୍କାଳୀତଳାୟ । ତାରପର ଦୁଃକାର କାହେ ମ୍ୟାସାନଜୋଡ଼ ବାଁଧେର କାହେ ଏକ ଆଶ୍ରମେ ପରିଚଯ ହୁଯ କଙ୍କାଳୀତଳାୟ ଦୀଘଦିନ ସାଧନଭଜନେ ଯୁକ୍ତ ସତୀ ଦେବୀର ସଙ୍ଗେ । ସେଇସୁତ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକଭାବେ ଆଲୋକିତ ହୁଇ ସତୀପୀଠ ସମ୍ପର୍କେ । '୮୨ ସାଲେ କାଜେର ତାଗିଦେ ଗିଯେଛିଲାମ ଗୁଯାହାଟିତେ । ସେବାରଇ ପ୍ରଥମ ଗିଯେଛିଲାମ ବିଖ୍ୟାତ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରେ । ବଲା ବାହଲ୍ୟ, ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର କୁସଂକ୍ଷାର ଛିଲ ନା ମନେର ମଧ୍ୟେ । କିନ୍ତୁ ବିଚିତ୍ର ଏକ ଅନୁଭୂତି ହୁଯ ମନ୍ଦିରେ ପ୍ରବେଶ କରାର ପର । ତାରପର '୮୪ ସାଲେ କଲକାତା ବହିମେଲାୟ ପରିଚଯ ହୁଯ 'ସତୀପୀଠ ପରିକ୍ରମା' ବହିଟିର ଲେଖକ ଅମିଯ କୁମାର ମଜୁମଦାରେର ସଙ୍ଗେ । ବହିମେଲାର ମାଠେଇ ଦୀର୍ଘସମୟ ତାଁର ସଙ୍ଗେ ସତୀପୀଠ, ତତ୍ତ୍ଵସାଧନ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟେ ଆଲୋଚନା ହୁଯ । କଥନ ଜାଣିନା, ଆମାର ଅଜାଣେଇ ଶ୍ରୀ ମଜୁମଦାର ଆମାର ମନନେ ବିଚରଣ କରତେ ଥାକେନ, ଯା ଆଜଓ ବର୍ତମାନ । ତାଇ ଅକପଟେ ସ୍ଵିକାର କରତେ ଚାଇ, ଏହି ବହିଟି ଲେଖାର ପ୍ରତିଟି ଛତ୍ରେ ତାଁର ପ୍ରଭାବ ଆମାର ଓପର ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାୟ ପଡ଼େଛେ ।

୫୧ ପୀଠେର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ୱର ଇତିମଧ୍ୟେଇ ଘୁରେ ଦେଖାର ସୁଯୋଗ ହେଁବେ । କିନ୍ତୁ ଏକବାର ଗିଯେ ମନେର ଆଶା ମେଟେନି । ଏହି କାଜ କରତେ ଆର ଏକଟି ଅସ୍ତ୍ର ଘଟିଲା ଘଟିଲେ, ଯାର ସୁବାଦେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ଇଛେ ହେଁବେ, ସ୍ଵୟଂ ମା ଦୂର୍ଗା ଆମାଯ ଏହି କାଜ କରାର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେଛେ । ବର୍ଧମାନେର ଶ୍ରୀ ସନ୍ତ କୁମାର ଚତ୍ରବତୀ 'ମା ଯୋଗାଦ୍ୟ' ସମ୍ପର୍କେ ତାଁର ଦୀଘଦିନେର ସଂଗ୍ରହ ତୁଲେ ଦିଯେଛେ ଆମାର ହାତେ । ଆମାର ଦାଦା ଗୋପାଲ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏନେ ଦିଯେଛେ, 'କାଳୀକ୍ଷେତ୍ର ଦୀପିକା' ନାମକ ଦୂଷ୍ଟାପ୍ୟ ବହି । ତିପୁରାର ଖ୍ୟାତନାମା ପ୍ରକାଶକ ଗୌର ଦାସ ସାହା 'ରାଜମାଲା'ର ମତୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ବହି ଉପହାର ଦେଓୟା ସେଖାନକାର ସତୀପୀଠ ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖିତେ ଖୁବଇ ସୁବିଧା ହେଁବେ । କାଲିକାନନ୍ଦ ଅବଧୂତେର 'ମରତ୍ତିର୍ଥ ହିଂଲାଜ' ବହିଟି ଥେକେଓ ହିଂଲାଜତୀର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଲୋକିତ ହେଁବେ ।

ନିଃସମ୍ବେଦନେ ବଲତେ ପାରି, ଦ୍ୱିଷ୍ଟରେର କୃପା ନା ହଲେ ଏହି ଅସାଧ୍ୟସାଧନ କରାର କ୍ଷମତା ଆମାର ନେଇ । ବିଭିନ୍ନ ପୀଠେ ଯାଓଯା ଏବଂ ସେଥାନେ କିଛୁଦିନ ଥେକେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହେର ଜନ୍ୟ ପ୍ର୍ୟୋଜନ ପ୍ରଭୃତ ଅର୍ଥ । ଆଗାମୀଦିନେ ଏହି ବିଶାଲ ବାଧା କାଟିଯେ ଉଠିଲେ ପାରବ ବଲେ ଆମାର

মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। বুঝতে পেরেছি, এই পৃথিবীতে এখনও অনেক কিছু আছে যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা সন্তুষ্ট নয়। পীঠনির্ণয়, তস্ত্রচূড়ামণি, শিবচরিত তথা অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রহে ‘তারাপীঠ’-কে পীঠ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি। তা সত্ত্বেও মনের টানে তারাপীঠকে ‘মোক্ষতীর্থ’ হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

এই পর্বে তারাপীঠসহ দশটি পীঠের বর্ণনা দেওয়া হল।

এই কাজটি করার সময় যাদের সাহায্য আমায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তারা হলেন, রেণুকা চট্টোপাধ্যায়, সুস্থিতা চট্টোপাধ্যায়, সঙ্ঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য নন্দক, তপন ধর, সঞ্জয় সরকার, শৈলেন শীল, শিরণ সেন, অনন্ত ঘোষ, গীতিকর্ত্তা মজুমদার, জগগ্নয় মিশ্র এবং প্রসাদ পত্রিকার উপদেষ্টা তথা বর্তমান কর্তৃপক্ষের কল্পিতা বোস। এই বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি দীপ প্রকাশনকে।

পরিশেষে, যদি ইঞ্জরের ইচ্ছা হয় তাহলে এই বইটির পরবর্তী খণ্ড কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

কলকাতা-৭০০০২৬

১৭ জানুয়ারি, ২০০৬

বিনীত

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা	১
মহাতীর্থ কালীঘাট	৩০
ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরী	৫৩
মোক্ষতীর্থ তারাপীঠ	৬২
সমন্বয়ের মহাতীর্থ হিংলাজ	৭৮
করবীরপুরে দেবীর ত্রিনেত্র	৮৩
খুলনায় নারায়ণী	৮৪
লাভপুরে ফুল্লরা তীর্থে	৮৫
চৈতন্যপীঠ কঙ্কালীতলা	৮৮
সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী	৯৪
নলহাটীর নলাটেশ্বরী	৯৮
শ্বাসানতীর্থ বক্রেশ্বর	১০৪
সৃষ্টিতীর্থ কামাখ্যা	১১৩
কেতুগ্রামের বহুলা মা	১২৯
মুর্শিদাবাদে কিরীটেশ্বরী	১৩৬
মুসলমান-শিখ-হিন্দু নির্বিশেষে	১৪৩
সকলের মা দেবীবগভীমা	
প্রয়াগে দেবী ললিতা	১৫৩
জ্বালামুঝী	১৫৪
মানস সরোবরে মা দাঙ্কায়ণী	১৫৯
কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী	১৬৩
আৰ্ক্ষেত্রে প্রভু'র সঙ্গে পূজিতা হন দেবী বিমলা	১৬৭
সিলেটে মহালক্ষ্মী তৈরোবী	১৭১
জালন্ধরে দেবী ত্রিপুরমালিনী	১৭৫
নেপালে দেবী গুহ্যেশ্বরী	১৭৮
লক্ষ্মায় পড়েছিল দেবীর পায়ের নূপুর	১৮০
বাংলাদেশের বগুড়ায় অপর্ণা মা	১৮১
যশোহরে'র যশোরেশ্বরী	২০১
বালংদেশের বরিশালের শিকারপুরে উগ্রতারা	২০৩
চট্টগ্রামে দেবী ভবানী	২০৮
উত্তরবঙ্গে জয়ন্তী পীঠ	২২১

হিমাচলে চিন্তাপূর্ণী দেবী	২২৩
শিবলিক পাহাড়ে নয়নাদেবী	২২৬
উত্তরপ্রদেশে শাকস্তরী দেবী	২২৯
কুরুক্ষেত্রে সাবিত্রী মা	২৩৩
বৈদ্যনাথধামে হৃদয় পড়েছে সতীর	২৩৯
পদ্মসাগরে বারাহী	২৪১
উজ্জয়নীতে মঙ্গলচণ্ডিকা	২৪২
অমরনাথে শাক্তপীঠ	২৪৫
বৃন্দাবনে পড়েছে দেবীর কেশজাল	২৪৭
আজমীরে পড়েছে সতীর মণিবন্ধ	২৫০

pathagar.net

ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যা

বর্ধমান স্টেশন থেকে বাসে ঘন্টা দেড়কের পথ। এখানে দেবী যোগাদ্যা নিত্যপূজিতা। যষ্ঠ শতাব্দীতে লেখা কুভিকাতত্ত্বে ক্ষীরগ্রামকে সিদ্ধ পীঠ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। নেপাল রাজদরবারে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ওই তত্ত্বের যে হাতে লেখা পুঁথি পেয়েছিলেন সেখানে ক্ষীরগ্রামের নাম পাওয়া যায়। (এই ৩১৭৪ নম্বর পুঁথিটি কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাখা আছে)। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে,

ক্ষীরগ্রামং বৈদ্যনাথং জানীয়াদ্যাম লোচনে ।

কামরূপং মহাপীঠং সবর্বকাম ফলপ্রদস্ম ॥

ক্ষীরগ্রামের সতীদেহের চরণের আঙুল পড়ায় দেবীকে বলা হয় যোগাদ্যা বা যুগাদ্যা ও ভৈরব ক্ষীরকঠক। প্রাগতোবিশী তত্ত্বে উদ্ভৃত তত্ত্ব চূড়ামণিতে একটি শ্লোকে উল্লেখ করা আছে—

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকঠকঃ ।

যুগাদ্যা মা মহাদেবী দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম ॥

ব্ৰহ্মানন্দ গিরি রচিত শাক্তানন্দ তরঙ্গিনীতে গান্ধৰ্বতত্ত্বের উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায়, এটি রচিত হয়েছে ঘোড়শ শতকে। পীঠমাহগান্ধৰ্বে বলা হয়েছে—

পীঠমুজয়নী চৈব ক্ষীরকা মেৰু ।

বৃহন্নীলতত্ত্বে উল্লেখ আছে—

ক্ষীরপাঠে যুগাদ্যা চ ক্ষীরাখ্য নিয়মপ্রভা ।

রাজেশ্বরী মহালক্ষ্মী হস্তিনা পুরবাসিনী ॥

বৃহন্নীলতত্ত্বের পঞ্চম পটলে পাওয়া যায়,

জয়দশঃ জয়পুরম উজ্জয়নীপুরঃ তথা ।

হরিদ্রাপীঠকশ্চেব প্ৰিযং ক্ষীরপুৱং প্ৰিয়ম ॥

ভারতীয় যাদুঘরে রাখা পুঁথিতে উল্লেখ আছে—

ভূতধাত্রী মহাদেবী ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকভাক ।

যুগাদ্যা সা মহাবিদ্যা বিখ্যাতা ভুবনগ্রামে ॥

শিবচরিতে বলা হয়েছে—

ক্ষীরগ্রামে মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরকঠকঃ ।

যুগাদ্যাসা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম ॥

দেবী যোগাদ্যা সম্পর্কে জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ত্রেতা যুগে। তখন লক্ষায় চলছে রাম-রাবণের যুদ্ধ। রাবণের ছেলে মহীরাবণের আরাধ্যা দেবী ভদ্রকালী তথা যোগাদ্যা থাকতেন পাতালে। প্রতিদিনই দেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হত। একসময় মহীরাবণ মায়াবলে রাম এবং লক্ষ্মণকে হরণ করে পাতালে নিয়ে গিয়ে দেবীর সামনে বলি দিতে মনস্ত করেন। কিন্তু তার সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। হনুমান রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করার জন্য যুদ্ধ শুরু করলেন মহীরাবণের সঙ্গে। একসময় মহীরাবণ নিহত হলেন হনুমানের হাতে। তারপর রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করে হনুমান মা যোগাদ্যাকে মাথায় করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষীরগ্রামে। প্রবাদ আছে, দেবী স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে ক্ষীরগ্রামে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, পীঠ নির্ণয় বা মহাপীঠ বা মহাপীঠ নিরূপণম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লেখা হয়। সেখানে উল্লেখ আছে—

ক্ষীরগ্রামে মহাদেব ভৈরবঃ ক্ষীরখণ্ডকঃ।

যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠঃ পদোমম ॥

কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির ৩৪০০ নম্বর পুঁথিতে (মহাপীঠ নিরূপণম) পাওয়া যায়—

ভূতধাত্রী মহামায়া বাম পদাঙ্গুলী মম
নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষ পদাঙ্গুলী মম ॥

এশিয়াটিক সোসাইটির ১৯৬ নম্বর পুঁথিতে উল্লেখ আছে—
যুগাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠ পদৌ।

কৃষ্ণনন্দ ভট্টাচার্য আগমবাগীশের তন্ত্রসার অনুষায়ী—

তথঃক্ষীরিকা পীঠায় নমো বামপদাঙ্গুলিমূলে।

অর্থাৎ ক্ষীরগ্রামে দেবীর বাম বা ডান কোন পায়ের আঙুল পড়েছে সেই নিয়ে অনেক মতের সন্ধান পাওয়া যায়।

রামতোষণ বিদ্যালংকারের ‘প্রাণতোষণী গ্রহ্ণে’ (১৮২০ খ্রীঃ) ও ‘বাচস্পত্য পীঠে’ একই ধরনের (কুজিকাতন্ত্রের মতো) সিদ্ধপীঠের বর্ণনা আছে—

ক্ষীরগ্রামঃ বৈদ্যনাথঃ জানীয়াদ্বামলোচনে।

তন্ত্রচূড়ামণির পাঞ্চলিপিতে এবং ব্রহ্মানন্দের ‘শাঙ্কানন্দ তরঙ্গিনী’র পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে—

পীঠমুজায়নীশ্চেব বিচত্রঃ ক্ষীরিকা ভিধম্।

হস্তিনাপুর পীঠশ্চ (পুরকংপীঠং) উজ্জীৰ্ণশ্চ প্রয়াগকম্ ॥

কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারতে (২য় খণ্ড) বলা হয়েছে—

শান্তি-পর্ব-মহীরাবণ বধ

পাতাল হইতে তবে বীর হনুমান।
রাম-লক্ষ্মণ কান্দে করি করিল পয়াণ।
হেন কালে ভদ্রকালী বলেন বচন।
আমারে লইয়া চল পবন-নন্দন।।
এতেক শুনিয়া হনু হাসিয়া তখন।
মাথে করি ভদ্রকালী কান্দে দুইজন।।
লক্ষাতে আইলা রাম-লক্ষ্মণ সহিত।
দেখিয়া সকল সৈন্য হৈল আনন্দিত।।
তবে বীর হনুমান দেবীরে লইয়া।
ক্ষীরগ্রামে রাখে তারে স্থাপন করিয়া।।
তবে হনুমান আইলা লক্ষার ভবন।
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ।।

অনন্দামঙ্গলে বর্ণনা আছে—

ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভূবি
যুগাদ্য দেবতা ক্ষীরথগুক তৈরবৃ।।

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অস্তগতি^১ কৈচের রেল স্টেশনের কাছে ক্ষীরগ্রাম।
গ্রামের মধ্যে মূল মন্দিরের অবস্থান। মন্দিরের সামনে আছে প্রবেশ মণ্ডপ ও তারপরে
রয়েছে গর্ভগৃহ। মন্দিরের ছড়াটির সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে ওডিশার বিভিন্ন মন্দিরছড়ার।
মন্দিরে কোনও প্রতিমা নেই। গর্ভগৃহের দেওয়াল ঘেঁষে একটি বেদী আছে। তার মাঝখানে
রয়েছে একটি সুড়ঙ্গ মুখ। জানা গিয়েছে, আগে এই সুড়ঙ্গ মুখটি অনেক বড় ছিল। কিন্তু
অনেক সাধক এখানে সাধনা করার সময় সুড়ঙ্গ পথে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতেন
বলে স্থানীয় রাজার নির্দেশে ওই মুখটি অনেক ছোট করে দেওয়া হয়। আপাততাবে
বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গর্ভগৃহের দেওয়ালে
ফুটে উঠেছে দেবী দুর্গা ও কালীর সমন্বিত রূপ। কিভাবে তা সন্তুষ্ট হয়েছে তা কোনও
ব্যাখার অপেক্ষা রাখে না। এই বেদীতেই করা হয় নিত্য পুজো।

বর্ধমানের মাড়গ্রামবাসী প্রভুবাদ পঞ্চিত নিত্যানন্দবংশ-সন্তুত রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত
পরম ভাগবতে উল্লেখ করেছেন লক্ষ্মাকাণ্ড-মহীরাবণ বধ। অহীরাবণ বধ। পৃঃ ৭৭৪-৭৭৬।

মহীর মরণ-বার্তা মহীর বণিতা।

শ্রবণ করিয়া শোকে হয়ে ক্রোধাপ্তিতা।।

আলুথালু বেশে আসি যোগাদ্যা-সদনে।

বলে, কী জননী, তব এই ছিল মনে ॥
 শ্রীরাম-লক্ষ্মণে লয়ে অঞ্জনা নন্দন।
 লক্ষ্মায় আসিতে হন উদ্যত যখন ॥
 ভদ্রকালী কহিলেন হনুর সদনে।
 স্বকার্য সাধিয়া লয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥
 যাইতেছ লক্ষ্মপুরে রাবণ-বধিতে।
 আমি কি রহিব পাতালপুরীতে ॥
 এখানে কে আর মম করিবে পূজন।
 রাক্ষসের দেবী আমি জানে সর্বজন ॥
 শুনি হনু শিরে লয় দেবীরে আনন্দে।
 শ্রীরাম ও লক্ষণের লয়ে দুই স্কঙ্কে ॥
 পাতাল হইতে হনু গমন করিল।
 শ্রীরঘামে আসি তথা দেবীরে স্থাপিল ॥
 তথায় যোগাদ্যা নামে দেবী খ্যাত হন।
 তথা হতে স্কঙ্কে হয়ে শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 লক্ষ্মপুরে বানর-কটকে দেখা দিল।
 রাম জয়ধ্বনি সবে করিয়া উঠিল।

শ্রীরঘামে রয়েছে খুব বড় একটি জলাশয়, যা সকলের কাছে পরিচিত শ্রীরদীঘি নামে।
 শোনা যায়, দীঘির দক্ষিণ দিকের মাঝখানে দেবীসতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল পড়েছিল।
 এই দীঘির জলের তলায় দেবীমূর্তি রাখা হয়েছে। প্রতিবছর বৈশাখী সংক্রান্তির আগের
 দিন রাতে দেবীকে জল থেকে তোলা হয়। সেখান থেকে দেবীমূর্তিকে তুলে আনা হয়
 তিনদিক খোলা উৎসব মণ্ডলে। একমাত্র ওই দিন দেবীমূর্তি দর্শন ও স্পর্শ করা যায়।
 ভোরের দিকে দেবীমূর্তিকে আবার জলের তলায় রাখা হয়। তখন দীঘির পাড়ে বেশ
 বড় মেলা বসে। চলে জৈষ্ঠ মাসের চার তারিখ পর্যন্ত। শেষের দিন অভিষেকের জন্য
 দেবীমূর্তিকে আবার জল থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়। ওইদিন ভক্তেরা ঘণ্টা তিনেকের
 জন্য দেবীমূর্তিকে দর্শন ও স্পর্শ করার সুযোগ পান। এছাড়াও আষাঢ়ী নবমী, বিজয়া,
 দশমী, ১৫ পৌষ ও মাঘ মাসের মাকরী সপ্তমীতে দেবীর বিশেষ পুজো হয়। কিন্তু বৈশাখী
 সংক্রান্তি ও ৪ঠা জৈষ্ঠ ছাড়া বছরের আর কোনও দিন সাধারণ দর্শকের মূর্তি দর্শন নিষিদ্ধ।
 পরের চারদিন রাত্রি দিপহরে দেবীমূর্তিকে জল থেকে তুলে এনে পুজো করা হয়। পুজোর
 শেষে দেবীমূর্তিকে আবার জলের তলায় রাখা হয়। পুজোর সময় ছাগল বলি দেওয়া
 হয়।

বর্তমানকালে দেবী যোগাদ্যার বর্ণনা করা হয়েছে,
 সিংহপৃষ্ঠে শোভা পায় দক্ষিণ চরণ,

বামাঞ্চুষ্ঠে করিয়াছে মহিষমর্দন,
বিগলিত কুণ্ডল শোভিছে পৃষ্ঠ পরে,
কলক কীরিট শোভে মস্তক উপরে।
শ্রবণ কুণ্ডল দেলে গজে গজমতী,
দিব্যবন্ধু পরিহিতা দেবী হৈমবতী।

দেবী বন্দনার যে রূপের বর্ণনা, তা দেখে নতুন বিগ্রহ তৈরি করেছেন দাঁইহাটের এক শিল্পী। অতীতে ক্ষীরগ্রামের সতীপীঠের কোনও প্রাকৃত মূর্তি ছিল না। তবে তখনও দেবীর পুজো হত। ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদন্তকে রাজা দেখা দেন উঁচুচও মূর্তিতে। রাজার আদেশে দেবী যোগাদ্যা (নামান্তরে যুগাদ্যা) নামে পূজিত হন। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হগলী প্রত্তি জেলায় যেখানেই আগুরী বা উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বাস আছে, সেখানেই যোগাদ্যাতলা আছে। সর্বত্র যে যোগাদ্যার মূর্তি আছে, তা নয়। কোথাও গাছতলায় নোডানুড়ির সূত্র, কোথাও একটিমাত্র শিলাখণ্ড, কোথাও সিন্দুর-চন্দন-হলুদ মাখানো বট, অশ্বথ, পাকুড়, নিম, খাজুর বা শেওড়া মা যোগাদ্যার প্রতীক হিসেবে পূজিত হন।

বৈশাখী সংক্রান্তির দিন যেসব থামে মা যোগাদ্যার পুজো হয়, সেগুলি হল বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার ইট্টা, গোবর্ধনপুর, কোঁয়ার পুর (বেশ বড় পাথরের মূর্তি আছে), চুরুলিয়া, ভাতাড় থানার নাসিগ্রাম, বড়বেলুন, বৰমান থানার কুড়মুন, কালিগ্রাম, ভিটা, বারাশতী, মন্তেশ্বর থানার মূলগ্রাম, ধান্যবেলড়, খাঁপুর, মাঝেরগাঁ, পূর্বস্থলী থানার পলাশপুরী, গলসী থানার মল্লসারুল, রায়না থানার শিবরামপুর, ভীমপুর, আনগুনা, দেরিয়াপুর সাঁকটিয়া, বোকড়া, পাঁইটা, শ্রেণপুর, কাটনাবিল, উচালন, খণ্ডঘোষ থানার ন'পাড়া, গোপাল বেড়া, সরঙ্গা, কেন্দুড়, কাটোয়া থানার দেবগ্রাম-বরমপুর, গোশুম্বা, করহই, পাঁজোয়া, দোনা, কুরচি, পোটগ্রাম, জামড়া, কঁটারিয়া, কারুলিয়া, বাঁকুড়া জেলার কোটিলপুর, ঈশ্বরপুর রাদড়া, ছাতারকানালী, শুঁড়ি পুকুর, হগলী জেলার আরামবাগ থানার মলয়পুর। মুর্শিদাবাদ, নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বৈশাখ মাসে একদিন করে লাঙ্গল পালা হয়।

কবি কৃত্তিবাস যুগাদ্যা বন্দনায় লিখেছেন ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যাদেবীর শাঁখা পরার কাহিনী। প্রায় তিনশ বছর আগে বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য রচনা করেছেন যুগাদ্যা বন্দনা। মহিলা কবি তরু দত্ত ইংরেজিতে কবিতার আকারে লিখেছেন মা যুগাদ্যার শাঁখা পরার কাহিনী।

BALLADS OF HINDUSTAN

By
T. Dutt
JOGADHYA UMA

(i)

“Shell bracelets ho! Shell bracelets ho!
Fair maids and matrons come and buy!”
Along the road, in morning’s glow,
The pedler raised his wonted cry.
The Khirogram, for cream renowned,
Through pasture meadows where the kine,
In knee deep grass, stood magic bound,
And half awake, in volved in mist,
That floated in dum coils profound,
Till by the sudden sunbeams kist
Rich rainbow nues broke all around.

(ii)

Shell-bracelets ho! Shell-bracelets ho!
The road side tree still dripped with dew,
And hung their blossoms like a snow
Who heard the cry? T was but a few,
A ragged herd-boy, here and there,
With his long stick and naked feet;
A plough-man wending to his care,
The field from which he hopes he wheat;
An early traveller, hurrying fast
To the next town; an urchin slow
Bound for the school; these heard and past,
Unheeding all, ‘Shell-bracelets ho!

(iii)

Pellucid spread a lake-like tank
Beside the road now lonelier still,
High on three sides arose the bank
Which fruit trees shadowed at thin will,
Up on the fourth side was the Ghat,
With its broad stairs of marble white,

And at the entrance arch there sat,
Full face against the morning light,
A fair young woman with large eyes,
And dark hair falling to her zone,
She heard the pedlar's cry arise,
And eager seemed his ware to own.

(iv)

"Shell-bracelets ho! See, maiden, see!
The rich enamel sunbeam-kist!
Happy, oh! happy shalt thou be,
Let them but clasp that slender wrist;
These bracelets are a mighty charm,
They keep a lover ever true,
And widowhood evert, and harm,
Buy them, and thou shalt never rue.
Just try them on!" She stretched her hand,
"Oh what a nice and lovely fit!"
No fairer hand, in all the land
And lo! the braced matches it."

(v)

Dazzled the pedlar on her gazed
Till came the shadow of a fear,
While she the bracelet arm upraised
Against the sun to view more clear,
Oh she was lovely, but her look
Had something of a high command
That filled with awe. Aside she shook
Intruding curls by breezes fanned
And blown across her brows and face
And asked the price, which when she heard
She nodded, and with quiet grace
For payment to her home referred.

(vi)

"And whre, o maiden, is thy house
But no, that wrist ring has a tongue,

no maiden art thou, but a spouse,
Happy, and rich, and fair, and young”
“For otherwise, my lord is poor,
And him at home thou shalt not find,
Ask for my father, at the door
knock loudly, he is deaf, but kind,
Seest thou that lofty gilde spire
Above these tufts of foliage green?
That is our place, its paint of fire
Will guide thee o'er the tract between.

(vii)

“That is the temple spire.” “Yes, there
We live; my father is the priest,
The manse is near, a building fair
But lowly, to the temple’s east.
When thou hast knocked and seen him, say,
His daughter, at Dhamaser Ghat
Shell-bracelets bought from thee ~~to~~ day,
And he must pay so much for that
Be sure, he will not let thee pass.
Whithout the value, and a meal,
If he damur, or cry alas!
No money hath he, then reveal,

(viii)

“Within the small box marked with streaks
Of bright vermillion, by the shrine,
The key whereof has lain for weeks
Untouched, he’ll find some coin ‘tis mine.
That will enable him to pay
The bracelets’ price, now fare thee well.”
She spoke, the pedlar wont away,
Charmed with her voice, as by some spell;
White she, left lonely there, prepared...
To plunge into the water pure,
And like a rose her beauty bared,
From all observance quite secure.

Not weak she seemed, nor delicate,
 Strong was each limb at flexile grace
 And full the bust; the mien elate;
 Like hers, the goddess of the clase
 On Latmos hill, and oh, the face
 Framed in its cloud of floating hair,
 No painter's hand might hope to trace
 The beauty and the glory there!
 Well might the pedlar look with awe,
 For though her eyes were soft, a ray
 a ray lit them at times which kings who saw,
 would never dare to disobey.

Onwards through groves the pedlar sped
 Till full in front the sunlit spire
 Arose before him, paths which led
 To gardens trim, in gay attire
 Lay all around, and lo! the manse,
 Humble but neat with open door!
 He paused, and blest the lucky chance
 That brought his bark to such a shore'
 Huge straw ricks log huts full of grain,
 Sleek, cattle, flowers, a tinkling bell,
 Spoke in a language sweet and plain,
 "Here smiling peace and plenty dwell."

Unconsciously he raised his cry
 "Shell-bracelets ho!" And at his voice
 Looked out the priest, with eager eye
 And made heart at once rejoice.
 "Ho, Sankha pedlar! passnot by
 But step thou in, and share the food
 Just offered on our altar high,
 If thou art in a hungry mood,
 Welcome are all to this repast!
 The rich and poor, the high and low!"

Come, wash thy feet, and break thy fast,
Then on thy Journey strengthened go'.

(xii)

Oh thanks, good priest! observance due
And greetings! May thy name be blest!
I came on business, but I knew,
Here might be had both food and rest.
Without a charge; for all the poor
Ten miles around thy sacred shrine
Know that thou keepest open door,
And praise that generous hand of thine;
But let my errand first be told,
For bracelets sold to thine this day,
So much thou owest me in gold,
Hast thou the ready cash to pay?

(xiii)

"The bracelets were enamelled,^{so}
The price is high." "How! sold to mine?
who bought them, I should like to know."
"Thy daughter, with the large black eyne,
Now bathing at the marble Ghat,"
Loud laugh'd the priest at this reply,
"I shall not put up, friend, with that,
No daughter in the world have I,
An only son is all my stay ;
Some minx has played a trick, no doubt,
But cheer up, let thy heart be gay,
Be sure that I shall find her out."

(xiv)

"Nay, nay, good father, such a face
could not deceive, I must aver,
At all events, she knows thy place,
"And if my father should demur
To pay these, thus she said, or cry
He has no money, tell him straight
The box vermillion streaked to try,



শ্রীলক্ষ্মায় সতীপীঠে গোরী আন্মার মন্দির



নর্মদার সতীপীঠে

সুন্দরী ভৈরব প্রযুক্তিজ্ঞান মন্দির
শিক্ষার পুরো তাবারতী
উজিরপুর, বরিশাল।
পুনঃনির্মাণঃ - ২০০৩-০৪ ইং।
অধ্যাচার্যেঃ ডাঃ পীঢ়ুঞ্জ কান্তি দাস।
(স্বাগতম হে মহান আত্মিয়)



বরিশালের সতীপৌঠ



সতীপীঠ চট্টগ্রামে সীতা মন্দির



চট্টগ্রামের সতীপীঠ

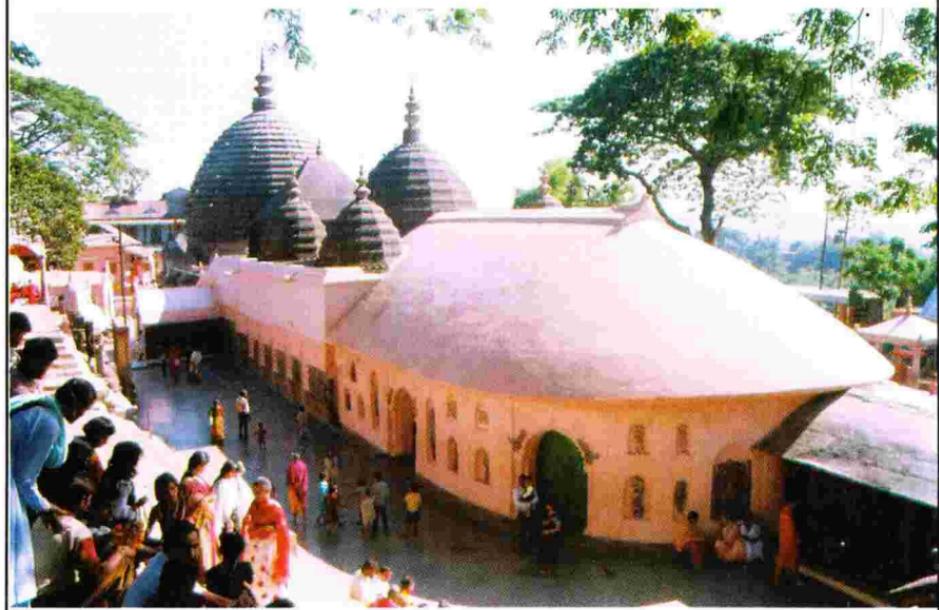


দেবী বর্গভিমা

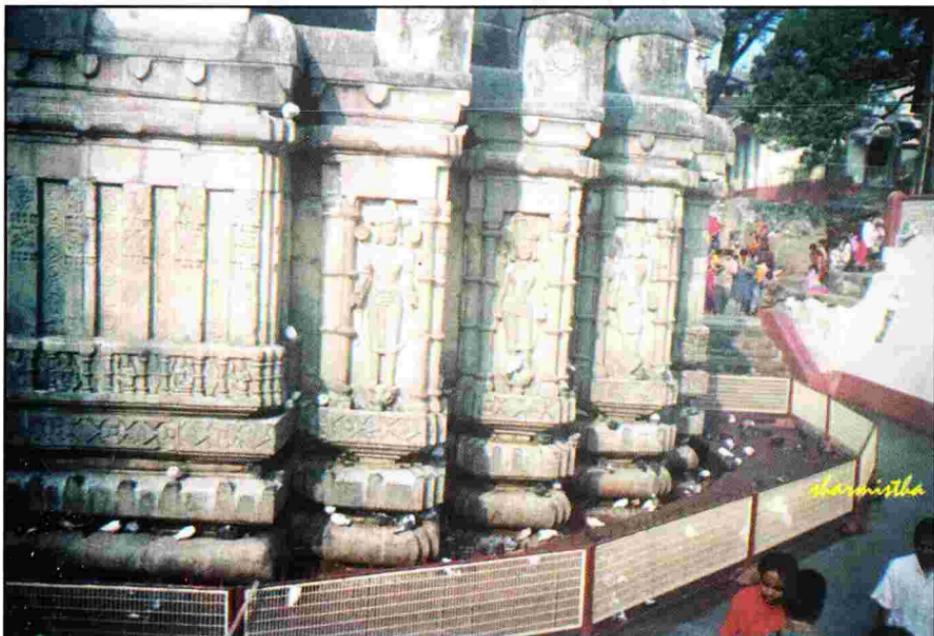
সতীপীঠে দেবী বর্গভিমা



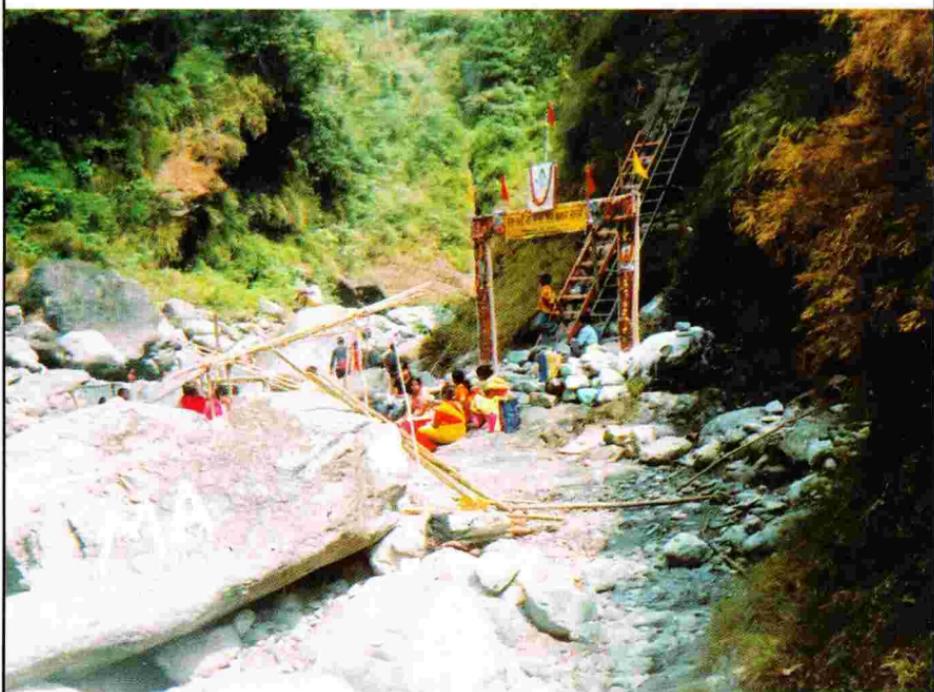
সতীপীঠ জ্বালামুখী মন্দির



সতীপীঠ কামাখ্যা মন্দির



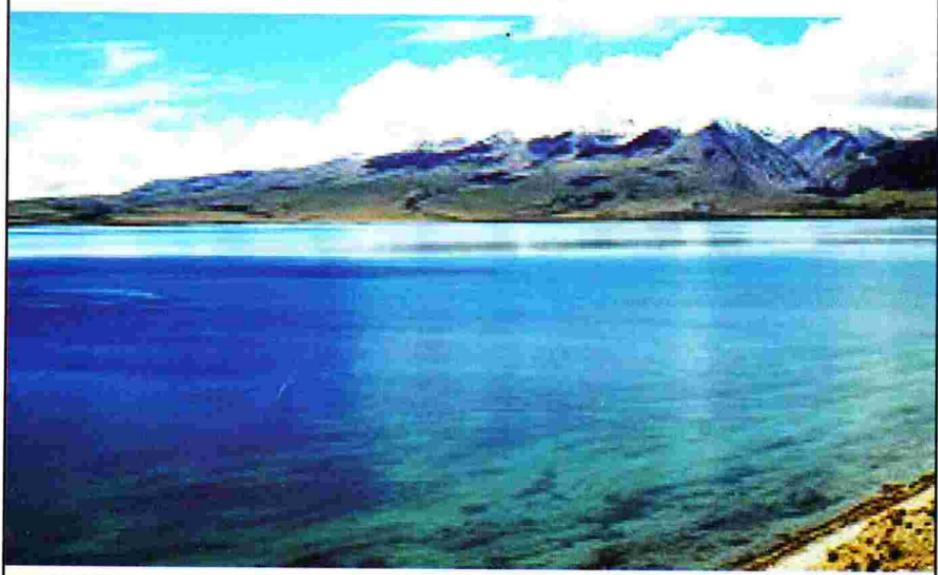
সতীপীঠে কামাখ্যা মন্দিরের একাংশ



উত্তরবঙ্গে জয়স্তীয়া সতীপীঠে যাবার দুর্গম পথে



বাংলাদেশের শ্রীহৃত্তের সতীপীঠ



সতীপীঠ মানস সরোবর



সতীপীঠ পুরীর মন্দির



সতীপীঠ কিরিটেশ্বরী



শ্রীলক্ষ্ম সতীপীঠে গোরী আন্ধার মূর্তি



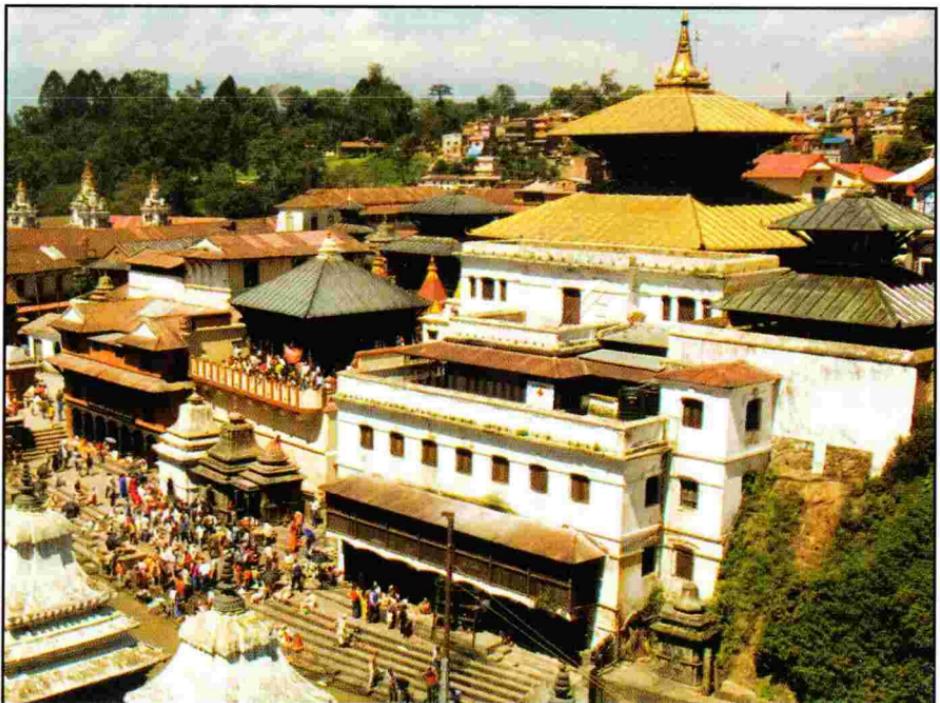
সতীপীঠ জয়ন্তীয়ায় হর-পার্বতী



সতীপীঠ বঙ্গড়ায় অগর্ণা মা



সতীপীঠ যশোহরেশ্বরী মন্দির



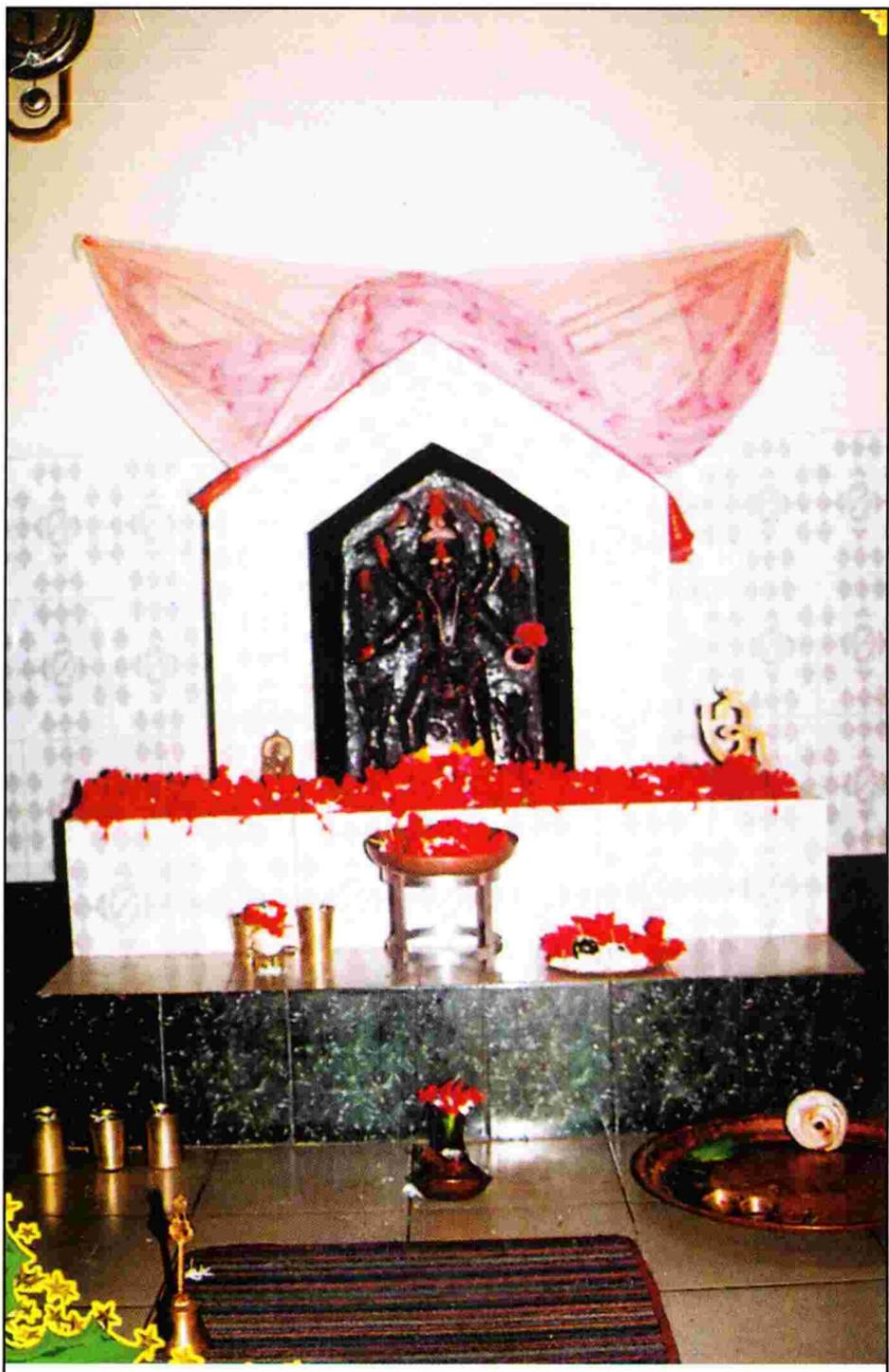
নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরের সতীপীঠ



গুহার মধ্যে মরুতীর্থ হিংলাজ মাতা



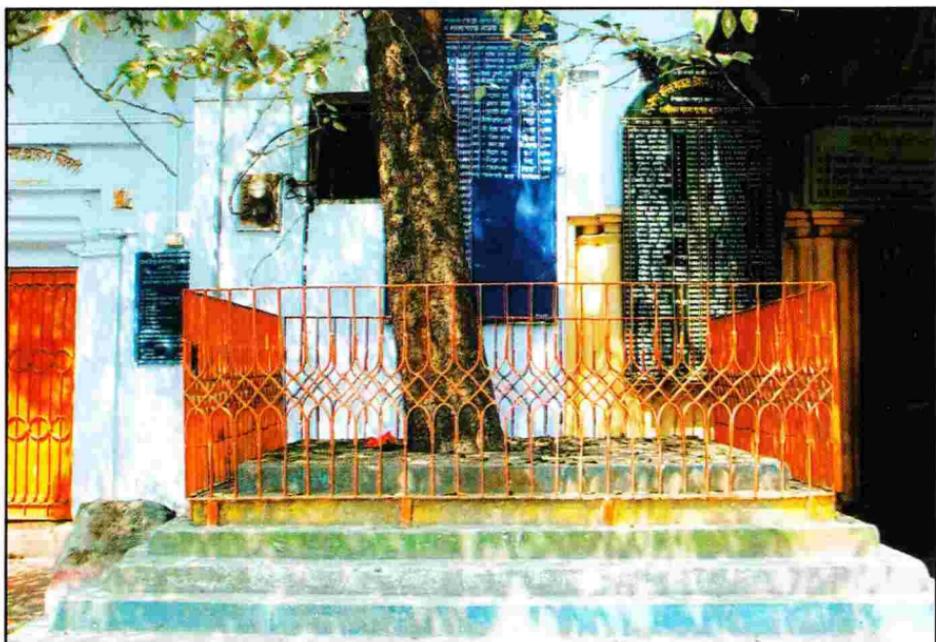
সতীপীঠ ক্ষীরভবানী



বরিশালের সতীপীঠে উগ্রতারা



কেতুগামের সতীপীঠে বহলা মা



বঙ্গড়ায় এখানেই পড়েছিল সতীর দেহখণ্ড



বগেশ্বরের সতীপীঠ

That's near the shrine, "well, wait,
Friend, wait,
The priest said thoughtful and he ran
And with the open box came back,
"Here is the price exact, my man,
No surplus over, and no lack,

(xv)

"How strange, how strange, Oh blest art thou
To have beheld her, touched her hand
Before whom vishnu's self must low
And brahma and his heavenly band!
Here have I worshipped her for year
And never seen the vision bright,
Vigils and fasts and secret tears
Have almost quenched my out ward sight;
And yet that dazzling from and face
I have not seen, and thou dear friend;
To thee, unsought for, comes the grace,
What may its pur-port be and end?"

(xvi)

How strange! How strange! oh happy thou
And could thou ask no other boon
Than thy poor bracelet's price?
That brow
Resplendent as the autumn moon
Must have bewildered thee, I trow
And made thee loss thy senses all,"
A dim light on the pedlar now
Began to dawn, and he let fall
His bracelet basket in his haste,
And backward ran the way he came
What meant the vision fair and chaste
Whose eyes were they,—those eyes of flame?

(xvii)

Swift ran the pedlar as a hind
The old priest followed on his trace,

They reached the Ghat but could not find
The lady of the noble face
The birds were silent in the wood,
The lotus flowers exhaled a smell,
Faint, over all the solitude,
A heron as sentinel
Stood by the bank. They called in vain,
No answer came from hill or fell,
The landscape lay in shumber's chain,
E'en Echo slept within her cell.

(xviii)

Broad sunshine, yet a hust profound!
They turned with saddened hearts to go;
Then from after there come a sound
Of silver bells; the priest said low,
“O, mother, mother, deign to hear,
The worship-hour has rung, we wait,
In meek humility and fear,
Must we return home desolate?
Oh come, as late thou cam'st unsought
Or was it but an idle dream?
Vive us some sign if it was not
A world, a breath, or passing gleam.”

(xix)

Sudden from out the water sprung
A rounded arm, on which they saw
As high the lotus buds among
It rose, the bracelet white, with awe,
Then a wide ripple toss and swung
Then blossoms on that licuid plain,
And lo! the arm so fair and young
Sank in the waters down again,
They bowed before the mystic power,
And as they have returned in thought,
Each took from thence a lotus flower
In memory of the day and spot.

Years, centuries have passed away
 And still before the temple shrine
 Descendants of the pedlar pay
 Shell-bracelets of the old design
 As annual tribute, Much they own
 In lands and gold, but they confess.
 From that evenful day alone
 Dawned on their industry,—success.
 Absurd may be the late I tell
 I'll suited to the marching times,
 I loved the lips from which it fell
 So let it stand among my rhymes.

‘ছন্দের যাদুকর’ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, তরুণ দন্তের কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। কবিতাটির
 নাম ‘যোগাদ্যা’।

(১)

সকাল বেলাতে শাঁখা^{রি} চলেছে হেঁকে
 “শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!”
 সকালের আলো সকল অঙ্গে মেখে
 হেসে উঠে রাঙা^{পথ} পথচি গায়ের বাঁকা।
 রাঙা সেই পথ—বরাবর গেছে চলে
 ক্ষীরের^{জন্য} বিখ্যাত ক্ষীর গায়ে;
 দুই পাশে তার গোচর ভূমির কোলে
 ঘনঘাসে গরু চরিছে ডাহিনে বাঁয়ে।
 গরু ও বাঁচুর ঘন কুয়াশায় ঢাকা
 ভাল করে যেন ভাঙেনি ঘুমের ঘোর;
 সহসা রৌদ্র ফুটিল আবীর মাখা,—
 রামধনু রঙ—শোভার নাহিক ওর ...

(২)

গাছপালা হতে শিশির টোপায়ে পড়ে,
 কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলে ভরে গেছে যত শাঁখা;
 চড়ুই নাচিয়া খাদ্য খুজিছে খড়ে।
 “শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!”

ফিরিওলা হেঁকে, ফিরিছে গাঁয়ের মাঝে,
মানুষ এখনো চলে না তেমন বাটে;
দু-একটি লোক ভিন্ন গাঁয়ে যায় কাজে,
চাষী যায় ক্ষেতে, রাখাল চলেছে মাঠে।
পাঠশালে পোড়ো মস্তুর গতি চলে,
ড্যাবা-ড্যাবা দুই চক্ষে কাজল আঁকা;
শাঁখারির বোল কর্ণে কেহ না তোলে
“শাঁখা চাই ভাল শাঁখা চাই ভাল শাঁখা!”

(৩)

পথের প্রান্তে দীঘি সে বিপুল-কায়া,—
স্বচ্ছ বিমল হৃদের মতন ঠাট,
ফলস্তুগাছ তিনি দিক করে ছায়া,
তিনিদিকে গাছ একদিকে শুধু ঘাট।
বাঁধা সে ঘাটটি,—পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি,
ধৰ ধৰ করে চাঁদনী ঘাটের পাকা,
চাঁদনির তলে শ্বেত-পাথরের পিঁজি
প্রভাতের আলো খিলানে ~~খিলানে~~ আঁকা !
বসেছিল সেথা আয়তলোচনী নারী,—
কালো-কেশ-ভার ভূমিতে পড়েছে লুটে,
শাঁখারির ডাক কর্ণে পশ্চিল তারি,—
উৎসুক তার আঁখি ইতিউতি ছুটে।

(৪)

“শাঁখা চাই ! ভাল শাঁখা নেবে ? ওগো মেয়ে !
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা;
ভারি কারিকুরি, দেখ তুমি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।
বিধবা না হয় এ শাঁখা যে নারী পরে
স্বামীর সোহাগ অটুট তাহার থাকে,
অক্ষয় হয়ে থাকে মা এ শাঁখা করে,
সতীশঙ্ক এ-নানান् গুণ এ রাখে;
হাত দিয়ে দেখ, দেখ মা তোমার হাত”—
কৌতুক ভরে হস্ত বাড়াল নারী,

“ঠিকটি হয়েছে মিলে গৃহে সাথে সাথ !
যেমন হাত, মা, শাঁখাও যোগ্য তারি।”

(৫)

সোনালী রৌদ্রে,—দেখিতে শাঁখার শোভা,—
হাতখানি তুলে ধরিল সহসা নারী;
নিরখি দেখিতে সেই শোভা মনোলোভা
শাঁখারির বুক কাঁপিয়া উঠিল ভারি !
সুন্দরী বটে!...তবু (তবে?) সে রূপের পানে
চাহিতে আপনি আঁখি নত হয়ে আসে;
সে রূপ নয়নে চরনের পানে টানে!—
প্রাণভরে আধ-বিস্ময়ে আধ-ত্রাসে!..
গ্রীবার হেলনে সামালি চুলের রাশি,
'শাঁখার মূল্য?' পুছে শাঁখারিরে নারী,
দাম শুনি শেষে, খুসী হয়ে কহে হাসি'
পাবে বাছা দাম,—যাও আমাদের বাড়ি!”

(৬)

“বাড়ি! কোন্ পাড়া? দাম ~~নেব~~ ^{নেব} বাড়ি যেয়ে?
না, না—সন্দেহ তোমারে আমি না করি;
মা লক্ষ্মী তুমি ঘৱাণা ঘরের মেয়ে,—
দেখে মনে ইয়ে রাণী রাজেশ্বরী! ”
'না বাছা, পড়েছি আমি, গরিবের হাতে'
রাজরাণী নই আমি ভিখারীর নারী;
বাপের ভিটায় রয়েছি বাপের বাড়ি।
সোনার কলস—ওই যে—গাছের ফাঁকে,—
দেখিতে পেয়েছ?—ওই আমাদের ঘর;
বাবা ঘরে আছে, বলো গিয়ে তুমি তাঁকে,
কড়ি পাবে, দেরি হবে না, নাহিক ডর।”

(৭)

“ওষে—দেউল গো!”...দেউলেই মোরা থাকি,
ওই দেউলের পূজারী আমার পিতা,
তিনি কানে খাটো, জোরে তাঁকে ডেকো হাঁকি’
জোরে না ডাকিলে, তাঁকে বাপু ডাকা বৃথা।

দেখা হ'লে পরে, ব'ল, ‘ধামাসেরা ঘাটে
কন্যা তোমার কিনিয়া পরেছে শাঁখা,
দাম সে দেয়নি, কড়ি তো ছিল না গাঁটে,
তাই সে পাঠালে চাহিতে শাঁখার টাকা।’
দামতো পাবেই, আর পাবে পরসাদ,—
অভুক্ত কেউ ফেরে না মোদের বাড়ি—
অতিথি দেখিলে বাবার যে আহুদা,—
না খাওয়ায়ে তিনি কিছুতে দেন না ছাড়ি।”

(৮)

“হ্যাদে দ্যাখ, যদি শোনো ঘরে নেই কড়ি,
তা’হলে পিতারে ব'ল মোর নাম ক’রে,—
প্রতিমার ঘরে ঝাঁপিতে যা আছে পড়ি’
—সে টাকা আমার, তাই যেন দ্যান ধরে;
শাঁখার মূল্য তাতেই কুলায়ে যাবে;
এস বাছা, তবে...বেলা হ’ল নাহিবার”
মুঢ় শাঁখারি পথে যেতে যেতে ভাবে,
‘মধুমাখা কথা-জনমে সে ভোলা ভার।’
ক্রমে গ্রাম-পথে শাঁখারি অদর্শন,
ঘাটের মোপানে জার্ষিতে লাগিল নারী,
নিরমল ~~জল~~ করিল আলিঙ্গন
পঞ্চের মতো চরণ দুখানি তারি।

(৯)

অবলা বলিয়া সে নহেক বলহীনা,
শকতির জ্যোতি সকল অঙ্গে তার;
তরবারি সম প্রথরা অথচ ক্ষীণা,
পূর্ণ উরস, তনু বিদ্যুৎ-সার।
কুস্তল-কালো-মেঘে-ঘেরা মুখখানি
আঁকিতে সে পটু পটুয়ায় মানে হার।
সে রূপ কেমনে বাখানিব নাহি জানি
গৌরব-গুরু প্রদ্যোত-দ্যুতিহার!
শাস্ত সে আঁখি তেজে যবে উদ্ভাসে
তার আগে আঁখি তুলিতে সাধ্য কার?

ରାଜା ମହାରାଜ୍‌ ମେ ଦିଠିରେ ଭୟ ବାସେ !
ପଥେର ଭିଖାରୀ ଶାଖାରି ମେ କୋନ ଛାର ?

(୧୦)

ଶାଖାରି ଚଲେଛେ ବାଁକା ପଥ ଖାନି ଧରେ
ଆମ କାଠାଲେର ଛୟାଯ ଛୟାଯ ଏକା;
ମୋନାର କଲସ ବଲସେ ଦେଉଳ ପରେ,
ପୂଜାରୀର ଘର ପାଶେ ତାର ଯାଯ ଦେଖା ।
ଖାସା ଘରଖାନି ! ଦୁଯାର ରଯେଛେ ଖୋଲା;
ଡାହିନେ ଗୋହାଳ, ବାଁଯେ ପୋଯାଲେର ଗାଦା ।
ଆଞ୍ଜିନାର କୋଣେ ଏକଟି ଧାନେର ଗୋଲା,
ରାଙ୍ଗ ଜବା ଗାଛ, କରବୀ ରାଙ୍ଗ ଓ ଶାଦା ।

‘ଟୁଂଟା’ ବାଜେ ଘଣ୍ଟା ଗରୁର ଗଲେ,
ମରା’ଯେର ପାଶେ ଚଢୁଇ ଶାଲିକ ନାଚେ;
ଅତିଥି ପଥିକେ ମିଲି ସବେ ଯେନ ବଲେ
‘ସୁଖ ଏହିଥାନେ,—ଶାନ୍ତି ମେ ହେଥା ଆଛେ’ ।

(୧୧)

‘ଶାଖା ଚାଇ,—ଶାଖା’ ହାତିଲ ଶର୍ଷ ବେନେ
ସ୍ଵର ଶୁଣି ଦ୍ଵାରେ ପୂଜାରୀ ଏଲେନ ଛୁଟେ;
ଡାକିଲେନ ଦିଜ ତାରେ ଅଭୃତ ଜେନେ,—
ଶାଖାରିର ମୁଖେ ଆହୁଦେ ହାସି ଫୁଟେ !
ଡାକେନ ବିପ୍ର ‘ଶାଖାରି, ଦାଁଡାରେ ଦାଁଡା,
ଅତିଥି ଆଜିକେ ହିତେ ହବେ ମୋର ଘରେ;
ମାୟେର ପ୍ରସାଦ—ନେମେହେ ଭୋଗେର ହାଁଡା,
ଆୟ ବାପୁ, ଆୟ, କୋଥା ଯାବି ଦୁପହରେ ?
ଠାକୁରେର ଭୋଗ,—ତାତେ ବାମୁନେର ବାଡ଼ି;
ହାତ ମୁଖ ଧୁୟେ ବିନ୍ଦେ ପଡ଼ ପାତ ପେତେ;
ବେଲାଓ ଦୁପୁର, ଠାନ୍ଦା କରେ ନେ ନାଡ଼ୀ,
ଭିନ୍ଗାୟେ ଯାବି,—କତ ଦୂରେ ହବେ ଯେତେ !

(୧୨)

କହିଲ ଶାଖାରି ଠାକୁର ଦଣ୍ଡବ୍ର,
କାଜେର ବରାତେ ଏସେଛି ତୋମାର କାଛେ ;

তবু জানি মনে,— ভেবেছি সারাটি পথ—
বামুন বাড়ির প্রসাদ কপালে আছে।
পাঁচখানা গাঁয়ে গরীব অনাথ যত
সবাই জেনেছে দুয়ার তোমার খোলা;
পাঁচখানা গাঁয়ে কে আছে তোমার মতো ?
তোমার জন্য স্বর্গে দুলিছে দোলা।
ভালকথা,—আগে, যে কাজে এসেছি শোনো,
কন্যা তোমার পরেছে দু'গাছি শাঁখা;
দাম তার—এই,—তাড়াতাড়ি নেই কোনো,
তবু জিজ্ঞাসি ?—আছে ত নগদ টাকা ?

(১৩)

‘খুব ভালো শাঁখা—ভরা সে মীনার কাজে—
তাই এত দাম !’ ‘সে কিরে আমার মেয়ে ?
কি বলিস্ তুই ? কি বকিস্ তুই বাজে ?
‘তোমারি তো মেয়ে, চলনা দেখিবে যেয়ে,—
নাহিছে সে ঐ পাথর-বাঁধানো ঘাটে,
ডাগর চক্ষু,—সেই তো পরেছে শাঁখা !’
হাসিয়া পূজারী কহে তাই নাকি ? বটে !
বাপু হে ! তোমার স্বকল্প কথাই ফাঁকা।
কন্যা আমার হয় নাই এ জীবনে,
এক সন্তান,—তাও সে কন্যা নয়;
নিশ্চয় তোরে ঠকিয়েছে কোনো জনে,—
ধরা সে পড়িবে,—নেই তোর কোনো ভয় !’

(১৪)

‘বল কি ঠাকুর ? মোরে ফাঁকি দিয়ে গেছে ?
ঠকাবার মতো চেহারা তো তার নয়;
তোমারে সে চেনে,—আর সে যে বলে গেছে,
বলিস্ বাবাকে টাকা যদি কম হয়,—
ঠাকুর ঘরের ঝাঁপি খুলে যেন দেখে,
তাতে আছে টাকা !’ ‘দাঁড়া, বাপু দাঁড়া দেখি’।
ঘরে গেল দিজ—শাঁখারি঱ে দ্বারে রেখে।
ফিরে এসে বলে, ‘তাইত ! তাইত !’ একি !

শাঁখার যে দাম বলেছিস তুই মোরে,—
ঝাঁপি খুলে দেখি রয়েছে যে ঠিক তাই!
ঠিক পূরাপূরি কম বেশি নাই, ওরে!
কম বেশি নাই একটা পয়সা পাই!

(১৫)

‘অবাক! অবাক! বিস্ময় মানি মনে!
ধন্য শাঁখারি! জনম ধন্য তোর!
ব্ৰহ্মা বিষ্ণু পড়ি’ যার শ্রীচৰণে,
তার হাতে বেঁধে দিলি অক্ষয় ডোর!
বুড়া হয়ে গেনু পূজা-আৰ্চনা কৰি,—
তবু দৱশন পাই নাই তাৰ আমি;
বৃত উপবাস কৱিনু জনম ডোৱা,
ঝাপসা দুঁচোখ,—সাধনে জাগিয়া যামী;
দেউল আগুলি গোঁয়ানু,—খোয়ানু দিন
সে ছবি অতুল আজো না দেখিনু চেুখে!
কি দোষে না জানি মোৱে দৈৰী দৰ্যাহীন
না জানি কি গুণে অভয় সেদ্যা তোকে!’

(১৬)

‘অবাক! অবাক! দেখা যদি গেল তাৰ
বৱু মাটি? কোনু পূৱালি মনক্ষাম?
চতুৰ্বৰ্গ কৱতলে সদা যার,—
তাৰ কাছে তুই চাহিলি শাঁখা,
বুৰেছি বুৰেছি...।

(১৭)

হারিণের বেগে ছুটিল শঙ্খ-বেনে,
পিছে পিছে ধায় দেবল স্থলিত-গতি;
ঘাটে পৌছিয়া চাহে বিস্ময় মেনে
ধামসেৱা-ঘাটে নাই লাবণ্যবতী!
নীৱৰ পাখীৱা, নাহিক কলঞ্চনি,
নিৰ্জন দীঘি সারস বিমায় একা;
সুপ্ৰবাতাসে উঠে মৃদু রণৱণি’
পদ্মফুলেৱ ক্ষীণ সৌৱভ-লেখা!

ହାଁକିଲ ଶୀଘରି, ପୂଜାରୀ ଡାକିଲ କତ,
ନାହିଁ ସାଡ଼ା ନାହିଁ, ବୁକେ ନାହିଁ ସ୍ପନ୍ଦନାହିଁ !
ଶୁଳ ଜଳ ମୂକ-ମୁଗ୍ଧ-ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ
ଘୁମାଯେ ବୁଝି ବା ପଡ଼େହେ ପ୍ରତିଧ୍ଵନି ।

(୧୮)

ଦିନ ଦୁପହରେ ନିଶ୍ଚିଥେର ନୀରବତା
ନୀରବ ଭୁବନେ ଆଲୋ ଝଲମଲ କରେ;
ଆଶାହତ ହିୟା-ଆକୁଲ...

(୧୯)

ପରାନେ ବିଥାରି ‘ଅନୁପମ ପରଭାବ’ ।
ସହସା ଶଞ୍ଜ-ବଲ୍‌ଯିତ କାର ପାଣି
ଜାଗିଯା ଉଠିଲ ପଦ୍ମ ଦୀଘିର ବୁକେ !
ତାରପରେ ଧୀରେ ନଧର ସେ ହାତଖାନି
ହଙ୍ଲ ତିରୋହିତ,—ଚକ୍ରେ ସମ୍ମୁଖେ !
ଶୀଘରି ପୂଜାରୀ—ଅବାକ ହଇୟା ରହେ
ବାର ବାର ତା'ରା ପ୍ରଗମେ ଦେବୋଦେଶେ;
ଧାମସେରା-ଘାଟେ ପଦ୍ମ ଆହୁରି ଦୋହେ
ନିଜ ନିଜ ସରେ ଫିଲରେ ଗେଲ ଦିନ ଶେଷେ ।

(୨୦)

ଦିନ ଚଲେ ଗେଛେ—ଗେଛେ ଶତାବ୍ଦୀ କତ,—
ଆଜୋ କ୍ଷୀର ଗ୍ରୀଯେ ହାଜାରୋ ଯାତ୍ରୀ ମେଲେ
ଯବେ ଦିତେ ଆସେ ଶୀଘର ପୂର୍ବେର ମତୋ
ସେଇ ଶୀଘରିର ବଂଶେର କୋନ ଛେଲେ;
ହରମେ ତାହାରା ଦେବୀରେ ଜୋଗାଯ ଶୀଘର
ବରମେ ବରମେ ଆସି ଦେଉଲେର ଦ୍ୱାରେ,
ଯଦିଓ ତାଦେର ଏଥନ ଅନେକ ଟାକା,—
ଧନୀ ତାରା ଶୀଘର ପରାୟ ଯୋଗାଦ୍ୟାରେ !
ଧନୀ ତାରା ନାକି ଦେବୀର ନିଯୋଗ ପେଯେ !
ଦେବୀର ପ୍ରସାଦେ ଦୁଃଖ ଗିଯେଛେ ଘୁଚି;
ଦୁଖେ ଭାତେ ଆଛେ, ଶୀଘରିର ଛେଲେମେଯେ
ଆଁଚଲେ ବେଁଧେହେ ପରଶମଣିର କୁଚି !

কাহিনী এ মোর—অদ্ভুত অভিশয়,
মিলে না এ মোটে নব্য যুগের সাথে;
যাঁর মুখে শোনা স্মৃতি তাঁর মধুময়
তাঁরে স্মৃতি এরে রেখেছি খাতার পাতে।

যোগাদ্যা মন্দিরের পুরোহিত বৎশরে সদস্য সন্তুষ্মার চক্ৰবৰ্তী জানিয়েছেন, বৈশাখ
মাসে ক্ষীরগ্রামের কোন মানুষ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জমিতে হাল-লাঙ্গল দেন
না। বৈশাখ মাস যদি তিরিশ তারিখে শেষ হয় তাহলে উন্ত্রিশে আর যদি একত্রিশে
শেষ হয় তাহলে তিরিশ তারিখ বিকেলে মামা-ভাণ্ডে সম্পর্ক যুক্ত যারা কোনওদিন লাঙ্গল
টানেনি, এমন দুটি ষাড় দিয়ে লাঙ্গল বের করা হয়। তার আগে ওই একমাস মা যোগাদ্যার
বেদি ক্ষীরকলস নামে একটি কলসীতে জল ভর্তি করে জল রাখা হয়। হাল লাঙ্গল করার
আগে যোগাদ্যা মা'র বাড়ি থেকে জল সিঞ্চন করতে করতে বিভিন্ন জমির ওপর দিয়ে
যাওয়া হয় তার জন্য একসময় একটা 'ম্যাপ' করা হয়েছিল। কিন্তু যে কোনও কারণেই
হোক, সেই ম্যাপটা এখন আর পাওয়া যায় না।

বলাবছল্য, যোগাদ্যা মা'র প্রায় সব অনুষ্ঠানের সঙ্গেও কৃষির সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু
ক্ষীর গ্রামের কোন মানুষ বৈশাখ মাসে লাঙ্গল চালান না, তাই উপরিউক্ত দিনে লাঙ্গল
চালিয়ে চাষের সূচনা করা হয়।

শ্রী চক্ৰবৰ্তীৰ অভিমত হল, কৃষির ওপরেই তো মন্দিরের গ্রামীণ অথনীতি নির্ভর
করে থাকে। কুজিকা তন্ত্র-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক পশ্চিতদের ধারণা, এটি
লেখা হয়েছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে। মা যোগাদ্যার নাম একসময় সুদূর অবধি পৌছে গিয়েছিল।
তা না হলে কুজিকাতন্ত্রে যোগাদ্যামা'র নাম উল্লেখ করা হবে কেন?

যোগাদ্যামা'র সম্পর্কে বিভিন্ন সময় সাধারণ এবং গবেষণামূলক গ্রন্থে উল্লেখ করা
হয়েছে। যেমন,

অনিলবৱণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৬৯ পৃঃ ৯৯)
রামানন্দ যতি বিৱচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ বলা হয়েছে,

যুগাদ্যা ভবানী বন্দো ক্ষীরগ্রাম পীঁঠ।

বন্দিব কিৱিটেশ্বৰী সতীৰ কিৱীট ॥

কবিশ্বেখর বলৱাম চক্ৰবৰ্তী রচিত কালিকামঙ্গল-এ মা যোগাদ্যার উল্লেখ করা হয়েছে।
এই তথ্য পাওয়া যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৫৯, ৬২৬৫ নম্বর পুঁথিতে। কবি শেখের
বলৱাম চক্ৰবৰ্তী সপুদশ শতাব্দীৰ কবি ছিলেন। ওঁৰ বাবাৰ নাম দেবী দাস আচাৰ্য, মায়েৰ
নাম কাঞ্জনী। কবিশ্বেখৰ কাশী জোড়াৰ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণেৰ (রাজত্বকাল ১৬৬৯-১৬৯২)
সভাসদ ছিলেন। সেখানে বৰ্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যার বন্দিনুচৰণ।

পাড়া অস্মুৱায় কামার বুড়ি বন্দ একমন ॥

ରୂପରାମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା କରେଛେ ଧର୍ମମଙ୍ଗଳ । ତାର ଏହି ରଚନାକାଳ ୧୫୮୪ ଶକାବ୍ଦ (୧୬୬୨ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦ) । ଜାତିତେ ତିନି କୈବର୍ତ୍ତ । ବାବାର ନାମ ରଘୁ । ବାଡ଼ି ହଗଲୀ ଜେଲାର ଆରାମବାଗେର ଦକ୍ଷିଣେ ହାୟାଂପୁରେ । ‘ଅନାଦିମଙ୍ଗଳ’ ନାମେ ସମ୍ପଦ କୁମାର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ କର୍ତ୍ତକ ସମ୍ପାଦିତ ଏବଂ ବନ୍ଦୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ (୧୩୪୫) ଏହି କାବ୍ୟେ ବଲା ହେଁଥେ,

ଶ୍ରୀରଥାମେ ବନ୍ଦିଲାମ ଯୁଗାଦ୍ୟାର ପା ।

ବଲିତେ ନା ପାରି ମାୟେର ଅମଙ୍ଗଳ ରା ॥

ମାନିକରାମ ଗାୟତ୍ରୀର ଧର୍ମମଙ୍ଗଳେର ରଚନାକାଳ ୧୭୮୧ ଖୃଷ୍ଟାବ୍ଦ । ତାଦେର ବାଡ଼ି ଛିଲ ହଗଲୀ ଜେଲାର ଆରାମବାଗ ମହକୁମାର ବେଲଭିହା (ଅଧୁନା ବେଲଟେ) ତିନି ଲିଖେଛେ,
ଭାଗୁର ଗଡ଼େ ଭାତାର ଚଣ୍ଡି ଭୟାବିନାଶିନୀ ।

ବନ୍ଦିଲାମ ଶ୍ରୀରଥାମେ ନୃମୁଖ-ମାଲିନୀ ॥

ସନ୍ତ୍ଵାବୁ ଜାନିଯେଛେ, ଶ୍ରୀରଥାମେର ଦେବୀ ଯୋଗାଦ୍ୟ ମୂଳତ ଉତ୍ତରକ୍ଷତ୍ରି ସମ୍ପଦାୟେର ଦେବତା ।

ଯୁଗାଦ୍ୟା ମାୟେର ମୂଳ ବେଦି ଥିକେ ଏକଟି ସୁଡଙ୍ଗ ନେମେ ଗିଯେଛେ । ସନ୍ତ୍ଵାବୁର କାହେ ଜାନା ଗେଛେ, ଏହି ସୁଡଙ୍ଗ କତ ଗଭୀର ତା ଜାନା ଯାଇନି । ମନ୍ଦିରେର ଚାରଦିକେଇ ଛିଲ ପୁରୁର । ସେଇ ପୁରୁରେର ସବ ଜଳ ଓଇ ସୁଡଙ୍ଗେ ଢାଳା ହଲେଓ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜନ୍ୟଓ ତା ଉପରେ ଓଠେନି । ଏହି ଧରନେର ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା ଢାଳାନୋ ହୟ ୧୯୬୫-୬୬ ସାଲେ । ତାଇ ଏହି ସୁଡଙ୍ଗ ଯେ ଅନେକ ନୀଚେ ନେମେ ଗେଛେ ଏ ବିଷୟେ କୋନ୍ତା ସନ୍ଦେହ ନେଇ ।

କିଛିଦିନ ଆଗେ ଓଇ ସୁଡଙ୍ଗେ ଏକଟା ସୁତୋ ନାମିଯେ ଦେଖାଇଛେଟା କରା ହେଁଥିଲ । ସେମଯି ବୋଝା ଗିଯେଛିଲ, ଓଇ ସୁଡଙ୍ଗ ସରାସରି ନୀଚେ ନେମେ ଯାଇନି । ଏକଟୁ ଆଁକାବାଁକା ଆଛେ । ଯାର ଜନ୍ୟ ସୁତୋ ସରାସରି ନାମାନୋ ଯାଇନି ତିନି ବାନେଛେ, ଆମରା ହାତ ଦିଯେ ଦେଖେଛି ‘ଏକହାତ ଯାବାର ପରେ ତା ଉତ୍ତରଦିକେ ବେଁକେ ଗେଛେ । ଅମ୍ବନ୍ତ ଜଳ ମେଖାନ ଦିଯେ ଚଲେ ଗିଯେଛେ ।

ସନ୍ତ୍ଵାବୁର କାହେ ଜାନା ଗେଛେ ଆରା ଏକଟି ବିଶ୍ୱଯକର ତଥ୍ । ତାର ଭାଷ୍ୟ, ଓଇ ସୁଡଙ୍ଗ ପଥେ ଚିରକାଳ ବାସ କରେ ଏକଟି ଗୋଖରୋ ସାପ ଓ ଏକଟି ବ୍ୟାଙ୍ଗ । ଅନେକେଇ ତାଦେର ଦେଖେଛେ । ଯେମନ, ଆମି ଓଇ ବ୍ୟାଙ୍ଗଟାକେ ଦେଖେଛି । ଆମରା ବାବା ଗୋଖରୋ ସାପଟାକେ ଦେଖେଛିଲେନ । ଅନେକ ପୂଜାରୀ ପୂଜୋର ସମୟ ଫୁଲ ଦିତେ ଗିଯେ ଦେଖେଛେ ଫୁଲେର ସାଜିର ମଧ୍ୟେ ସାପଟା ରଯେଛେ । ଏକଜନ ପୂଜାରୀ ଚୋଖେ କମ ଦେଖିଲେ । ଦେଖିଲେ ପାନନି ଯେ ମେଖାନେ ସାପ ରଯେଛେ । ତିନି ଫୁଲ ହାତ ଦିତେଇ ସେ ଫୋଁସ କରେ ଓଠେ । ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ଏକଟା ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲ ଛିଲ । ପୂଜାରୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣେ ଛାତ୍ରା ଛୁଟେ ଏସେ ଦେଖେ, ବେଦିର ଓପର ଗୋଖରୋ ସାପ ଫଣ ତୁଲେ ରଯେଛେ । କିଛିକଣ ପରେ ଆବାର ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫିରେ ଗେଛେ ସୁଡଙ୍ଗେର ଭେତରେ । ସାପ ଓ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଜନକେଇ ଦେଖା ଗେଛେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ, ସିଂ୍ଦୁର ମାଖା ଅବସ୍ଥା ।

ଆର ଏକଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରତି ସବେମାତ୍ର ଶେଷ ହେଁଥେ । ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଡ଼ବୃଷ୍ଟି ଶୁରୁ ହୟ । ଆମି ତଥନ ମନ୍ଦିରେର ମଧ୍ୟେ ଛିଲାମ । ବାଡ଼ବୃଷ୍ଟିର ଦାପଟେ ଆମରା ବାଧ୍ୟ ହେଁଥିଲାମ ମନ୍ଦିରେର ମଧ୍ୟେ ଥାକିଲେ । ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଅନେକେଇ ତଥନ ଆଶ୍ୟ ନିଯେଛେ ମନ୍ଦିରେର ମଧ୍ୟେ । ତଥନ ମନ୍ଦିରେର ମଧ୍ୟେ କୋନ୍ତା ଛିଲ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟା ପ୍ରଦୀପ ଜୁଲାଇଲ । ହଠାଂ ଦେଖା ଗେଲ,

একটা বিলুট বড় ব্যাঙ সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এসে বেদির ওপর বসল। বুলাবাহ্ল্য, তাঁর শরীরও সিঁদুরে রক্তবর্ণ হয়ে রয়েছে। তারপর থপথপ করে সে গর্ভ মন্দিরের মধ্যে ঘূরল। কয়েক মিনিট পরে চন্দনপিড়ির ওপর বসে টুকটাক কি সব খেতে শুরু করল। তবে একসঙ্গে দু'জনকে কেউ দেখেনি। আশ্চর্যের বিষয় হল, সাপ এবং ব্যাঙ—দু'জনের তো খাদ্যখাদক সম্মত! কিন্তু দু' জন কি করে একজায়গায় থাকে তা ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

অনন্দামঙ্গলের রচয়িতা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম আজ আর কারও অজানা নয়। ওঁর বাবার নাম নরেন্দ্র নারায়ণ রায়। তিনি বর্ধমান প্রদেশের অসংগাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়া, পৌঁড়া, পেঁড়ো বসন্তপুর, পাঁড়ুয়া ওরফে রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায়। ওঁর বাবা ‘রায়’ এবং ‘রাজা’ উপাধি পেয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন চতুর্থ তথা সবচেয়ে ছেট ছেলে। দুশ্শরচন্দ্র গুপ্তের মতে, তাঁর জন্ম ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। তখন বাংলার নবাব আলি বর্দি থাঁ। নদীয়ার নববাদী ও কৃষ্ণনগরের মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) কবিকে ‘কবিগুণাকর’ উপাধি দান করেন। তিনি উক্ত রাজার সভাকবি ছিলেন। রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে।

তিনি পারস্য, ব্রজবুলি, হিন্দি, সংস্কৃত ও যাবানিক শব্দেও কবিতা রচনা করিয়া ভাষাজ্ঞতার চিহ্ন রেখে গিয়েছেন। অনন্দামঙ্গলের তিনিটি খণ্ড। ১ম অনন্দামঙ্গল, ২য় বিদ্যাসুন্দর, ৩য় ভবানন্দ মজুমদার (কৃষ্ণচন্দ্রের পুর্বপুরুষ; মজুমদার—রাজস্বের হিসাব লেখক)-এর পালা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, রায়গুণাকর ‘ভারতচন্দ্র রায়ের অনন্দামঙ্গলে সতীর ডান পায়ের আঙুল পঞ্জেছিল তার উল্লেখ আছে। ‘রায় ভ্রমণ’ প্রবন্ধের লেখক পঞ্চানন রায় রাঢ় ভ্রমণের সময় ১৩০৮ সালে যোগাদ্যা মা’র মূর্তির নির্মাতা প্রস্তরশিল্পী নবীন চন্দ্র ভাস্করের, তাঁর দাঁইহাটের বাড়িতে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তখন শিল্পীর বয়স ছিল ৭০ বছর। পাথর ছাড়াও ভিন্ন ধাতুর দেবীমূর্তির গঠনেও নবীনচন্দ্রের অঙ্গুত ক্ষমতা ছিল। দিনাজপুরের মহারানী শ্যামমোহিনী, নবীন ভাস্করের তৈরি কৃষ্ণের কালীয়দমন মূর্তির শিল্পনেপুণ্য দেখে মুন্ধ হয়ে নবীনচন্দ্রকে সোনার বাঁটালি পুরস্কার দিয়েছিলেন। ইংরেজি ১৯০৮ সালে শিল্পী নবীনচন্দ্রের জীবনাসান হয়। ওই সাক্ষাৎকারে জানা গেছে, তাঁরা পুরুষানুক্রমে বর্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের রাজবংশের দেবীমূর্তি তৈরি করতেন।

ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যা মা’র মূর্তিও তৈরি করেন নবীনচন্দ্র। ওই মূর্তির ছবি তোলার জন্য দৈবাদেশ পাওয়া যায়। এই মূর্তি বারোমাস স্থানীয় একটি বড় পুকুরে রাখা হয়, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কথিত আছে, একদিন দেবী রাজা হরিদন্তকে স্বপ্নে আদেশ দেন, প্রতিদিন একটি করে নরবলি না পেলে তিনি রাজ্য ধ্বংস করবেন। দেবীর এই আদেশ শুনে ক্ষীরগ্রামের অধিবাসীরা ভয়ে যে যেদিকে পারলেন পালাতে থাকেন। বীরাচার পরায়ণ শক্তিভঙ্গ রাজা হরিদন্ত সাতদিনে সাতছেলে বলি দিয়ে স্বপ্নাদেশ পালন করেন।

একদিন পুরোহিতের ছেলের নরবলির পালা আসে। পূজারী ব্রাহ্মণ ছেলেকে হারানোর ভয়ে রাতে সপরিবারে পালানোর উদ্যোগ নেন। এই সময় ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে পুরোহিতকে দেবী অভয় দিয়ে বলেন, ‘ব্রাহ্মণ ! তুমি নিজগৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আজ রাত্রিতে রাজাকে প্রত্যাদেশ করিব যে, কল্য হইতে নরবলি রহিত হইবে।’ ব্রাহ্মণ কন্যার সেই আশ্বাসে ব্রাহ্মণ বাড়িতে ফিরে এলেন। পরের দিন সকালে রাজা ভদ্রকালীর প্রত্যাদেশের কথা ঘোষণা করেন। সেই থেকে আর নরবলি দেওয়া হয় না ক্ষীরগ্রামে। একই সঙ্গে দেবীর আদেশে ভদ্রকালী মূর্তির পরিবর্তে পৌরাণিক ধ্যানের অনুযায়ীনী দশভূজা মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজা নবীনচন্দ্র ভাস্করকে আগের মূর্তির মতো অবিকল একটি মূর্তি গড়ার আদেশ দেন। কিন্তু মূর্তি তৈরি হবার পর কোন্টা নতুন, কোন্টা পুরনো তা বোঝা যায়নি।

নিখিলনাথ রায়ের ‘মুর্শিদাবাদ কাহিনী’-র মাধ্যমে জানা যায়, আরঙ্গজেব বাদশাহের আমলে হিজরী ১০৯০ (১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরাহি নিবাসী উত্তর রাচীর কায়স্ত ও মিত্রবৎশ সন্তুত বঙ্গাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত অর্ধবঙ্গে কানুনগো হরিনারায়ণ রায় প্রসিদ্ধ পীঠস্থান যোগাদা দেবীর সেবার বন্দোবস্তের জন্য ১৬ শত টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করেছিলেন (৫৯-৬০ পৃষ্ঠা)

মাটিয়ারী নিবাসী নিবারণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কাটোয়ার ইতিহাস বইতে কিছু অভিনব বিষয় জানা যায়। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে,

‘যোগাদ্যাবির্ভাব সময়ে ক্ষীরগ্রামে হরিদন্ত নামাজনৈক প্রস্তুত্যার্থিক প্রজাবৎসল নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রবল পরাক্রম, অতুল সুন, প্রাণিত্ব, বিপুল যশোখ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। একদিন যামিনীর তৃতীয় যামে হরিদন্তের প্রতি জগদস্থার স্মৃতাদেশ হইল যে, উৎস ! আমি তোমার ধর্ম-প্রবর্গতাৰ আকৃষ্ট হইয়া কৈলাসধাম পরিত্যাগপূৰ্বক তোমার ক্ষীরগ্রামে আবির্ভূতা হইলাম। তুমি নিত্য নরবলি দ্বারা আমায় তৃপ্তিসাধন কর এবং আমার এই আদেশবাক্য যথাযথ প্রতিপালন করিবে। তাহার অন্যথা হইলে তোমার রাজ্য ধ্বংস এমনকি বৎশ পর্যন্ত লোপাপত্য হইবে।

আমার আদেশে পুণ্যময় বৈশাখামাসে ক্ষীরগ্রামে কেহ মৃত্তিকা খনন করিবে না, কেহ দীপবর্তিকা প্রস্তুত করিবে না; কেহ পাকান্নে দণ্ড প্রদান করিবে না এবং তোমার ক্ষীরগ্রামে যেন কখনও কুণাল চক্র ঘূর্ণিত না হয়। সমস্ত বৈশাখ মাস স্তৰী-পুরুষে একশয়্যায় শয়ন করিবে না এবং এ মৃত্তিকায় বৈশাখ মাসে যেন কাহারও সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়। কেহ রৌদ্র তাপক্রিষ্ট হইয়াও তমিবারনার্থে বৈশাখ মাসে মন্তকে ছত্রাবরণ করিবে না ! কেহ ধান্য হইতে তঙ্গুল উৎপাদন করিবে না এবং আদ্যস্ত বৈশাখের পঞ্চম দিবসে অলঙ্কৃ ব্যতীত কেহ মসীদারা লিখন কার্য সমাধান করিবে না ! কেহ বৈশাখ মাসে ক্ষীরগ্রামে ভূমিতে হালচালনা করিবে না এবং উত্তরদ্বারী ঘরে কেহ বসবাস করিবে না ! প্রতি বৈশাখ সংক্রান্তিতে আমার প্রস্তুরময়ী প্রতিমা পূজা চিরতরে স্থিরস্তর থাকিবে ! কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমার সাম্রিধ্যে আরত্রিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবে !

ওই গহে দেবীর নরবলি দেওয়ার আদেশে যখন পূজারী ব্রাহ্মণ গ্রাম থেকে পালাচ্ছিলেন তখন দেখেন ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে দেবীকে-একথা আগেই উপ্পেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণকন্যাবেশী দেবীকে ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, ‘আমি দায়ে পড়িয়া ক্ষীরগ্রাম ত্যাগ স্থির করিয়া পলায়ন করিতেছি। ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যানামী এক রাক্ষসী আসিয়াছে। নরবলি ভিন্ন রাক্ষসীর উদর পূর্ণ হয় না। আমাদের মহারাজের সাতপুত্র এবং গ্রামবাসীর সকলেরই এক একটা সন্তান ভক্ষণ করিয়াছে। মা ! এই কালরাত্রি প্রভাত হইলেই আমারই সর্বনাশের দিন আসিবে। আমার বংশধর একমাত্র পুত্র, সেই রাক্ষসীর কবলিত হইলেই আমাকে নির্বৎস হইতে হইবে। দেবি ! আমি কেবল বংশ রক্ষার জন্যই রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়া গ্রামস্তরে পলায়ন করিতেছি। ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা যোগাদ্য হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস !

যে ভয়ে পালাও তুমি।

সেই মহাদেবী আমি ॥

তুমি ফিরিয়া যাও। আমি তোমাকে অভয় দিতেছি ;... কল্য হইতে আর কাহাকেও নরবলি দ্বারা আমাকে পূজা করিতে হইবে না।

নিবারণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘কাটোয়ার ইতিহাস’ বইতে উপ্পেখকরা আছে, ক্ষীরগ্রামে দেবীর শাঁখা পরার অত্যাশৰ্চ কাহিনী—

ক্ষীরগ্রামে ধামাচ নামে একটি দীর্ঘায়তন দীর্ঘী আছে। সেই দীর্ঘীর ঘাটে একটি অসামান্যরূপা লাবণ্যমূর্তি বালিকা একদিন একাকিনী স্থান করিতেছিলেন। ঘাটে জনমানবের সমাগম নেই। এমন সময় ভান দেন্ত নামক জনৈক শঙ্খ বণিক দীর্ঘিকা তীরস্থ বর্ত্তে শঙ্খ বিক্রয়ার্থে ক্ষীরগ্রামে গমন করিতেছিলেন। স্থাননিরতা বালিকা বণিককে ডাকিয়া কহিলেন, আমাকে শাঁখা পরাইয়া দাও। আমি যোগাদ্যার পূজক ব্রাহ্মণের কন্যা। শাঁখা পরাইয়া আমাদের বাড়ি গিয়া বলিবে,

গন্তীরের কোলঙ্গিতে পাঁচতকা আছে।

শাঁখা দিয়া লবে গিয়া জনকের কাছে।

শাঁখারি নিঃশঙ্কমনে শঙ্খেশ্বরীকে শাঁখা পরাইয়া গ্রামে গিয়া পূজারী ব্রাহ্মণকে, বলিলেন, ঠাকুর ! তোমার কন্যা ধামাচের ঘাটে আমার নিকট শাঁখা পরিয়া গন্তীরের কোলঙ্গীতে পাঁচটা টাকা আছে, তাহা আমাকে লইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক। একি আমার তো কন্যা নাই ! তবে কে শাঁখা পরিল। তাহার পর টাকার জন্য কোলঙ্গী সঞ্চানে গিয়া দেখিলেন, সত্যই পাঁচটা টাকা রহিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল ! হৃদয় মধ্যস্থিত ভঙ্গি তরঙ্গিনী নয়ন পথে দর দর প্রবাহিত হইয়া গঙ্গস্থল ভাসাইয়া দিল। ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বণিককে বলিলেন, ভাই ! তোর পরম সৌভাগ্য, আশীর্বাদ কর; যেন তোর সৌভাগ্যের অংশভাগী হইতে পারি।

এ শঙ্খ হইতেই তুই নিঃশঙ্খ হইলি। তুই ভাই যে কন্যাকে শাঁখা পরাইয়াছিস, তিনি

কন্যারূপণী যোগমাদ্যা যোগাদ্যা। তুই যুগে যুগে কত যোগ সাধন করিয়া আজ যোগাদ্যার দর্শন পাইলি। আয় ভাই আয় তোর ঐ যোগাদ্যা স্পর্শিত পবিত্রদেহ স্পর্শ করিয়া আমার এই পাপদেহ পবিত্র করি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ শঙ্খবণিককে অক্ষে স্থাপন করিলেন। বলিলেন, চল, ভাই চল, একবার সেই মেয়েটাকে আমায় দেখাইয়া দে। তুই সঙ্গী না হইলে তাঁর সাক্ষাৎ পাইব না। শার্খারির সঙ্গে ধামাচের ঘাটে উপস্থিত হইয়া মা মা শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। বহায়াসে মায়ের সাক্ষাৎ না পাওয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন—পাষাণ নন্দিনী। তোর দরশন বঞ্চিত হইয়া এই ঘাটে ব্রহ্মত্বা হইতেছি। ব্রাহ্মণ আঘা-বধোদ্যত হইলে ভগবতী যোগাদ্যা সলিলমধ্য হইতে সশঙ্খ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া দেখাইলেন। ব্রাহ্মণও তদর্শনে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়া হাস্যবদনে ভবনে গমন করিলেন। অদ্যাবধি সেই শঙ্খবণিকের বংশধর যোগাদ্যা পূজায় বিনামূল্যে শঙ্খপ্রদান করিয়া আসিতেছে।

দেবী যোগাদ্যাকে কেন্দ্র করে আজও ঘটে নানান অলৌকিক ঘটনা। বছর কয়েক আগে দেবীর মন্দিরের সামনে জনৈক ব্যক্তি পাপ স্থলনের জন্য হত্যে দিয়েছিলেন। কোনও একসময় ওই ব্যক্তি মাকে পদাঘাত করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তার কুষ্ঠরোগ হয়। রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি জামালপুরে তার গুরুর কাছে শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ওই জায়গায় ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন। ওই রোগগ্রস্ত মানুষটির কাছে শোনা যায়, ধর্মরাজ ঠাকুর তাকে স্বপ্ন দিয়ে বলেন, ক্ষীর গ্রামের মা যোগাদ্যা মন্দিরে তুমি হত্যে দিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হও এবং স্বপ্নাদেশ হয় যে, ওই গ্রামের জনৈক ব্যক্তির পদধূলি নিলে তুমি রোগমুক্ত হবে। দেখা গেল, এক বছরের মধ্যে তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। আজও রাত নটার পরে মায়ের মন্দির চতুর্ভুক্ত কেউ থাকেন না। বলা যায়, কোন বিশেষ কারণে ওই সময়ের পরে সেখানে কেউ থাকতে পারেন না।

এখনও প্রতি সংক্রান্তিতে এখানে বলি হয়। এছাড়াও যাদের মানসিক থাকে তারাও এখানে বলি দেন। দুর্গানবীর দিন বলি দেওয়া হয় মোষ, ছাগ আর ভেড়া। এখানে শক্তি মতে পুজো হয়। উপকরণের মধ্যে থাকে মদ ও মাংস। তবে এখানে কোনও অনাচার হয় না। কখনও কোন ভিন দেশের মানুষ এখানে এলে তাকে কেউ বিরক্ত করে না।

রাখালদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত ‘বর্ধমান রাজ বংশানুচরিত’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে জানা যায়, কীর্তিচন্দ্র দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে যে সকল জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ মহাপীঠস্থান ক্ষীরগ্রামও তাহার অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ নিপাতিত হয়। তথায় দেবী যোগাদ্যা ও ক্ষীরখণ্ডক বৈরেব বিরাজমান আছেন। কীর্তিচন্দ্র এই স্থানের অধিকারপ্রাপ্ত অনিবর্চনীয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে দেবীর একটি রত্নবেদি, মন্দির, শয়নগৃহ ও গর্ভমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। রত্ন বেদিতে একখানি শিলালিপি গ্রথিত আছে, কিন্তু তার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় কিছুই পড়িতে পারা যায় না। অদ্যাবধি দেবীর পূজাদি রাজ সরকার হইতেই সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব রেল বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণ (২য় খণ্ডে) বলা হয়েছে, কাটোয়া জংশন হইতে কৈচের ১০ মাইল দূর। ক্ষীরগ্রামের দেবীর দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম যোগাদ্যা, ভৈরব ক্ষীর খণ্ডক। দেবীপ্রতিমা সারা বৎসর ধরিয়া একটি দীঘির জলে ডুবানো থাকে। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন জল হইতে দেবীকে তুলিয়া মহাসমারোহে পূজা করা হয় ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে।

যোগাদ্যার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে, একবার দেবী যোগাদ্যা একটি কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া শাঁখা পরিধান করেন এবং পরে জল মধ্য হইতে শঙ্খশোভিত হস্ত উত্তোলিত করিয়া শাঁখারী ও স্থানীয় ধনী সেবাইতে উহা দেখান। এই কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দন্তের একটি সুন্দর ইংরেজি কবিতা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। প্রবাদ, ‘পূর্বে যোগাদ্যার পূজার দিন প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট একটি করিয়া নরবলি হইত।’

‘দেশ’ সাহিত্য সংখ্যায় (১৩৭২) (পৃষ্ঠা ৯৯) প্রকাশিত শৈলেন্দ্র নাথ সামন্ত তাঁর বর্ধমানের লোক সংস্কৃতি প্রবন্ধে ‘বৃন্দাবন দাস’-এর উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় :—

মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণ
বামাচারী সন্ধ্যাসী মদ্যপান করে।
দেবতা জানেন সভে চণ্ডী বিষহরি
তাও যে পূজেন সেহো মহাদন্ত করি
ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, অটুহাসের ফুলরা।

হরিগোপাল ঘোষাল সম্পাদিত ‘কাটোয়া দর্পণ’-এর শারদীয় সংখ্যায় উল্লেখ আছে, ক্ষীরগ্রাম—ক্ষীর+গ্রাম। একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ। দেবীর নাম যোগাদ্যা। দেবীর ভৈরব ক্ষীরকঠ। সমুদ্র মহনে কিথ উঠেছিল। শিব সেই বিষপান করে ‘নীলকঠ’ নাম ধারণ করেন, তারারূপে দেবী সন্যাদান করে শিবকে বিষমুক্ত করেন। দুধের আর এক নাম ক্ষীর। নীলকঠ হয় ক্ষীরকঠ। এই ক্ষীর হতে ‘ক্ষীর’ নামের উৎপত্তি। কেহ কেহ মনে করেন ‘ক্ষীর’ নাম বৈষ্ণব সংস্কৃতিযুক্ত। মাখিগ্রাম—মাখি + গ্রাম-মাখিগ্রাম। সংক্ষেপে মাখ গাঁ।

ক্ষীরগ্রামে ‘যোগাদ্যা’ ঠাকুরের প্রান্তনে প্রতিমাসের সংক্রান্তিতে ‘গুয়াডাকা’ নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন গ্রামের অগ্রহারিকগণ এই গুয়াডাকা অনুষ্ঠানে সমবেত হন। সকলকে ‘পানসুপারি’ দেওয়া হয়। অবশেষে ‘মাখ’ কথাটি উচ্চারিত হলে অনুষ্ঠান শেষ। এক শ্রেণীর অগ্রহারিক এই গুয়াডাকার ‘মাখ’ রক্ষা করতেন। যাঁরা মাখ রক্ষা করেন তাঁদের উপাধি ‘মাখি’। অগ্রহারিক মধ্যে ‘মাখ’ উপাধি লক্ষিত হয়। এই মাখ রক্ষাকারীদের গ্রাম হতে ‘মাখিগ্রাম’। সংক্ষেপে ‘মাখ গাঁ’ এই নামের দ্যোতক।

নিউ জার্সির প্রিস্টন ওয়ান-এর প্রিস্টন ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত জর্জ মাইকেল সম্পাদিত ব্রিক টেম্পলস্ অব বেঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ আছে :—

Princeton University Press, Princeton 1, New Jersey. 1982 48. The bangla

design was probably quite common for the entrance, only a few examples surviving, ek-bangla gateway to the Radha Madhava temple at Bishnupur, for bangla gateway to the jogadya temple at kshirgram.

Page 50 : Temples outside regular classification. On the Jogadya temple at Kshirgram the stephas has been repeated a second time higher up as an aesthetic feature.

বর্তমানে ক্ষীরগ্রামের নঁঘর সেবাইত আছেন। তার মধ্যে সনৎকুমার চক্ৰবৰ্তীদের বংশের পালা থাকে সাত মাস। প্রতি মাসে তাদের পালা থাকে ছুঁডিন।

দেবীর ভৈরব ক্ষীরকঠ। 'রাঢ়ের ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা' বইটির লেখক সনৎকুমার চক্ৰবৰ্তীর কাছে জানা গেছে, অনেক সাধক এই সতীপৌঠে সিদ্ধি লাভ করেছেন। অনেকেই আসনের মাঝে থাকা সুড়ঙ্গে বাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করেছেন। শেষ যিনি ওইভাবে আত্মত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়, তাঁর নাম গঙ্গাধর। ত্রী চক্ৰবৰ্তী জানান, তিনি দেহত্যাগ করেছেন অনেকদিন আগে। আমার বাবা-ঠাকুর্দা এই নাম শুনেছেন। পরে আমরাও শুনেছি। অনেক পঙ্গিতের ধারণা, ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরাপে কুজিকাতন্ত্র লেখা হয়। সেখানে ক্ষীরগ্রামের মা যোগাদ্যার কথা উল্লেখ আছে।

মন্দিরটি তৈরি হয়েছে একাদশ শতাব্দীতে। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের কিউরেটর মন্দিরের একটি ইট নিয়ে গবেষণা করে গবেষণালক্ষ বিষয়টি ১৯৬১ সালে কালনা কলেজ ম্যাগজিনে প্রকাশিত হয়। ওই রিপোর্টে তিনি উল্লেখ করেন যে, মূল মন্দিরটি একাদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়। মন্দিরের গোল গম্বুজটি তৈরিত্ব মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের আমলে। আনুমানিক সতরোশ চালিশের মধ্যে এটি তৈরি হয়।

নিখিলনাথ রায়ের 'মুশিদাবাদের কাহিনী' বইটি থেকে জানা যায়, ওরঙ্গজেব বাদশার আমলে হিজরি ১০৯০, ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুবদিহি নিবাসী উত্তররাট্টীয় কায়স্ত ও মিত্র বংশীয় সম্মুত গঙ্গাধীকারী উপাধিপ্রাপ্ত হরিনারায়ণ রায়, পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবীর সেবার বন্দোবস্তের জন্য ঘোলশত টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁর আর্থিক আনন্দক্লেই মা যোগাদ্যার সেবার কাজ চলত।

তার আগে হরিদত্ত নামে এক স্থানীয় জমিদার ছিলেন। তিনিই এই দায়িত্ব বহন করতেন। কথিত আছে, পাতাল থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন হনুমান এবং রামচন্দ্র এখানে মায়ের পুজো করেন। তখন দেবীর নাম ছিল ভদ্রকালী, পরে নাম হয় যোগাদ্যা। তবে কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায়, মায়ের নাম হল যুগাদ্যা। যুগাদ্যা নামটি এসেছে যুগশ : আদ্যা থেকে আর যোগাদ্যা হল যোগীনাং আদ্যা। যে, যেভাবে দেবীর ব্যাখ্যা করেছেন। আদি গ্রামটি ছিল দীঘির চারধারে, যেখানে মা শাখারিকে দর্শন দিয়েছিলেন। এই দীঘির আয়তন প্রায় একশ একর। বর্তমানে যেখানে মায়ের মন্দির রয়েছে, সেটি বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে গ্রামটি যখন আবিষ্কার হয়, তখন মাকে কেন্দ্র করে জায়গাটি গড়ে ওঠে। এখানে ব্রাহ্মণ, উগ্র-ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে

আসছেন। আপাতত আনুমানিক হাজার ছয়েক মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

তবে দেবীকে কেন্দ্র করে তেমন কোনও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেনি।

মাঘ মাসের সাকরী সপ্তমী তিথিতে এখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তখন দুর্জনকে বর কনে সাজানো হয়। এই বর কনের সাজে সেজে মালি (মালাকার) ও তাঁর স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ান। সেখানে বর্তমানে যাঁর বাড়ি তিনি তাঁদের বরণ করে নেন। এই পথা আজও চলে আসছে।

চৈত্রমাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত নির্দিষ্ট বাদ্যকারেরা মায়ের মন্দিরের সামনে গভীর রাতে (সাড়ে বারোটা-একটা-দেড়টা পর্যন্ত) বাজনা বাজান। সারা মাস তাঁরা হবিবান্ন খেয়ে থাকেন। পরিষ্কার কাপড় পরে ও সাতপুরু কাপড় কোমরে ও ঢোকে বেঁধে তাঁরা মন্দিরের সামনে যাবে। ওদের গন্তব্যস্থল সীমাবন্ধ থাকবে আটচালা আর মন্দিরের মাঝের জায়গা অবধি। জনশ্রুতি, এই সময় দেবীর চ্যালাচামুণ্ডারা বাজনার তালে তালে নৃত্য করে। তাই সেই দৃশ্য যদি কারও দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে ভয় পেয়ে যাবে। ওই ঢাকিরা সারা বছর গ্রামের বিভিন্ন জায়গায়, শিবের গাজনের সময় তারা যে তাল বাজায়, ওই সময় সেই বত্রিশটি তালই বাজিয়ে থাকেন। তিনশ বছর আগে এখানে নরবলি হত। ১৮৩৮ সাল থেকে নরবলি পথা রোধে আইন প্রণয়ন করা হয়। (এই প্রসঙ্গে জনশ্রুতির বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে)। তবে এখন নরবলি না হলেও বুক চিরে নরবলি মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।

আজও মায়ের থানে নানান অলৌকিক ঘটনা ঘটে। অনেকে আজও এখানে এসে হত্যে দেন। এমনও হয়েছে মায়ের ভোগের মাছ চিলে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যথস্থানে মাছটি রয়েছে, রাত দশটার পরে মন্দির চতুরে কেউ থাকেন না। নিত্য পূজার উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় ছোলা আর পাটালি। দুপুরে দেওয়া হয়, ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ-পায়েস। আজও একই নিয়মে চলেছে মায়ের পুজো। দেবী জাহ্নতা এ বিশ্বাস রয়েছে সকলের। যুগ যুগ ধরে এই সতীপীঠে মায়ের পূজার্চনা চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে।



মহাতীর্থ কালীঘাট

পীঠমালায় দেখা যায়, কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ পদাঞ্চলি পড়ে বলে জায়গাটি পীঠস্থান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানকার দেবতা কালী ও পীঠ রক্ষক ভৈরব নকুলেশ্বর। চৃড়ামণি তন্ত্রে বলা আছে,

নকুলেশঃ কালীঘাটে দক্ষপাদাঞ্চলিষ্য চ ।

সর্বসিদ্ধিরী দেবী কালিকা তত্ত্ব দেবতা ॥

সতী ম্লেহশত শিব-লিঙ্গরূপ ধারণ করে কালীঘাটে নকুলেশ্বর নামে বিরাজ করেন এবং ব্রহ্মা এখানে একটি কালীমূর্তি স্থাপন করেন।

নিগমকল্পের পীঠমালায় সুদর্শন ছিন্ন সতীঅঙ্গ কতটুকু কালীঘাটে পড়েছে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ত্রী মহাদেব উবাচ ।

“মাতঃ পরাংপরে দেবি সর্বজ্ঞন ময়ীশ্বরী ক্ষেত্রানাং কথ্যতে দেবি কালীক্ষেত্রং বিশেষত দেব্যুবাচ ।

“দক্ষিণেশ্বর মারভ্য যাবচ্ছবহলা পুরী ।

ধনুরাকার ক্ষেত্রঃ মোজনদ্বয় সংখ্যকঃ ।

তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারঃ ক্রেশমাত্রঃ বিদ্যাস্থিতঃ ।

ত্রিকোণে ত্রিগুণাকার ব্রহ্মাদিষ্ট শিবাশ্যকঃ ।

মধ্যে চ কালিকা দেবী মহাকালী প্রকার্তিতা ॥

নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র যত্র গঙ্গা বিরাজিতা ।

তত্ত্বে মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্লভঃ ॥

কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্র মভেদোপি মহেশ্বরঃ ।

কীটোপহি মরণেমুক্তি কিং পুনর্মানবাদযঃ ॥

ভৈরবী বগলা বিদ্যা (কালী) মাতঙ্গী কমলা তথা ।

ব্রান্তী মাহেশ্বরী চণ্ডীচাষ্টশক্তি বসেৎ সদা ॥

যে জায়গাকে এখন কালীঘাট বলা হয়, বিশেষ কোনও প্রাচীন নাম না থাকলেও তা যে পুরাণের ‘সমতট’ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ পশ্চিতেরা দক্ষিণ বাংলার রসাতল প্রবেশের বিষয়ে প্রমাণ দিয়েছেন (Physical Geography by S.A. Hill-Page-44)। তাদের মতে কলকাতা ও তার কাছের জায়গাগুলি ক্রমশ নীচের দিকে এগিয়ে গেছে। এসব জায়গায় প্রাচীন ক্ষেত্রগুলি ওপর দিক থেকে অনেকটাই বসে গেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, যে জায়গাটি এখন কালীঘাট

হিসেবে চিহ্নিত আছে, তার অনেক নীচের জমিতে অনেকদিন আগে মানুষেরা বসবাস করতেন। ক্রমশ রসাতলে চলে যাওয়ায় জায়গাটি মানবশূন্য হয়ে যায়। ফলে এই জায়গাটি আবার মানুষের বাসযোগ্য হওয়ার জন্য অনেক সময় লাগে।

মহাভারতে আছে জরাসন্ধের ছেলে সহদেব মগধে রাজত্ব করতেন। পুরাণে সহদেবের পরে অজাতশত্রু পর্যন্ত পঁয়ত্রিশজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। অজাতশত্রুর সময় বৃন্দদেব প্রাদুর্ভূত হন। এই সময় উত্তর বাংলায় সিংহবাহু নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বিজয় সিংহ প্রজাপীড়ন দোষে দৃষ্টিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও সভাসদেরা ষড়যন্ত্র করে তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। বিজয় সিংহ সাতশজন সঙ্গীকে নিয়ে সমুদ্র্যাত্মা করেন ও সিংহলে গিয়ে সেখানকার রাজা হন। বিজয় সিংহের যাত্রা বর্ণনায় দক্ষিণ বাংলার কোনও জায়গার নামের উল্লেখ নেই। হয়তো সেইসময় কালীঘাট ও তার আশেপাশের জায়গা গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। হিন্দুধর্মের প্রচারকেরা পৌরাণিক ও তাত্ত্বিক ধর্মের প্রচারে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অবনতির সময় ব্রাহ্মণেরা তাত্ত্বিক উপাসনার প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাতেন ও সাধারণ মানুষকে বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার জন্য প্রচার চালাতেন। বলা হয়, এই সময়ের আগে উপপুরাণ ও তন্ত্র সংকলিত হয়। অন্যদিকে ওইসময় তাত্ত্বিক কাপালিকেরা নির্বিবাদে বনের মধ্যে তন্ত্রশক্তির উপাসনা করতেন। তাই উপপুরাণ ও তন্ত্রে যে কালীক্ষেত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তা এই দক্ষিণ বাংলার কালীঘাটের নামান্তর মাত্র। তন্ত্রে বচনে (৩২ পৃষ্ঠায়) এর উল্লেখ আছে। সূতরাং, সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, এই সময়ের অনেক আগে এবং বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পরে কালীপীঠের প্রকাশ হয়েছিল।

অনুমান করা যায়, হিন্দু বগিকেরা যখন জলপথে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, বালি প্রভৃতি জায়গায় ব্যবসা করতে যেতেন তখন অনেকেই কালীক্ষেত্রে পুজো দিয়ে যেতেন। মাঝি মাল্লরা কালীক্ষেত্রের তীরে যেখানে নৌকা রাখতেন সেই জায়গাকে কালীদেবীর ঘাট বা 'কালীর ঘাট' বলা হত। ক্রমে সেই জায়গাটি কালীঘাট নামে পরিচিত হয়।

কালীঘাটের কালীমূর্তি আবিষ্কারের প্রসঙ্গে অনেকগুলি কিংবদন্তী আছে। এর অন্যতম হল :

প্রায় তিনশ বছর আগে কালীঘাটের মন্দির তৈরি হয়। সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশের কোনও ব্যক্তি ওই অঞ্চলে বিশেষ সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি, ওই জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দির তৈরি করান ও মা কালীর সেবায় ১৯৪ একর ভূসম্পত্তি দান করেন। একমতে, চণ্ডীবর নামে এক ব্যক্তির প্রথম মা কালীর সেবার জন্য পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন। মা কালীর বর্তমান সেবাইত ও অধিকারী হালদারেরা এই চণ্ডীবরের সন্তান। (দ্রষ্টব্য : W.W. Hunter, statistical account of Bengal, Vol 1, Page 101)।

ডবলু ডবলু হান্টার চণ্ডীবরকে মায়ের প্রথম সেবাইত হিসেবে চিহ্নিত করলেও এ

সম্পর্কে ভিন্নমত রয়েছে। অন্যমতে, খনিয়ান গ্রামের সুরাইমেলের কাশ্যপ গোত্রীয় চণ্ডীবর কালীঘাটের প্রথম সেবাইত ছিলেন না। চণ্ডীবরের ছেলে পৃথীধর তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে আর বাড়ি না ফেরায় ভবানীদাস বাবাকে খুঁজতে কালীঘাটে আসেন। তখন যশোরের কায়স্থ রাজা বসন্ত রায়ের গুরু ভূবনেশ্বর বন্দ্যাচারী কালীঘাটে মা কালীর সেবাইত ছিলেন। ভবানীদাস স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ভূবনেশ্বরের অনুরোধে তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে কালীঘাটে বসবাস করতে থাকেন। কিছুদিন পরে ভবানীদাসের, রাজেন্দ্র নামে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে ভবানীদাসের, রাজেন্দ্র নামে আরও একটি ছেলে হয়। ভূবনেশ্বর বন্দ্যাচারীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাই ভবানীদাস মা কালীর সেবাইত নিযুক্ত হন। তখন ভবানীদাসের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যাদবেন্দ্র কালীঘাটের কাছে গোবিন্দপুরে বসবাস করতে শুরু করেন।

তথ্যভিত্তি মহলের ধারণা, চণ্ডীবর পঞ্চদশ শতকের শেষ বা ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে সেখানে থাকতেন। বড়শার সাবর্ণ জমিদারেরা সপ্তদশ শতকের প্রথমে মানসিংহের কাছ থেকে জমিদারী পান। কাজেই সাবর্ণ জমিদারদের চণ্ডীবরকে কালীর সেবাইত নিযুক্ত করা সন্তুষ্ট নয়। কালীর বর্তমান সেবাইত হালদারুর চণ্ডীবরের সন্তান শুনেই হান্টার সাহেব সন্তুষ্ট চণ্ডীবরকে মা কালীর প্রথম সেবাইত বলেছেন।

শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ‘প্রাচীন কলিকাতা’ বইতে লিখেছেন,

কালীকাদেবীর আবিক্ষার ও প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর (যাঁর নামানন্দসারে ওই জায়গা আজও চৌরঙ্গী নামে পরিচিত) বিবরণ—প্রদীপ প্রস্তুতে উল্লেখ করা আছে। ওই গ্রাহনসারে পনেরোশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোবিন্দপুরে (তখনকার কালীঘাট) মা কালীর পূজার্চনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে আর একটি তথ্যের সংযোজন করা প্রয়োজন। লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় (সাবর্ণ চৌধুরী) মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) কাছ থেকে জায়গীর পাওয়ার পর বেহালা গ্রামে বাস করতে শুরু করেন। তিনিই বর্তমান কালীঘাটের মন্দির তৈরি করার দ্বা হাত করেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গোবিন্দপুরে মা কালীর পূজা শুরু হওয়ার অর্থ হল বর্তমান মন্দির তৈরির আগেই সেখানে মা কালীর পূজো করা হত। কারও কারও মতে, গোবিন্দপুরে পুরনো ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ছিল। তাদের মতে, মা কালীর মন্দির গোবিন্দপুর থেকে বর্তমান কালীঘাটে স্থানান্তরিত করা হয়।

লেখক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, গোবিন্দপুরের পুরনো নাম কালীঘাট এবং বর্তমানে যেখানে জি.পি.ও. (জেনারেল পোস্ট অফিস) আছে সেখানেই ছিল মা কালীর মন্দির। আবার অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, সাবর্ণ চৌধুরীর জীবদ্ধায় ফোর্ট উইলিয়াম তৈরি হয়। প্রশ্ন জাগে, সাবর্ণ চৌধুরী বলতে লেখক কি লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়কে বুবিয়েছেন? তাহলে তো ওই সময় লক্ষ্মীকান্তের

জীবিত থাকার কথা নয়। কারণ তিনি ১৫৭০ থেকে ১৬৭৯ স্বীষ্টাব্দ অবধি জীবিত ছিলেন অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পরে ১৬৯০ স্বীষ্টাব্দে জব চার্চক কলকাতায় আসেন।

প্রমথনাথ মল্লিক তাঁর ‘কলিকাতার কথা’ বইতে (আদি কাণ্ড পৃষ্ঠা ১—২) লিখেছেন, কালীদেবী কবে কলকাতা হইতে কালীঘাটে যান তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া দুরহ, তবে এই পর্যন্ত শোনা যায় ও প্রবাদ এই যে, বর্তমান পানপোস্তার উভরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল। সেই পুরাতন পাথরে বাঁধান ঘাট হইতে বর্তমান পাথুরিয়াঘাটাটার নাম হইয়াছে। সেকালে বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড গঙ্গার গর্ভে ছিল। কবিকঙ্গের চন্তুতে ঐ ঘাটের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাত্রীর ও হাটের কথা আছে। ২০৩ নং দরমাহাটা স্ট্রীটে ঠিক পানপোস্তার উভরে, দেবীর পুরাতন মন্দির পূর্বে সেইখানেই বর্তমান ছিল (২৩৫ নম্বর দরমাহাটায় শিবের মন্দির আছে)। কাপালিকেরা দেবীকে কালীঘাটে লইয়া যায়। সেকালে তাহাদিগকে সকলেই বড় ভয় করিত, কারণ তাহারা দেবীর নিকট নরবলি দান করিত, তাহাতে তখন কেহই তাহাদের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। শোনা যায় যে, ঐ স্থানের অধিকারীগণের পূর্বপুরুষ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দেবীর স্বপ্নাদেশে সেই জায়গায় তাঁহার মন্দির ছিল জানিতে পারে ও তাঁহার পূজাদি করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি ঐ বংশের সকলেই পৃথক হইয়া গেলে তাহারা পৃথক পৃথক কালীপূজা করিয়া থাকে। তাহারা দুর্গাপূজা সেরূপ করে না। বর্তমান বসতবাট্টি হইবার পূর্বে ঐখানে সাগর দন্তের পাটের কল ছিল, উহাতে তিনবার আগুন লাগিয়াছিল ও বর্তমান বসত বাড়িতে বজ্রাঘাত করে।

প্রমথনাথ মল্লিক জানিয়েছেন, কালীকাথা থেকে কালীকাথা পরে কলিকাতা হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, কালীদেবী কলিকাতা হইতে কালীঘাট যান তাহার সবিশেষ তথ্য অবগত হওয়া দুরহ। এইপর তিনি অনুমান করে বলেন, বর্তমান পানপোস্তার উভরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল এবং এই পাকাঘাটই বাঁধানো বলে পাথুরিয়াঘাটের নাম হয়।

কিন্তু এই নাম পাথরে বাঁধানো থেকে হয়নি। হয়েছে অন্য কারণে। ধর্মানন্দ মহাভারতী ‘বঙ্গের রাজবংশ’ গ্রন্থের ‘কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা’ রাজবংশ অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ১৯) পাথুরিয়াঘাটার নামকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

বিহার, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্চাব প্রভৃতি নানাস্থানে কুলটাকামিনী অথবা ব্যবসায়িনী বেশ্যার অপর নাম পাথুরিয়া। পতিতাদের পশ্চিমের মানুষজন ভদ্রভাবে ‘পাথুরিয়া’ নামে সম্মোধন করে। পুরাণ প্রসিদ্ধ অহল্যা, যিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাপমুক্ত হয়েছিলেন, কুলটাপরাধে অভিশাপগ্রস্তা হয়ে পাথরে পরিণত হন। এই পাথর শব্দ থেকে পাথুরিয়া শব্দের উৎপন্নি। হিন্দি ভাষায় ‘ঘাটা’ অর্থে পাড়া, পল্লী অর্থাৎ মহল্লা বোঝায়। সেই অর্থে পাথুরিয়া শব্দের সঙ্গে ঘাটা যোগ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কালীঘাট ইতিবৃত্ত' বইতে (পৃষ্ঠা ৩৬-৪৩) অন্য ধরনের কিংবদন্তীর সম্ভান পাওয়া যায়—

শঙ্করাচার্য মঠের দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সন্ন্যাসী বহস্থান পর্যটন করিতে একদা ব্রহ্মানন্দগিরির আশ্রমে (নীলগিরি পর্বতে) উপস্থিত হইলেন। নবাগত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি পরমযত্ন সহকারে তাঁহার আদর যত্ন ও অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর তাঁহার ঐ স্থানের আগমনের উদ্দেশ্য ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মচারী নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আমি দেবী—ভাগবতে ও লিঙ্গ পুরাণাদি মাঠে অবগত হইয়াছি যে, দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেহ বিষুণ্ডক্ষ দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, উহা এক একটি মহাপীঠে পরিণত হইয়াছে এবং কালীঘাট নামক স্থানে পূজিত দেবীর দক্ষিণপদাঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহা সকল পীঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ। ঐ স্থানে দেবাসূর যুদ্ধের সময় পদ্মযোনি ব্রহ্মা বহকাল যাবত তপস্যা করিয়া অভিলাষিত ফললাভ করিয়াছিলেন। আমি বহস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশ্যে উক্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত তপস্যাচরণ করিতেছিলাম। একদা রাত্রি শেষে মহামায়া দশম বর্ষীয়া কুমারীরূপে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে এই আদেশ করিলেন যে, বৎস ! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি। তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর। আমি বহকাল্যবধি জনমানবহীন নীলগিরি পর্বতে ব্রহ্মানন্দগিরি মামক এক কঠোর তপস্থীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এক শিলাস্তম্ভে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তুমি শীঘ্ৰ এই ব্রহ্মানন্দ গিরির নিকট গিয়া তাহাকে বুকাইয়া সেই শিলাস্তম্ভকে তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস এবং তুমি যে বেদীতে বসে তপশ্চর্য্যা করিতেছ এই প্রস্তুবেদীর উপর আমার ঐ শিলাতে মূর্তিময় কালী অঙ্গিত ও স্থাপন করিয়া ভজমানবে আমার মাহাত্ম্য প্রচার কর। আমি এস্থানে করালবন্দনা কালীরূপে আবির্ভূতা হইব। সন্ধিকটে যে হৃদ দেখিতেছ তাহার নৈঝৰত কোণে আমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি চতুর্ষয় পাষাণ অবস্থায় নিমজ্জিত রহিয়াছে। উহা উদ্ধার করিয়া বেদীমূলে নিহিত করিও। দুশাণ কোণে গভীর অরণ্যে পীঠাধীশ নকুলেশ নিঙ্গৱনপে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাকেও আবিষ্কার করিও। যাও তুমি অনতিবিলম্বে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।'

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলে....বহুদিবস যাবৎ অশেষ কষ্ট স্থীকার করিয়া...অদ্য আপনার দর্শন লাভ করাতে ব্রহ্মাময়ীর চরণগোদ্দেশ্যে আমার মস্তক অবনত হইতেছে। সন্ন্যাসীদ্বয় দৈববাণী অনুযায়ী শিলাস্তম্ভের উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং কতক্ষণ পরে চক্ষু উন্মালিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার তীরবতী কালীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন...তদনন্তর তাঁহার দেবীর আদেশানুযায়ী ঐ শিলাস্তম্ভে (দৈর্ঘ্য ১২ হাত প্রস্থ ২ হাত বেড় ১^১/_২ হাত) কালিকামূর্তি অঙ্গিত করিয়া বেদীর উপর স্থাপন করিলেন এবং প্রত্যহ যথাবিধি পূজার্চনা করিতে লাগিলেন।'

আত্মারাম কাশীশ্বরের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। কাশীশ্বর কেশবরামের বাবা

শ্রীমন্তের (১৬২৫-১৬৮১) ভাই। সুতরাং অনুমান করা যায়, আঘারাম সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জীবিত ছিলেন। বাংলাদেশের যেসব তত্ত্বসাধক তত্ত্বের বই লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণনন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণানন্দের নাম পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ ঘোড়শ শতকে জীবিত ছিলেন। চিন্তাহরণ চক্ৰবৰ্তী ‘তত্ত্বকথায়’ (পৃষ্ঠা ৩৬) ব্রহ্মানন্দ সম্পর্কে লিখেছেন: পূর্ণানন্দের গুরু ব্রহ্মানন্দগিরি আনুমানিক শ্রীষ্টীয় ঘোড়শ শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের জন্মের আগে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর ‘মনসাবিজয়’ ও সমসাময়িক কবিকলন মুকুন্দরাম চক্ৰবৰ্তীর ‘চণ্ডীমঙ্গলে’ কলকাতা এবং কালীঘাটের নাম পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত একটি চিঠির উল্লেখ করা হচ্ছে :

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কামদেব ব্রহ্মচারীর বৎসর বেহালার হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরীর ছেলে সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছে জীর্ণ অবস্থায় চিঠিটি পান। চিঠিটি তিনি তাঁর ‘কলিকাতা সেকালের ও একালের’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৪) প্রকাশ করেন। নীচে চিঠির অংশ দেওয়া হল :

বঙ্গদেশে গোঘাটা গোপালপুর গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। শৈশবাবধি আমি আমার আচার্যের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া, সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ স্তু পদ্মাবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মচারী বেশধারণ পূর্বক, ইষ্ট সামুন্দৰ্ষ, পীঠমালাগ্রহে লিখিত ‘বঙ্গদেশে চ কালিকা’ অর্থাৎ আদি গঙ্গাতীরে যে স্থানে সতী-অঙ্গ পতিত হয়, তাহা নিরকরণার্থে ও বিশ্বকর্মা নির্মিত পাষাণময়ী মৃত্তিক তাঁহার রক্ষক যে অনাদিলিঙ্গ-ভৈরবে প্রকাশ আছে, তাহা জানিবার জন্য, মাঘৰা পরগণার অন্তর্গত আদি গঙ্গাতীরে স্থান নির্ণয়পূর্বক অরণ্যমধ্যে একটি পর্ণকুটির নিম্নাধ পূর্বক তথায় স্তু পুরুষে—ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন ছিলাম। প্রতিপর্বে নিশিতে, যথানিয়মে দেবীর অর্চনা করিতাম। একদা আমি পরমতত্ত্ব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পঞ্চ পদ্মাবতী কহিলেন—‘একি আশ্চর্য! এতদিন এখানে বাস করিতেছি, এরপ আশ্চর্য্য অলৌকিক দৃশ্য কখনও তো নয়নগোচর হয় নাই। এই কথা বলিয়া আমাকে সম্মোধনপূর্বক বলিলেন, ‘প্রভো! রাত্রি কি শেষ হইয়াছে? পূর্বদিকে অরূপোদয়ের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কি পদার্থ দেখিতেছি? আপনি ঐ দেখুন।’ এই কথা আমার কর্ণগোচর হইবামাত্র, আমি কুঠির দ্বার হইতে পূর্বদিকে দৃষ্টিনিষ্কেপ করিলাম, কিন্তু ঐ ব্যাপার আমার নয়নগোচর হইল না। ‘কৈ কি দেখিলে বলিয়া প্রশ্ন করায়—বগিতা বারস্বার—‘ঐ দেখ ঐ দেখ’ বলিতে লাগিলেন। আমার দুর্ভাগ্যবশত কিছুই নয়নগোচর হইল না। আমি তৎক্ষণাত্মে ভূমিশয্যায় পতিত হইয়া, অনশনব্রতে জগদস্বার আরাধনা করায়, তৃতীয় দিবসান্তে ঐরূপ নিশাকালে দৈববাণী হইল—‘তুমি জন্মাস্তরে আমার দর্শনলাভ করিবে আর পদ্মাবতী দেহান্তে আমাতে লীন হইবে। তোমার ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে এক অতি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। সেই পুত্র এ প্রদেশের ভূমাধিকারী ও অতুল ঐশ্বর্যশালী হইবে এবং তাহার বৎস হইতে আমার সেবাদি প্রকাশ হইবেক। তদন্তর

କିମ୍ବାଦିବସ ମଧ୍ୟେ ପଞ୍ଚାବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ହଇୟା ସଥାକାଳେ ସୁଲକ୍ଷଣ୍ୟୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିଯାଇ ସ୍ଵର୍ଗାରୋହଣ କରିଲେ ଆମି ତାହାର ସଥାରୀତି ଅନ୍ୟୋଟିକ୍ରିୟା ସମାପନ କରିଯା, ଏଇ ନବପ୍ରସ୍ତ ପୁତ୍ରେର ଜୀବିକାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିତେଛି। ଇତିମଧ୍ୟେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟିରେ ଚାଲ ହଇତେ ଏକଟି ଜ୍ୟେଷ୍ଠିର ଡିମ୍ବ ପତିତ ହଇୟା ଭାଙ୍ଗିଯା ଗେଲ । ଏଇ ଅନୁନିହିତ ଶାବକ ତ୍ରମଶ ସବଳ ହଇଲେ, ଏକଟି ପିମ୍ପିଲିକା ହଠାଂ ଉହାର ସମ୍ମୁଖବତୀ ହଇବାମାତ୍ର ସେ ଅନାୟାସେ ଧରିଯା ଭକ୍ଷଣ କରିଲ । ଆମି ମହାମାୟାର ମାୟା ବୁଝିତେ ପାରିଯା ଜଗଦୀଶ୍ଵରୀକେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିତେ କୃତାଙ୍ଗଲିପୁଟେ ବଲିଲାମ—'ମାତଃ ! ସୃଷ୍ଟି, ଶ୍ରିତି-ପ୍ରଲୟକାରିଣୀ ! ତୋମାର ସୃଷ୍ଟ ଜୀବନ, ତୋମାରଇ ପାଲନାଧୀନେ ଥାକିଲ ।' ଏଇ ବଲିଯା ଅପତ୍ୟମାୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଯା ଶାସ୍ତ୍ରମୟତ ବସ୍ତ୍ରଚର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀତ୍ରୀ କାଶୀଧାମେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିଲାମ । ପୁତ୍ରଃ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ହଇଲେ ତାହାର ଜନ୍ମବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ହଇୟା ଦୈବବାଣୀ ସକଳ ପ୍ରକାଶ କରଣାର୍ଥେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଲାମ ।

ଇତି

ସାରଣ୍ମୁନିର ସନ୍ତାନ

ଶ୍ରୀକାମଦେବ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ

ଏକାନ୍ନ ପୀଠେର ଅନ୍ୟତମ କାଲୀଘାଟ । ଦକ୍ଷିଣ କାଲୀ ଏଇ ପୀଠେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ । ପୀଠ ଭୈରବ ନକୁଲେଶ୍ୱର ।

କାଲୀଘାଟେର ଉତ୍ତରସୀମା କାଲୀଘାଟ ରୋଡ ଓ ବଲରାମ ବସ୍ତୁଟିରୋଡ, ପୂର୍ବସୀମା ରସା ରୋଡ (ବର୍ତ୍ତମାନେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ହେଁଯେଛେ), ଦକ୍ଷିଣସୀମା ନେପାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେନ ଓ ପଶ୍ଚିମସୀମା ଆଦିଗଞ୍ଜା (ଟଲିସନାଳା) । ତବେ ଭବାନୀପୁରେର ଦକ୍ଷିଣ, ବେଲତଳାର ପଶ୍ଚିମ, ସାହାନଗରେର ଉତ୍ତର ଓ ଆଦି ଗନ୍ଧାର ସୀମାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲୀଘାଟ ନାମେ ଚିହ୍ନିତ ହେଁ । କାଲୀଘାଟ ଓ ସଂଲପ୍ନ ସ୍ଥାନେର ଛଶ ବିଦ୍ୟା ଜୟମ ମା କାଲୀର ଦେବୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦି । ଏରମଧ୍ୟେ କାଲୀର ପୁରୀ ଅର୍ଥାଂ କାଲୀମନ୍ଦିର, ନାଟମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୃତି ଜାୟଗ୍ରେ ସବକୁଣ୍ଠିତ । । । । ୧୯ ଏକ ବିଦ୍ୟା ଏଗାରୋ କାଠା ତିନ ଛଟାକ ଜମିର ମଧ୍ୟେ ସୀମାବନ୍ଦ ରହେଛେ । ମନ୍ଦିରେର ପୂର୍ବଦିକେ କାଲୀକୁଣ୍ଠ ହୁଦ । ପଶ୍ଚିମଦିକେ ତୋରଣ ଦ୍ୱାର, ସାମନେ ଗନ୍ଧାର ଘାଟ । ତୋରଣ ଦ୍ୱାରେ ଓପରେ ନହବେ ଥାନା । ମନ୍ଦିରେ ଦ୍ୱାରା କୋଣେ ପ୍ରାୟ ଦୁଃଖ ହାତ ଦୂରେ ନକୁଲେଶ୍ୱର ଭୈରବେର ଅବସ୍ଥାନ ।

ମା କାଲୀର ଦୈନିକ ସେବାକାଜେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାକେନ ପାଣ୍ଡ ହାଲଦାରେରା । ଯେଦିନ ଯାର ପାଲା ପଡ଼େ ସେଦିନ ତିନି ପୁଜୋର ଆୟୋଜନ କରେନ । ଏହାଡ଼ା ବେଶକାର, ମିଶ୍ର, ପୁରୋହିତ, ଘୋଡ଼େଲ, ଚୌକିଦାରଦେର ତତ୍ତ୍ଵବଧାନ କରେନ ହାଲଦାରେରା । । ୧୮୮୮ ସାଲେ ମିଉନିସିପ୍‌ପ୍ଲାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାଲୀଘାଟ କଲକାତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଁଯେଛେ ।

ଆଗେଇ ଉପ୍ରେକ୍ଷ କରା ହେଁଯେଛେ, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଥେକେ ବହଳା (କାଲୀଘାଟେର ଦକ୍ଷିଣଦିକେ ରାଜପୁରେର ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଦିକେ ଆକଳା ଗ୍ରାମେର କାହେର ଜାୟଗ୍ରେ ବୋଲପୂର ନାମେ ଏକସମୟ ପରିଚିତ ଛିଲ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁ'ଯୋଜନ ଧନୁକାକାର ଜାୟଗ୍ରେ କାଲୀକ୍ଷେତ୍ର ହିସେବେ ଚିହ୍ନିତ ହେଁ ଆଛେ । ତାର ମଧ୍ୟେ ଏକ କ୍ରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାପୀ ତ୍ରିକୋଣାକାର ଜାୟଗ୍ରାହ ତ୍ରିକୋଣ ବ୍ରକ୍ଷା, ବିଷ୍ୱଔ ଓ ଶିବ ଏବଂ ମାୟାଧାମେ ମା କାଲୀ ବିରାଜ କରେନ । ଶୋନା ଯାଯ, ସତୀର ପାଯେର ଯେ ଆଙ୍ଗୁଳ କାଲୀଘାଟେ ପଡ଼େଛିଲ ତା ଆଜଓ

মন্দিরের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। প্রতিবছর স্নান যাত্রার সময় ও অস্মুবাচির শেষদিনে মায়ের পায়ের ওই আঙুলের যথাযথভাবে অভিষেক হয়ে থাকে।

কেউ কেউ অবিশ্বাস করেন এই বিষয়ে। কিন্তু ইজিপাটিয়দের সংরক্ষিত মমি তাহলে কিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। আশা করা যায়, শব সংরক্ষণী বিদ্যা প্রাচীন ভারতের মানুষের অজ্ঞান ছিল না। দেবিভাগবতের ১১ অধ্যায়ে এবিষয়ের উল্লেখ আছে,

‘ভূমৌনিপতিতা যেতুজ্ঞানাবয়বাঃ ক্ষণাত্।
জগ্মঃ পাষাণভাঙ্গ সর্বে লোকানাং হিতহেতবে॥।

অর্থাৎ লোকহিতের জন্য সতীর ছায়াদেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ মাটিতে পড়ামাত্র পাথরে পরিণত হয়েছিল। কালীপীঠ তত্ত্ব বিশেষে শ্রীপীঠ বা ওঁকারপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু এখানে সতীর পায়ের আঙুল পড়েছে, তাই অনেকে এই পীঠকে শ্রেষ্ঠপীঠ বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই বিষয়ে তত্ত্ব থেকে উদ্ভৃত শ্লোকটি উল্লেখ করা হল,

দেব্যাঃ কেশচয়ো নিরীক্ষাপতিতান् দেবান মুনীন
পাদযোঃ।

সর্বরাধ্য তয়াচ তত্র পরমোভুক্তং বিদ্বাপতৎ॥।

সা কালীচরণাং গতস্য-কারণং নোবন্ধনং সন্তবৎ।

ইত্বাবেদয়িতুং ববন্ধ নিচতৎ তস্মুক্ত কৈশীবভোঃ॥।

দেবতা ও মুনিদের মা কালীর পায়ের তল্লাখ পড়ে থাকতে দেখে দেবী মুন্ডবেশী হলেন।

শাস্ত্রে ত্রিবিধ শক্তি পুজোর উল্লেখ আছে। সাত্ত্বিক, রাজসী ও তামসী।

কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে,

‘চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।

সাত্ত্বিকী, রাজসীবৈ তামসী চেতি বিশ্রান্তি॥।

সাত্ত্বিকী যপযজ্ঞাদ্যনৈর্বৈদ্যৈশ্চ নিরামিষ্যেঃ

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণদিষ্যু কীর্তিতং॥।

পাঠস্তস্য যপ প্রোক্ত পঠেন্দে বামনস্তবা।

দেবীমুক্ত যপশৈচৰ যজ্ঞোবহিষ্যু তর্পনং॥।

রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামুবৈস্তথা॥।

সূরা মাংসাদুপহারৈ যপযজ্ঞে বিনাতু যা॥।

বিনামন্ত্রেস্তামসী স্যাংকিরাতা নাস্তসম্ভতা।

ত্রাঙ্কনৈঃ ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যেঃ শূদ্রেরন্যেশ্চ সেবকৈঃ॥।

যপ, যজ্ঞ, মাহাত্ম্যাদি পাঠ ও নিরামিষ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পুজোর নাম সাত্ত্বিক পূজা।

আর যপ, যজ্ঞ ব্যতীত কেবল বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য ও মদ্যাদি দ্বারা এবং দেবীর মাহাত্ম্যাদি পাঠ দ্বারা পূজার নাম রাজসী। তামসিক পূজা বিনামন্ত্রে হয়ে থাকে।

শিব-শক্তি অর্থাৎ কালী তারা প্রভৃতি দশম মহাবিদ্যার উপাসনাই শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। শক্তি পুজোর বিধি ব্যবহৃতি। তত্ত্বাত্মক বিশেষভাবে বর্ণনা করা আছে। তদ্বাচ্ছন্দ উপাসনা বৈদিক উপাসনা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাত্ত্বিক উপাসকেরা দেবীর প্রতিমা তৈরি করে মন্ত্রের দ্বারা তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অধিকারী বিশেষে সান্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক বিধানে তার পূজো করে থাকেন। তাত্ত্বিক উপাসনায় গুরু শিষ্যকরণ একটি প্রধান নিয়ম, তাত্ত্বিক গুরুরা-শিষ্যদের দীক্ষা দেওয়ার সময় ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্র দেন। প্রত্যেকের দেবতা ও বীজমন্ত্র আলাদা আলাদা। বীজ মন্ত্রগুলি অতীব গুহ্য। তা গোপন রাখবার জন্য তত্ত্বে অনেক নতুন নতুন সাক্ষেত্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই শব্দের অর্থ তন্ত্র ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

মনুর সময়ে প্রয়াগ পর্যন্ত আর্য। ধিকার বিস্তৃত হয়েছিল। মনুসংহিতায় পৌগুদেশকে পতিত ক্ষত্রিয়ের বাসস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পৌড়ি উত্তর বাংলার অতি প্রাচীন নাম, রামায়ণে গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রমের কথা বলা আছে। মহাভারতে দক্ষিণ বাংলার অন্তর্গত তাত্ত্বলিষ্ট প্রভৃতি কয়েকটি জ্যাগার কথা জানা যায়। কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারতের কথা জানা গেলেও কালীঘাটের নাম পাওয়া যায় না। কালীঘাটের কিছু দূরে তাত্ত্বলিষ্ট বা কপিলাশ্রমের কথা জানা গেলেও কালীঘাটের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টের দাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহসনে আসীন ছিলেন। এই সময় অসংখ্য নারী-পুরুষ পূর্ণ দ্বারের অশায় কালীক্ষেত্রে গঙ্গাস্নানের জন্য আসতেন। গৌড়ের সেন বংশীয় রাজাদের মুক্ত কয়েকটি অনুশাসন পত্রে জানা গেছে, তাঁরা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। সেসময় রাজকাজের সুবিধার জন্য বল্লাল সেন বাংলাকে পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন।

- ১। রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ।
- ২। বাগড়ি—পদ্মার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্ব।
- ৩। বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তর এবং করতোয়ার পশ্চিম ও মহানন্দার পূর্ব।
- ৪। বঙ—করতোয়া ও পদ্মার পূর্বদিকের প্রদেশ।
- ৫। মিথিলা—মহানন্দার পশ্চিম।

তথ্য অনুসন্ধানের মারফত জানা যায়, বাগড়ি বিভাগ যা বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বিভাগের অন্তর্গত ছিল কালীঘাট।

পীঠস্থান হিসেবে প্রকাশিত হবার অনেকদিন পরেও কালীঘাট গহন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেই সময়ে ভৈরবী, কাপালিকেরা এই গহীন অরণ্যের মধ্যে নরবলি দিয়ে মা কালীর পূজো করত। আদিসুর কর্তৃক এদেশে ব্রাহ্মণদের আনার পর থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টের একাদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ଲଘୁ ଭାରତେର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ବଲା ହେଁଛେ,

‘ବେଦବାଣିକ ଶାକେତୁ ଗୌଡ଼େ ବିପ୍ରାଃ ସମାଗତାଃ । ଘଟକଦିଗେର କୁଳପଞ୍ଜିକା । ୧୫୪ ଶକ,
୧୦୩୨ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦ

ଆଦିସୂର ସ୍ତଦାତସ୍ୟ ସଭାସମ୍ଭାବୀନାସ୍ଵରଃ ।
ସହାୟ ଶ୍ଵଶୁର ସୈବ ବୀରସିଂହ ନିରାଷବାନ୍ ॥
ଗୌଡ଼େ ପାଲ ମହିପାଲ ବଂଶାନୁଚ୍ଛଦ୍ୟ ତୃତୀୟ ।
ପାଲବଂଶାନେ ଗୌଡ଼େ ସ୍ଵୟଂ ସ୍ଵାଧୀନତାଂଗତଃ ॥

ଉପପୁରାଣ ଓ ତତ୍ତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ରଗୁଲିତେ କାଲୀକ୍ଷେତ୍ର ବା କାଲୀପୀଠେର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଓଯା ଯାଏ । ଭାରତେର
ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରାଧାନ୍ୟେର ସମୟ ସବ ଧର୍ମନୁରାଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣେରା ପୌରାଣିକ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଶୁରୁ କରେନ ।
ସେଇ ସ୍ଵତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବଲା ଯାଏ, ଦୁଃହାଜାର ବହୁ ଆଗେ କାଲୀଘାଟେର ପ୍ରକାଶ ହେଁଛି । କିନ୍ତୁ
ଏହି ସମୟ ଏହି ଜାଯଗାର ନାମ କାଲୀଘାଟ ହେଁନି ତବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରେର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ବଲା
ଯାଏ, ପାଲ ବଂଶୀୟ ବୌଦ୍ଧ ରାଜଦେର ରାଜତ୍ତେର ସମୟେ ଅର୍ଥାଂ କମପକ୍ଷେ ଏକ ହାଜାର ବହୁ
ଆଗେ ଏହି ଜାଯଗାଟି କାଲୀଘାଟ ନାମେ ଚିହ୍ନିତ କରା ହେଁ ଥାକେ ।

ଦିଲ୍ଲିର ମୁସଲମାନ ସ୍ତରାଟ ଆକବରେର ରାଜତ୍ତକାଳେ ଅର୍ଥାଂ ଖ୍ରୀସ୍ଟେର ଘୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ଶେଷଦିକେ ଆବୁଲ ଫାଜଲ “ଆଇନି ଆକବରି” ଗ୍ରହ ରଚନା କରେନ । ଆଇନି ଆକବରି ପଥେ
ସାତଗୀର ମଧ୍ୟେ କାଲୀକୋଟା ନାମକ ଜାଯଗାର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଓଯା ଯାଏ । ମୁକ୍ତଦିଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଭାଗେ
ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଯ ସୁତାନଟି, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପ୍ରଭୃତି ଭାଗୀରଥୀର ତୀରେ କଯେକଟି ହାମ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଧାନ
ସ୍ଥାନ ହେଁ ଓଠେ ଇସ୍ଟ ଇଞ୍ଜିଯା କୋମ୍ପାନୀର କୁଠିର ଅଧ୍ୟାକ୍ଷ ଜବାର୍କ ହୁଗଲୀ ଥିକେ ଇଂରେଜଦେର
୧୮୮୬ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦେ ସୁତାନଟିତେ ନିଯେ ଅମେରିକାପରେ ୧୬୯୦ ଖ୍ରୀସ୍ଟାବ୍ଦେ ଇଂରେଜରା କାଲୀକୋଟା
ନାମକ ଜାଯଗାଯ ବାଣିଜ୍ୟେର ଜନ୍ମ ନିଜଦେର କୁଠି ତୈରି କରେନ । ସେଇ ସ୍ଵତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜାନା
ଯାଏ, କାଲୀକୋଟାର ଅବସ୍ଥାମ ସୁତାନଟିର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁରେର ଉତ୍ତରରେ । ସୁତାନଟି ବର୍ତମାନେ
କଲକାତାର ଉତ୍ତରାଂଶେ । ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଏଥନକାର ଟ୍ୟାକଶାଲ । ଗୋବିନ୍ଦପୁରେର (ବର୍ତମାନ
ଫୋର୍ଟ ଉଇଲିଯାମ ଓ ତୃତୀୟ ଜାଯଗାଯ) ଉତ୍ତର ସୀମା କଲକାତାର ଲାଲଦୀଘି ଓ ହେୟାରସ୍ଟିଟ୍ ।
ଅର୍ଥାଂ ବର୍ତମାନ କଲକାତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେୟାରସ୍ଟିଟ ଓ ଟ୍ୟାକଶାଲେର ଜାଯଗାଟି ହଲ କାଲୀକୋଟା ।
ଆଇନି ଆକବରି ପ୍ରଣେତା ଆବୁଲ ଫଜଲ ସୁତାନଟିର ଦକ୍ଷିଣେ ବର୍ତମାନ କଲକାତା, କାଲୀଘାଟ-
ଭବନୀପୁର ପ୍ରଭୃତି ଜାଯଗାକେ କାଲୀକୋଟାଇ ଆଖ୍ୟ ଦିଯେଛିଲେନ । ଆକବରେର ସମୟ ଓହି
ଜାଯଗାଟି ଜନ୍ମାବୃତ ଛିଲ । ତା ସତ୍ରେ ଓ ଜାଯଗାଟିକେ କାଲୀଘାଟ ନାମେ ଅଭିହିତ କରା ହତ ।
ବନ୍ଦଭାବିଦ ଆବୁଲ ଫଜଲ କାଲୀଘାଟ ଶବ୍ଦକେ ପାସୀ ଅକ୍ଷରେ ଲିଖିତେ ଗିଯେ ‘ଘ’ ଏର ଶ୍ଵଳେ
ପାସୀର ‘ଗାୟେନ’ ନା ଲିଖେ ‘କାଫ’ ଲିଖେ ‘କାଲୀକୋଟା’ ଏହି ଧରନେର ଅପରାଂଶ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ।
ହୟତ ସେଇ ଜନ୍ୟଇ ରାଡ଼ ଅଞ୍ଚଲେର ମାନୁଷ ଏଥନ୍ତେ କାଲୀଘାଟକେ କାଲୀଘାଟା ବଲେ ଥାକେ ।
ଇଉରୋପୀଯଦେର ମୁଖେ ଆବୁଲ ଫଜଲେର ‘କାଲୀକୋଟା’ ଶବ୍ଦେର ଦୈକାର ଲୋପ ପେଯେ ‘କାଲକୋଟା’
ଓ କ୍ରମେ କାଲକୋଟା ହେଁଛେ । ଏହି ଭାବେଇ ଏଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଇଂରେଜରା କାଲୀକୋଟାର
ନାମେର ବଦଳେ କାଲିକାତା ବା କଲିକାତା ହିସେବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛେ । ଅର୍ଥାଂ ମା କାଲୀର ନାମ

থেকেই কালীঘাট, কলিকাতা ও ভবানীপুর নামকরণ হয়েছে (ভবানীদেবীর নাম থেকে ভবানীপুর হয়েছে)।

অনেকদিন আগের কথা । তখন কলকাতা, গোবিন্দপুর, সুতানটি গ্রাম-কোনও কিছুরই জন্ম হয়নি । সারা জায়গাটি ছিল জঙ্গলে ভরা । পশ্চিম বাংলার এই জায়গাটিকে তখন বলা হত সমৃতট । সুন্দরবনের বিশ্বতি ছিল কালীঘাটের এই অঞ্চল পর্যন্ত । তাই এখানে আসতে ভয় পেতেন দর্শনার্থীরা । মায়ের নাম জপ করতে তাঁরা প্রাণ হাতে নিয়ে প্রবেশ করতেন এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলের মধ্যে । জঙ্গলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে শোনা যেত জন্ম জানোয়ার ও কাপালিক সন্ধ্যাসীদের চিৎকার । এদের মাঝে বাসা বেঁধে বসবাস করতেন ধীবর, হাড়ি, বাগদী প্রভৃতি সম্প্রদায় । বলাবাহল্য, দর্শনার্থীরা আসতেন দল বেঁধে । দলে ভারী হলে কেউ কেউ এখানে এক রাত থেকেও যেতেন । কাপালিকেরা ছাড়াও তখন ঠ্যাঙ্গাড়েদের প্রবল উৎপাত ছিল । যাত্রীদের মেরে আধমরা করে টাকা পয়সা, খাবার যা পেত সবকিছু কেড়ে নিয়ে আধমরা দেহটাকে ফেলে দিত জঙ্গলের মধ্যে । অথচ এত ভয় থাকা সত্ত্বেও এখানে যাত্রীদের আসার ক্ষেত্রে কোনদিন ছেদ পড়েনি । মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আদি গঙ্গা দিয়ে বাণিজ্য করতে যেতেন শ্রীমন্ত সওদাগর । মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছালেই মাঝি থামিয়ে দিত নৌকা । দক্ষিণাকালির পুজো দিয়ে আবার শুরু হত যাত্রা ।

বর্তমানের বেহালা থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই কালীক্ষেত্র । এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন রঞ্জাল সেন । বলা হয়, এই বাংলায় তিনিই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন । সতী বেঙ্গলী কলার ভেলায় ভেসে গিয়েছিলেন এই আদিগঙ্গার ওপর দিয়ে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে । শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আদি গঙ্গার তীর দিয়ে পদব্রজে গিয়েছেন ছত্রভোগে অস্থলিম্ব শিব দর্শন করতে ।

পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইংরেজ সৈন্যরা ছুটে এসেছিলেন কালীঘাটে । তাদের বিশ্বাস ছিল, কলকাতার অধিষ্ঠরী মা কালির দয়াতেই তাঁরা জয়ী হয়েছে পলাশীর যুদ্ধে । এছাড়া অনেক ইংরেজ সৈন্য ও উচ্চ পদাধিকারী এসেছেন কালীঘাটে একবার একটি কঠিন মামলায় জড়িয়ে পড়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক ইংরেজ কর্মচারী বারবার এসে লুটিয়ে পড়েছেন মায়ের দরবারে । একসময় রায় বেরোল সেই মামলার । মা কালীর দয়ায় জয়ী হলেন সেই ইংরেজ কর্মচারী । জয়ের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি ছুটে এসেছিলেন কালী ক্ষেত্রে—তিনি হাজার টাকা খরচ করে পুজোও দিয়েছিলেন । ওয়ারেন হেস্টিংসকে ফার্সী পড়াতেন নবকৃষ্ণ মুনসী । তখন হেস্টিংস ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী । এই নবকৃষ্ণ মুনসী বারবার এসেছেন কালীঘাটে । অন্তরের প্রার্থনা জানিয়েছেন মায়ের কাছে । এক সময় মায়ের কৃপায় রাজা হন নবকৃষ্ণ মুনসী । তখন গভর্ণরের তখতে বসেছেন তাঁরই ছাত্র ওয়ারেন হেস্টিংস । রাজা হওয়ার পরে নবকৃষ্ণ তিনি লক্ষ টাকা খরচ করে পুজো দিয়েছিলেন কালীঘাটে ।

কৃষ্ণনগর থেকে মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র কালীঘাটে এসেছেন গোপাল ভাড়কে সঙ্গে নিয়ে। আঠারো শ' বাইশ সালে কালীঘাটে পুজো দিতে এসেছিলেন রাজা গোপীমোহন। তাঁর আসার কয়েকঘণ্টা আগে থেকে মন্দিরের আশেপাশে লোক জমতে শুরু করে। উদ্দেশ্য, রাজা গোপীমোহন কিভাবে পুজো করবেন, তা দেখা। ভীড় সামলাতে একসময় হিমসিংহ থেতে হয়েছিল স্থানীয় পুলিশকে। একজন অতিথি হয়ে এলেন সপ্তগ্নামের শ্রীকান্ত ঘোষের বাড়িতে। রূপ-গুণ-কুলশীল দেখে নিজের মেয়েকে তার হাতে সম্প্রদান করলেন শ্রীকান্ত। সরকারী দপ্তরে রক্ষকের চাকরি করে দিলেন তাকে। এই অতিথি হলেন প্রতাপাদিত্যের প্রপিতামহ রামচন্দ্র গুহ। একসময় রাজা হলেন প্রতাপ। যশোহরের সিংহাসনে বসলেন তিনি। ভুঁইয়া থেকে রাজা হলেন তিনি। পিতা বিক্রমাদিত্য আর খুল্লতাত রাজা বস্ত রায়ের মাঝে রাইলেন প্রতাপাদিত্য। প্রতাপের খুল্লতাত রাজা বস্ত রায়ের রাজ্যের সীমানার মধ্যে রয়েছে কালীঘাট।

আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা। শহর কলকাতার তখনও পড়ন হয়নি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে খড় মাটি দিয়ে ছিল মায়ের ছেট কাঁচামাটির মন্দির। আশেপাশে তথাকথিত কয়েকঘর নিম্নবর্ণের মানুষ। মাঝে মাঝে কয়েকজন দর্শনার্থী আসেন মায়ের মন্দির দর্শন করতে। একদিন অনেক দূর থেকে সেখানে এলেন পথশ্রান্ত জনৈক পথিক। তিনি সেখানে এসেছিলেন তাঁর বাবার খোঁজ করতে। নাম ভবানীদাস চক্ৰবৰ্তী। পিতামহ চণ্ণীবৰ চক্ৰবৰ্তী, ওঁর বাবার নাম পৃথীধৰ চক্ৰবৰ্তী ওৱফে শ্রীনাথ চক্ৰবৰ্তী। মিবাস যশোহর জেলার অন্তর্গত খতিয়ান গ্রাম।

পৃথীধৰ নিরন্দেশ হয়েছেন অনেকদিন। খুঁজে চলেছেন অনেকদিন। কিন্তু পথ চলার জন্য তো খরচ আছে। তাই ভবানী দাস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন কিছু শাঁখা। অর্থের প্রয়োজন হলেই গ্রামে চুক্কে শাঁখা বিক্রি করেন এয়ো স্ত্রীদের কাছে। পথ চলতে চলতে একদিন তিনি এসে পৌছালেন খাসপুর গ্রামে। কালীঘাটের পাশ দিয়ে এসে পৌছালেন কালীকুণ্ডের পাড়ে। পথশ্রমে ক্লান্ত ভবানী দাস বিশ্রাম নেবার জন্য দিনটা সেখানেই কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একজন স্ত্রীলোক ভবানীদাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ও পুটুলীতে কি আছে বাবা? জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বললেন, ওতে শাঁখা আছে মা।

মিষ্টি সুরে স্ত্রী লোকটি বললেন, আমার হাতে শাঁখা পরিয়ে দেবে। তখনও ভবানীদাস রয়েছেন অভূত। তা সন্ত্রেও যত্ন করে সেই স্ত্রীলোকের দু'হাতে শাঁখা পরিয়ে দিলেন তিনি। গায়ের রঙ কালো পরিপাটি তাঁর সাজ। পরনে লালপাড় শাড়ী। কপালে তেল সিঁদুর। মাথায় সুগন্ধী তেল মেখেছেন। শুধু বাকী ছিল শাঁখা পরা। সূর্য তখন ক্রমশ পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছে। ভবানীদাস ভাবতেন, হয়ত ক্রোনও বাগদী বাড়ির মেয়ে হবে। শাঁখা তো পরিয়ে দিলেন, কিন্তু দাম দেবে কে?

এদিকে ওই স্ত্রীলোক আসতে আসতে নামছেন কালীকুণ্ডের পুকুরে। বললেন, দামের

কথা ভাবছ বাবা। চিন্তা করো না। আমি স্নান সেবে বাড়ি থেকে তোমার শাঁখার দাম এনে দেব। তারপর বললেন, এক কাজ করো বাপু। ওইখানে আমার ছেলেরা আছে। তাদের কাছ থেকে দাম নিয়ে এসো। আরও দু'গাছা শাঁখা দিয়ে এসো আমার নাম করে।

কোন দিকে যাব জানতে চাইলেন ভবানীদাস। ওই যে গো বাপু—ওই যে পাতার ঘর দেখছ ওইখানে বলেই পুকুরে নেমে গেলেন ওই স্ত্রীলোক।

ভবানীদাস এগিয়ে গেলেন গোল পাতার ছাউনি দেওয়া ঘরের দিকে। কাঁচামাটির কুঁড়েঘর। পাশাপাশি দু'টো ঘর। একটা ঘরে থাকেন সন্ন্যাসীরা আর অন্য ঘরে মা কালীর মন্দির। খড়মাটি দিয়ে গড়া মায়ের মূর্তি সেখানে বিরাজমান।

ভবানীদাস সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসীদের কাছে স্ত্রীলোকের কথাগুলি নিবেদন করলেন। তাঁরা তো তার কথা শুনে অবাক। বললেন, কি বলছ তুমি। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ-সারাদিন ব্যস্ত থাকি মা কালীর পূজার্চনা নিয়ে। এখানে কি করে কোনও স্ত্রীলোক বসবাস করতে পারে। ভবানী দাস তো তাদের কথা শুনে হতবাক। মুখ থেকে কোনও কথাই সরছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেন কে এই স্ত্রীলোক এই অজগর জীবনে আমার সঙ্গে ছেলনা করে পয়সা না দিয়ে শাঁখা পরে গেল। এও ভাবলেন, কোনও দর্শনার্থী তাকে প্রতারণা করে ঠকিয়ে শাঁখা পরে গেছে। ব্রহ্মানন্দ, আত্মারামের শিষ্য ভুবনেশ্বর গিরির তখন মন্দিরের মোহস্তের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না ভবানীদাসের কথা।

প্রত্যুষের ভবানীদাস বললেন, আমি ব্রাহ্মণ সারাদিন উপবাসী রয়েছি। আমি আপনাকে মিথ্যে কথা বলিনি। আমি এই মায়ের আদেশে এখানে এসেছি। কথা শেষ করে ভুবনেশ্বর গিরির সামনে আরও দু'গাছা শাঁখা তুলে ধরলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে এল। সন্ধ্যা আরতির যোগান করার জন্য তৎপর হলেন ভুবনেশ্বর গিরি। হঠাৎ চোখ চলে গেল মা কালীর মূর্তির দিকে। এক অন্তুত দৃশ্য দেখে তিনি তখন বিস্মিত, স্তুতি। চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার অপরাধ নিও না মা। তারপর মায়ের সামনে থেকে সরে এসে ভবানীদাসকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার অপরাধ নিও না মা। ভবানীদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার জন্মজন্মান্তরের সাধনা আজ সার্থক হয়েছে। মা কালী স্বয়ং তোমার কাছ থেকে তাঁর দুহাতে শাঁখা পরেছেন। এখনও তাঁর দুহাত খালি রয়েছে। শীগগির চলো সেই অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করবে। সত্যি কথাই তো। ওই শাঁখাদুটি তো তিনি পরিয়েছিলেন তার কাছে আসা স্ত্রীলোকের হাতে। ভবানীদাসের চোখ দিয়ে তখন বয়ে চলেছে শ্রাবণের ধারা। তাকে জড়িয়ে ধরে তখন একইভাবে কেঁদে চলেছে ভুবনেশ্বর গিরি। তারপর ভবানীদাসের হাত থেকে আরও শাঁখা দুটি নিয়ে পরিয়ে দিলেন মায়ের বাকী দুটি হাতে।

প্রাণতোষ ঘটকের ‘কলকাতার পথ-ঘাট’ বইয়ে উল্লেখ আছে, আদপে নাকি চৌরঙ্গী নামই ছিল না। লোকমুখে ভবিষ্যতে এই নাম প্রচলিত হয়েছে। সত্যিকার নাম ‘চিরাঙ্গী’

বা ‘চেরাঙ্গী’। সতীর অঙ্গ চক্র সাহায্যে চিরে চিরে খন্দ-বিখন্দ করেছিলেন নারায়ণ, সেই ছিন্ম অঙ্গের মাত্র এক অঙ্গুলি (পদাঙ্গুলি) পড়েছিল ভাগীরথীর তীরে কোথায়, কিংবা আদি গঙ্গার কাছে, যে জন্য কালীঘাটে তীর্থক্ষেত্রের অবস্থান মা কালী আর বৈরের আছেন সেখানে। কালীক্ষেত্র আছে ‘চিরাঙ্গী’ সতীর নামে। এই নাম হওয়ার প্রথম পোষকতা করেছেন সুপণ্ডিত সি.আর.উইলসন। তিনি জোরের সঙ্গে তাঁর Early Annals (Vol.2). P.173 etc তে উল্লেখ করেছেন, ‘The original name of ‘Chowringhee’ is ‘Cherangi in all records.’ সতীর অঙ্গছেদের জন্য ‘চিরাঙ্গী’ নাম হওয়ার সত্যতা ঐতিহাসিক এ. কে. রায় ‘Cenus of Calcutta’-এ লিখেছেন, ‘And finally it is to the Goddess Kali herself, called ‘Cherangi from the legend of her origin by being cut up with Vishnu’s disc, that they have the name of chowringhee.’

ঐতিহাসিক অতুলকৃষ্ণ রায়ের মতে, সতী অঙ্গ বর্তমানে চৌরঙ্গী অঞ্চলে পড়েছিল। তাই এই জায়গার নাম হয়েছে চৌরঙ্গী। সুরেশ চন্দ্র নাথ মজুমদার বহির্ভারতে নাথ মোগী প্রবন্ধে লিখেছেন, গোরক্ষ বিজয় হইতে আভাষ পাওয়া যায় যে, গোরক্ষনাথ কলিকাতার কালীঘাটের কালী প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বকোষে লেখা হয়েছে যে, লোকিক প্রবাদ এই গোরক্ষনাথই কালীঘাটের কালীর প্রতিষ্ঠাতা। যখন এই কথা লেখা হয়েছিল তখন গোরক্ষবিজয়ের অস্তিত্ব ‘কেহ জানিত’ না। এ উক্তি~~প্রাচীন~~ প্রবাদকে দৃঢ়ভূত করছে।

কিংবদন্তী আছে তখনকার দিনের চৌরঙ্গির বিশাল জঙ্গলের মধ্যে চৌরঙ্গীনাথ নামে নাথ সম্প্রদায়ের একবাতে পঙ্কু প্রতিবন্ধী সাধু~~ব্যাস~~ করতেন। তিনি নাকি মাটির নিচে থেকে এই দেবী মূর্তির আবিষ্কার করেন।

‘চৌরঙ্গী’ নিয়ে আর একটি কিংবদন্তী শোনা যায়। একদিন সাধু চৌরঙ্গী দেখিলেন, বনমধ্যে একটি গাড়ী একস্থানে দাঁড়াইয়া মৃত্যুকার উপর, অজস্র দুর্ঘারা বিসর্জন করিতে। সম্যাসী এই অস্তুত ব্যাপার দেখিয়া কৌতুহলাবিষ্ট চিত্তে সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং খনিত স্থান মধ্য হইতে কালীর প্রস্তরময় মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। সেই মুখই এখন কালীমূর্তি রূপে মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছে। (দৃষ্টব্য কলিকাতা সেকালের ও একালের পঃ: ১১১-১১২)। নগেন্দ্রনাথ বসু ‘বিশ্বকোষে’ (ত্যু খন্দ, পঃ: ২৯) লিখেছেনঃ প্রাচীন গোবিন্দপুরের পূর্বাংশ (এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি জেল) জঙ্গল পিরি নামক একজন চৌরঙ্গী মোগী কালীদেবীর কোন পবিত্র চিহ্নের সেবা করিতেন। এ চিহ্নই দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি হিসাবে গোবিন্দপুরে বর্তমান কেল্লা নির্মাণ করিবার সময়ে বর্তমান কালীঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবীপূজক চৌরঙ্গী হইতে বর্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

কিন্তু অন্য তথ্য প্রমাণ অনুসন্ধান করে দেখা যায়, গোবিন্দপুরে কেল্লা তৈরির সময় প্রাচীন গোবিন্দপুর থেকে দেবীমূর্তি কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এর অনেক আগে থেকেই দেবীমূর্তি যে কালীঘাটে ছিল তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেই

লিখেছেন, ‘চৌরঙ্গী যোগীগণ এই অঞ্চলে কোন সময় বসবাস করিয়াছেন কিনা তদ্বিষয়েই সন্দেহ আছে’।

কালীমন্দিরের চারপাশে ৫৯৫।১০ বিঘা জমি মা কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি নামে প্রচলিত। পঞ্চাম গ্রামের খাসপুর পরগণার অন্তর্গত ছ' সংখ্যক গ্র্যান্ড ডিভিজনের ই. এফ. এম. পি কিউ চিহ্নিত সাবডিভিজনে এইসব দেবোত্তর ভূমি রয়েছে। অনেকের মতে, ওই দেবোত্তর জমি বড়ীর সাবর্ণ চৌধুরী কেশব রায় বা তাঁর ছেলে সন্তোষ রায় মা কালীর সেবার জন্য দান করেন। অন্য একটি মতে, প্রাচীন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজারা অনেকদিন আগেই এই জমি দান করেছেন। তবে এই দুটি মতের কোনটির স্বপক্ষেই কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সাবর্ণ চৌধুরীদের দন্তভূমির তায়দাদে কালীঘাট গ্রামের দেবোত্তর সম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই তায়দাদের লেখা সম্পত্তি কালীঘাটের বাইরে অন্যান্য গ্রামের ও ভিন্ন পরগণার অন্তর্গত। সেখানে দেখা যায়, মা কালীর সেবাইত ছাড়াও অন্যান্য অনেককে দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর লাখে রাজ দান করা হয়েছে। সেগুলির একটিও মা কালীর গ্রামের মধ্যে নেই। তবে কালীঘাট গ্রামের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি, যা সাবর্ণ চৌধুরীরা দিয়েছিলেন, তা কোনও না কোন তায়দাদে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায় নিজের জমিদারীর অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামের জমি মা কালীর সেবার জন্য দান করেছেন।

জমিদার কেশবচন্দ্র চৌধুরী ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দের নিমত্ত বিরাটী থেকে বড়ীরায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ওই সময় কলকাতার আশেপাশের জায়গাগুলি পুরোপুরি জঙ্গলে ঢাকা ছিল। তারই মধ্যে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ বসবাস করতেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংরেজরা গোবিন্দপুর থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের বাস উঠিয়ে দিলে তারা ভবানীপুর ও কালীঘাট অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। শোনা যায়, তখনও এসব অঞ্চলে যথেচ্ছভাবে বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র বন্যপ্রাণীরা বিচরণ করত। এও শোনা যায়, আরও পঞ্চাশ বছর পরে ওয়ারেন হেস্টিংস আলিপুরের হেস্টিংস হাউসের কাছে বাঘ শিকার করেছিলেন।

গোবিন্দপুর থেকে উঠে এসে কালীঘাটে ও তার উত্তরদিকে চড়কড়াঙ্গায় বাড়ি তৈরি করে মা কালীর সেবাইত ভবানীদাসের পৌত্রেরা বল্লালীমতে কুলক্রিয়া শুরু করেন। ওই সময়কে কালীঘাট ও ভবানীপুরে গ্রাম স্থাপনের সূত্রপাত বলা যেতে পারে।

মা কালীর মূর্তি প্রকাশের পরে প্রথম কার দ্বারা বা কোন সময় মন্দির তৈরি হয়েছিল তার সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। জানা যায়, ভূবনেশ্বর গিরির সময় অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মা কালীর একটি ছোট মন্দির ছিল। অনেকে মনে করেন, যশোহরের রাজা বসন্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে ওই মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। তার আগে সামান্য এক পর্ণকুটিরে মায়ের মূর্তি থাকত।

কালীমূর্তি প্রকাশের বিষয়ে একটি উপন্যাসের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, কেশব

রায় কালীর ইমারত প্রস্তুত করাইয়া দেন এবং তাহার পুত্র সন্তোষ রায় ঐ ইমারতের স্থানে ছেট মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। পরে উহা ভগ্ন হওয়ায় রাজীব লোচন রায় (সন্তোষ রায়ের প্রাতুল্পন্ত্র) আলিপুরের তদনীন্তন কালীঘাটের মাঃ ইলিয়াট সাহেবের অনুমতিক্রমে বড় মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।'

কালীঘাট মন্দিরের পূর্বদিকে রয়েছে কালীকুণ্ড হৃদ। এখন তা ছেট একটি পুরুরের মতো দেখায়। বর্তমান আয়তন প্রায় দশ কাঠ। কথিত আছে, এই কুণ্ডের তীরে মা কালীর চরণঙ্গুলি পাওয়া যায়। একসময় এই জায়গার সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে গঙ্গার স্রোত দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হতে থাকায় এই জায়গাটি একটি ছেট জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়। এই জায়গার আশেপাশে কৃপ খনন করার সময়ে সমুদ্রতটে যে ধরনের মাটির স্তর থাকে এখানে তার হাদিস পাওয়া যায়। এর থেকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে সুদূর অতীতে কালীঘাট গঙ্গার গর্ভে ছিল। কালের স্রোতে চর পড়ে এটি মানুষের বাসযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কালীঘাটের সেবাইতেরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে কুণ্ডের কিছুটা সংস্কার করেন। পরবর্তী সময়ে ১৮৮৭ সালে আলিপুর মিউনিসিপ্যালিটি কুণ্ডের পাঁক পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কুণ্ডের সব জল তোলা সম্ভব হয়নি।

কালীঘাট গ্রামে ক্ষত্রিয় রাজকর্তৃক মা কালীর দেবোত্তর জমির দান সম্পর্কে কোনও অনুশাসন পত্রে সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যমতে, ক্ষত্রিয় রাজার দান স্থাকার করা হলেও ভূমি গ্রহীতার কোনও নামও পাওয়া যায়নি। একসময় সূরবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজার। বাংলার রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁরাই যে কালীঘাটের জমি দেবোত্তর হিসাবে দান করেছেন তার স্বপক্ষেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সুবর্ণ গ্রামে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিলেন (Statistical Accounts of Bengal by Dr. W. W. Hunter Vol. V. P. 119)। লক্ষণ সেনের বংশধরেরা দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাঁরাও কালীঘাটের মা কালীর সেবার জন্য জমি দান করেছেন, এর স্বপক্ষে কোনও জোরালো তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সন্তুষ্ট আকবরের শাসনকালে ‘ওয়াশিল তুমার জমা’ নামে বাংলার রাজস্বের যে হিসাব করা হয় সেখানে প্রজাদের কাছে থেকে রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু এসময় কালীঘাট গ্রামের জন্য কাউকে রাজস্ব আদায় করতে দেখা যায়নি। মুরশিদকুলির শাসনকালে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বার রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করা হয়। উল্লেখ্য, তখন কেশব রায় এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। এই সময়েও কাউকে কালীঘাট অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করতে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপ্তির পর কালীঘাট, ইংরেজদের ৫৫০মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেশব রায়ের ছয় ছেলের মধ্যে চতুর্থ শিবদেবের অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং সাধ্যমত দান ধ্যান করতেন। যে

কোন প্রার্থী শিবদেবের কাছে দান প্রার্থনা করলেই তিনি তা পূরণ করতেন বলে সকলে তাকে 'সন্তোষ' বলে ডাকতেন। জমিদারির কাগজপত্রেও 'সন্তোষ রায়' নামটি দেখতে পাওয়া যায়।

বর্ণী হামলার সময় আলিবর্দি, সন্তোষ রায়ের ওপর অত্যধিক রাজস্ব দাবী করেন। সন্তোষ রায় টাকা দিতে না চাওয়ায় আলিবর্দি তাঁকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ করে রাখেন। সন্তোষ রায় যেমন শক্তিশালী ছিলেন তেমনই বেশী খাবার খেতে পারতেন। কয়েকমাস কারারুদ্ধ থাকার সময় তাঁর যথাযথ খাবার না পাওয়ার জন্য সন্তোষ রায়ের খুব কষ্ট হয়েছিল। একদিন তিনি নবাবের ছাগরক্ষকদের কাছ থেকে জোর করে একটি ছাগল কেড়ে নিয়ে পুরোটাই খেয়ে ফেলেন। একথা শুনে নবাব তাঁকে ডেকে আনেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে নবাব তাঁকে কারাবাস থেকে মুক্তি দেন এবং ডায়মণ্ডহারবারের কাছে 'আবজাখালী' গ্রামটি সন্তোষ রায়ের খোরাকির ঘাম হিসেবে চিহ্নিত করে ব্রহ্মোত্তর করে দেন। আজ অবধি এই আবজাখালী গ্রাম সন্তোষ রায়ের উত্তরাধিকারিদের দখলে আছে।

সন্তোষ রায়' মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে ধূমধাম করে পুজো দেন ও সেইসময় কালীঘাটের সেবাইত ও ব্রাহ্মণদের অনেক জমি ও টাকা দান করেন। ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দের দখিনী ভূমির তায়দাদে দেখা যায়, ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মনোহর মৌমাল ও কালীঘাটের জনৈক সেবাইত গোকুলচন্দ্র হালদার ও আরও কয়েকজনকে, সন্তোষ রায় জমিদারীর নানান জায়গায় অনেক জমি দান করেছিলেন। শাক্ত ছিলেন সন্তোষ রায়। তিনি বড়শার কাছে ও নিজের জমিদারীর মধ্যে অনেক জায়গায় শিবমন্দির ও কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায়, মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে সন্তোষ রায় নাকি লক্ষ বিশ জমি ব্রাহ্মণদের দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর হিসাবে দান করেন।

হজুরিমল্ল নামে একজন পাঞ্জাবী সেনা ১৭৬৪ অন্দে বক্সারের যুদ্ধের সময় ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তারই পুরক্ষার স্বরূপ ১৭৬৯ অন্দে সেইসময়কার ইংরেজ গভর্নর বেরেলস্ট সাহেব হজুরিমল্লের মনোনীত কালীঘাটের মা কালীর দেবোত্তর জমির মধ্যে ১২ বিঘা জমি তাঁকে দেন এবং সেই জমির পরিবর্তে মায়ের মন্দিরের কাছে মুসিসাহানগড়ে ১২ বিঘা জমি হালদারদের নিষ্পত্তি করে দেন। যেখানে এখন কালীঘাটের বাজার ও থানা আছে ওই জায়গাগুলি হজুরিমল্ল পেয়েছিলেন। ওই জমি বর্তমানে আলিপুরের কালেষ্টেরের অধীন। প্রসঙ্গত বলা যায়, দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ইংরেজ কোম্পানী তাদের হিন্দু সৈনিকদের মা কালীর পুজো দেবার জন্য ১০৮ টাকা দিয়েছিলেন।

মা কালীর মুখমণ্ডল কালীকুণ্ড হৃদের তীরে পাওয়া যায় বলে শোনা যায়। সেই মুখমণ্ডল জনমানসে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আজ অবধি একইভাবে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হাজার হাজার মানুষ মা কালীর প্রতি শ্রদ্ধার্থ হিসেবে অনেক মূল্যবান রত্নসামগ্ৰী দিয়েছেন, যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। প্রথমে খিদিরপুরবাসী দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল

মায়ের চারটি রূপোর হাত তৈরি করিয়ে দেন। পরে কলকাতার খ্যাতনামা বাবু কালীচরণ মল্লিক চারটি সোনার হাত তৈরি করিয়ে দেন চড়কড়াঙাবাসী কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার বেলেঘাটার ধনী চাল ব্যবসায়ী রামনারায়ণ সরকার মা কালীর সোনার মুকুটটি তৈরি করান। আর একজন ধনী ব্যক্তি মায়ের হাতের অসুরের মুণ্ডু তৈরি করিয়ে দেন। উভয় কলকাতার পাইকপাড়ার রাজা ইন্দ্র চন্দ্র সিংহ মায়ের সোনার জিভ তৈরির উদ্যোগ নেন। মায়ের মাথার ওপর যে রূপোর ছত্রটি দেখা যায়, তা প্রদান করেন নেপালের প্রাচ্যন প্রধান সেনাধ্যক্ষ স্বর্গীয় যড়ঙ্গ বাহাদুর। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের গায়ের সব গয়না চুরি হয়ে যায়। পরে ধনী হিন্দুরা উদ্যোগী হয়ে আবার তা তৈরি করিয়ে দেন।

মা কালীর মন্দিরের মধ্যে পরপর পাথর দিয়ে সাজিয়ে বৃক্ষার তৈরি দেবীর মুখ স্থাপন করা আছে। শোনা যায়, ওই পাথরগুলির মধ্যে কালীঘাটে পড়া সতীর অঙ্গ অতি যত্ন সহকারে রাখা আছে। যে জ্যায়গায় মায়ের মূর্তি রাখা আছে তার নাচে দিয়ে মন্দির থেকে কালীকুণ্ডের তলা পর্যন্ত একটি কূপ আছে। মায়ের চরণামৃত ভূমধ্য দিয়ে ওই কুণ্ডে এসে পড়ে।

মায়ের মন্দির উভয়ে দক্ষিণে লম্বমান সমান্তরাল ক্ষেত্রের মত। তোরণদ্বার পশ্চিমে গঙ্গার দিকে। সবমিলিয়ে ১।। ১৯ বিঘা, এর মধ্যে আটটি কুঠা জমির ওপর বর্তমান মন্দিরটি অবস্থিত। এর মধ্যে পরিসর প্রায় ৫০ হাত। এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে ৭-৮ বছর। এর ঝন্য খরচ তিরিশ হাজার টাকা। ছাড়িয়ে যায়, তা আজকের টাকার অঙ্কের সঙ্গে মেলালে অনেকগুণ ছাড়িয়ে যাবে। এই নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮০৯ সালে এবং সেই সুবাদে পুরনো মন্দিরের জ্যোগায় তৈরি হয় বর্তমান কালীমন্দির।

অতীতে মা কালীর প্রাত্যাশিক পুজো কিভাবে হত তা আজ আর জানার কোনও উপায় নেই। তবে অনেকে ঘনে করেন, কালীঘাটের পুজো পদ্ধতি কাপালিকসহ তান্ত্রিকদের হাতে ছিল এবং তারা রাজসিক বা তামসিক নিয়মে মা কালীর পুজো করতেন। ওই সময় কালীঘাটে নাকি পশু এবং নরবলিও দেওয়া হত। বর্তমান সেবাইত হালদারদের পূর্বপূরুষ ভবনী দাসের সময় পর্যন্ত মা কালীর পুজো করতেন। ভবনীদাস বিষুণ মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি নিরামিষ নিবেদ্য নিবেদন করে, জপ হোম করে মা কালীর পূজার্চনায় মেতে থাকতেন। প্রতিদিনের ভোগের জন্য তিনি পশু বলি দিতেন না। তাঁর আমলে শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর নবমীর দিন একটি মাত্র পশুবলি দেওয়া হত। বর্তমান অধিকারীদের মধ্যেও এই নিয়ম চালু আছে। এখন যাত্রীরা যে সব পশু বলি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তা দিয়েই মায়ের নিত্য আমিষ ভোগের আয়োজন করা হয়। প্রতিদিন যে ছাগলটিকে প্রথম বলি দেওয়া হয় তাই মায়ের ভোগের জন্য গৃহীত হয়ে থাকে। হালদারেরা পশুবলি দেন না। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পৈতৃক প্রথানুসরণ করে থাকেন।

ভবনী দাসের পর তাঁর পৌত্রদের সময় থেকে আলাদা পুরোহিতকে দিয়ে মা কালী

নিত্য পুজো করানো হয়ে থাকে। যে দিন যাঁর সেবার ভার পড়ে তিনি সেইদিনের পুজোর ব্যয় বহন করে থাকেন। মা কালীর নিত্য পুজোর জন্য যেমন পুরোহিত নিযুক্ত করা হয়, তেমনই মূর্তির বেশভূষার জন্য স্বতন্ত্র বেশকারদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এদের মিশ্র (মিশ্রিল) বলা হয়। কবে থেকে এই বেশকারদের নিযুক্ত করা হচ্ছে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। পুরোহিত ও বেশকার মিশ্রে পুরুষ পরম্পরায় ওই পদে অভিষিঞ্চ হন।

সন্ধ্যা আরতির পর মন্দিরের দ্বার বন্ধ করা ও পরের দিন সকালে মন্দির খোলার ভার থাকে মিশ্রদের ওপর। তবে অধিকারীরা এই কাজের তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

যে যে বিষয়ে মা কালীর মন্দিরে (নকুলেশ্বর, শ্যামরায় ও মনসার প্রণামী) আয় ও ব্যয় সঙ্কলন হয় তার বিবরণ দেওয়া হল :

আয়

১। দর্শনার্থী যাত্রীদের দেওয়া প্রদত্ত অর্থ (মা কালী, নকুলেশ্বর, শ্যামরায় ও মনসার প্রণামী)।

২। যাত্রীদের দেওয়া পুজোর জিনিস।

৩। পশুবলির দক্ষিণা (পশুবলির দক্ষিণা সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। অতীতে সাধারণত প্রতিটি ছাগ বলির জন্য চার আনা নেওয়া হত। কিন্তু পুরুশ এবং সেনাবাহিনীর হিন্দু সিপাহীদের কাছে থেকে যথাক্রমে দু'আনা ও এক আনা নেওয়া হত। এছাড়া মহিষ বলির জন্য নেওয়া হত এক টাকা)।

৪। উৎসর্গীকৃত ছাগমুণ্ড।

৫। অতিরিক্ত পুজো, প্রণামী, উপহার ইত্যাদি

৬। দেওঘর জমির উপযোগী।

ব্যয়

১। নিত্যপুজোর নৈবেদ্যাদি।

২। পুরোহিতের দক্ষিণা।

৩। বেশকার, মিশ্রদের দৈনিক বেতন।

৪। বাদ্যকর, ঘোড়েল (যিনি ঘন্টা বাজান), কর্মকারদের দৈনিক বেতন।

৫। মন্দিররক্ষক প্রহরীদের বেতন।

৬। পাষক ও সর্মাজ্জকের দৈনিক বেতন।

৭। মা কালীর ও শ্যামরায়ের ভোগের জিনিসপত্র ও বৈকালী।

রাজা মানসিংহ একসময় কামদেব গাঙ্গুলীকে গুরুপদে বরণ করেন। সেই ঘটনার কথাই এখন জানাব। কশীতে গঙ্গার তীরে বসে বারো বছর যাবৎ সাধনা করছেন কামদেব। যোগাসনে কৃতক অবস্থায় মাটি ছেড়ে শূন্যমার্গে সাধন অবস্থায় রয়েছেন সাধক। তিনি মাতৃকৃপা পান বারো বছর পরে। রাজা মানসিংহ এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তো হতবাক।

তিনি উপস্থিত হলেন সম্মানীর কাছে। পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি রাজা মানসিংহ আপনার কৃপা প্রার্থী। সম্মানীর এই অলৌকিক সাধনা দেখে তাঁকে গুরুর পদে বরণ করতে চান। রাজা মানসিংহের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে একসময় তাঁকে দীক্ষা দিলেন কামদেব গান্ধুলী। দীক্ষা দানের পর গুরুকে সাদরে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসেন রাজা মানসিংহ। বারো বছর পরে পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে কামদেবের। মনে পড়ে তাঁর সন্তানের কথা।

অন্য দিকে মাতৃহারা লক্ষ্মীকান্তকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েন আত্মারাম ব্ৰহ্মচারী। অনুগত ভৃত্য জগদানন্দ সৰ্দার—ঘরের সবদিকে তাঁর সমান লক্ষ্য। বৃন্দ, উদ্বিগ্ন আত্মারাম তাঁর হাতেই তুলে দেন শিশু সন্তানের ভার। জগদানন্দ-পত্নী শিশু সন্তানের মুখে তুলে দেন স্তনের ধারা। মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে শিশু লক্ষ্মীকান্ত।

আত্মারাম ব্ৰহ্মচারীর প্রধান শিষ্য আনন্দগিরির সমবয়সী ভুবনেশ্বর সেইসময় ওই আশ্রমে ছিল। একসময় উপনয়নের সময় উপস্থিত হয় তার। অথচ বাবার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছেনা। শেষে পিতৃতুল্য বৃন্দ আত্মারাম লক্ষ্মীকান্তের পৈতৈ দেন মায়ের মন্দিরেই।

একসময় আত্মারামের বাঁচার আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে। শরীর ছেড়ে যাওয়ার সময় আসন্ন। মোহন্তের দায়িত্ব দিয়েছেন আনন্দগিরির হাতে। একসময় ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করলেন। ঠিক সেইসময় রাজা মানসিংহের মন চপ্টল হয়ে উঠেছিল তাঁর গুরুর জন্য।

বাংলাদেশে এলেন রাজা মানসিংহ। বোঝাপড়া করতে হবে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে গুরুপুত্রের খোঁজ করতে হবে। অনেক জায়গায় লোক পাঠালেন ওই শিশুটির জন্য। একদিন পাটুলি অর্থাৎ আজকের পাটনার জনৈক জমিদার শুদ্রমণি রাজা মানসিংহকে বললেন, আমি তোমার গুরুপুত্রের সন্ধান দিতে পারি। তিনি একবার সাগর যাত্রার পথে নেমেছিলেন কালীঘাটে। সেখানে গিয়ে তিনি পুজো দিয়েছিলেন মায়ের মন্দিরে। সম্প্রতি সন্তুত তারই উপনয়ন হয়ে গিয়েছে।

শিশুটির নাম কি?

লক্ষ্মীকান্ত।

শুদ্রমণির কথাগুলি মিলিয়ে নিলেন রাজা মানসিংহ। তারপর এলেন কালীক্ষেত্রে। দেখা হল, আনন্দগিরি আর ভুবনেশ্বরগিরির সঙ্গে। একসময় রাজা মানসিংহের সঙ্গে দেখা হল লক্ষ্মীকান্তের। রাজগুরু হওয়ার পর কোন দক্ষিণা নেননি কামদেব গান্ধুলি। মাত্র পাঁচটি ফল দক্ষিণা হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন। তারই সন্তান লক্ষ্মীকান্ত। তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজা মানসিংহ, খাসপূর, কলিকাতা, পাইকান আর আনোয়াপূর—এই পাঁচটি পরগণা দান করলেন। এছাড়া মায়ের সেবা আর কালীঘাট গ্রামের চৌহদ্দি নির্ধারণ করলেন সাতশ বিশ জমি। লিখে দিলেন সনদ। মায়ের মন্দির তৈরির জন্য দিলেন পনেরোশ স্বর্গমুদ্রা। সবকিছু দিল্লির বাদশাহের মোহর লাগিয়ে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে, সনদের একপ্রস্থ তুলে দেন মোহন্ত আনন্দগিরির হাতে।

সেই থেকে শুরু হল, কালীঘাট মন্দির তৈরির প্রস্তুতি। বোপজঙ্গল কেটে, খানাখন্দ
বুজিয়ে কালীঘাট মন্দির তৈরির পাশাপাশি আশ্রমবাসীরা চাষবাসও শুরু করেন। মন্দিরের
আশেপাশে বসবাস করতে শুরু করলেন হাড়ি, বাগদী, কামার, কুমোর শ্রেণীর মানুষেরা।

সর্বেশ্বর হালদার। মায়ের সেবক। সবসময় বিভোর হয়ে থাকেন মায়ের চিন্তায়। কিন্তু
মনের মধ্যে একটা দুঃখ সবসময়ে থেকেই যায়, তাই মনে মনে মাকে বলেন, আমার
বৎশ রক্ষা হবে না? সন্তান তো হয়ই নি, উপরন্তু তার সারা শরীর জজিরিত হয় অজীর্ণতায়।
একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়েছিলেন নিজের ঘরে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, কে
যেন তার নাম ধরে ডাকছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিতা এক নারী এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা
করতে।

‘চিনতে পারছ না আমায়, তোমার বাপের বাড়ির দেশের লোক—রমণীর মা আমি’—
বললেন সেই নারী। সাধারণ চেহারা কোঁকড়ানো চুলে মাথা ভর্তি। হাতে দু’গাছ সোনার
বালা। পরনে লালপাড় তসরের শাড়ি।

মৃদু হেসে তাকে আসন এগিয়ে দিয়ে মা বললেন, বসুন।

আসন গ্রহণ করে তিনি বললেন, সেবা হয়ে গেছে?

উত্তর দিলেন মা, না মা, এখনও হয়নি। ব্রহ্ময়ীর সেবা না হলে আমার সেবা কি
করে।

তখন রমণীর মা বললেন, যাও, কুণ্ডের জলে দু’ব দিয়ে এসো, তারপর এই ফুলটা
ধারণ করে মনে মনে সন্তানের কামনা করো। তোমার শরীরের অজীর্ণতা সব দূর হয়ে
যাবে।

মা, মনে মনে ভাবেন, তুমি কি করে বুঝলে আমার মনের কথা?

রমণীর মাও প্রত্যুভয়ে মনে মনে বললেন, আমাকে না জানালে, আমি আর কী করে
জানব বলো? হালদারমশাই সব কথাই বলেছেন আমাকে।

পরম শুদ্ধায় হাত বাড়িয়ে তাঁর দেওয়া ফুল গ্রহণ করলেন সন্তানকামনায় কাতর আমার
মা। যত্ন করে সেই ফুল কুলুঙ্গিতে রেখে কুণ্ডের জলে স্নান করতে গেলেন। বাড়ি ফিরে
দেখলেন রমণীর মা কোথাও চলে গেছেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোন সন্ধান
পাওয়া গেল না। এদিকে আচম্ভিতে একজন মহিলা মন্দিরে এসে হালদারমশাইকে বললেন,
হালদারমশাই, মায়ের ভোগ হয়ে যাবার পর তাঁর পায়ের ফুল কিছুটা নিয়ে যাবেন বাড়িতে—
গিন্নিমা খবর পাঠিয়ে দিলেন।

একসময় হালদারমশাই বাড়ি ফিরে সব কথা শনে তো হতবাক। চেহারার বর্ণনা
অনুযায়ী সেই একই মহিলা। মায়ের চরণের ফুল তিনি ধারণ করেছিলেন ভাদ্র মাসে
কবচের মধ্যে ধারণ করে। আষাঢ় মাসে আমার বড় ভাইয়ের জন্ম হয়। আমার জন্ম
তার দু’বছর পরে।

সতেরশ বিয়ান্নিশ সালে বাংলায় শুরু হয় মারাঠা তাঙ্গৰ। ভাস্কর পণ্ডিত আর তেইশ

জন মারাঠা সর্দার কুড়ি হাজার বর্গি সেনা সঙ্গে করে এদেশে আসেন। তাদের বাসনা ছিল, বাংলাকে নাগপুরের সঙ্গে জুড়ে দেবার। কিন্তু শিবাজীর মৃত্যুতে তাদের সব কাজে বাধা পড়ে। শিবাজীর জীবিতকালে দিল্লির বাদশা, রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বা চোখ মারাঠাদের দেওয়া হবে বলে স্বীকার করেছিলেন। সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বাংলার নবাব আলিবর্দির কাছে প্রাপ্য পাওনা চেয়ে পাঠান। কিন্তু আলিবর্দি তা দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই রাগে বিশ হাজার বর্গি সেনা বাংলার সর্বত্র ব্যাপক তাঙ্গুব চালান। কিন্তু কালীঘাটে এসে মারাঠা সর্দার বলেন, এসব লুঠের সম্পত্তি এই দেবস্থানে ছেড়ে দিয়ে গেলাম, কে পাণ্ডা এখানকার? কাপতে কাপতে রামকৃষ্ণ বললেন, আমিই এখানকার পাণ্ডা। তাঁকে মারাঠা সর্দার এক পাঞ্জা লিখে হাওলা করে দিলেন, কালীঘাট আর কালী মন্দির। সেই হাওলার সুবাদে রামকৃষ্ণ পাণ্ডা হয়ে গেলেন রামকৃষ্ণ হালদার।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পাঞ্জাৰ জোৱে রামকৃষ্ণ অপর পক্ষের চারভাইকে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন। সেই সুবাদে একদিন রাতে চার ভাই একসঙ্গে মা কালীৰ পাষাণময় পদাঙ্গুলি জোৱে আনতে গিয়ে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলেন। হাতাহাতি হাতে হাতে মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলি ভেঙে দুটুকরো হয়ে গেল। একটুকরো নিয়ে পালালেন রামগোপাল ও তার ভাইয়েরা। বাকী টুকরো রামকৃষ্ণ তুলে রাখলেন মন্দিরে লোহার পেটিকাতে চাবি দিয়ে।

কিছুদিন পরে রামগোপালের দু'টি চোখ অঙ্ক হয়ে গেল। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন।

রামগোপালের জামাই হরচন্দ্র ওবকে হরো বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন খুড়শশুর রামকৃষ্ণ হালদারের মাড়িতে। একদিন পাঞ্জাৰ শর্ত নিয়ে আলোচনার সময় মারাঠা সর্দারের পাঞ্জা দেখালেন। হরো বাড়ুয়েকে। হঠাৎ হরচন্দ্র মারাঠা সর্দারের দেওয়া ‘হাওলা’-টা মুখে পুরে চিরিয়ে পাকস্থলীতে পাঠিয়ে দিলেন।

এই মহাসংকটের দিনে এক যৌগী গুরুর সন্ধান পান রামকৃষ্ণ। তার নির্দেশে তিনি সংকট মুক্ত হন। বিবাদ মিটিয়ে নেন জ্ঞাতিদের সঙ্গে। আবার একত্রিত হয় মায়ের পাষাণময় পদাঙ্গুলি। মন্দিরে মূর্তিৰ বাযুকোণে লোহার বাঞ্চে রাখা হয় দু'খণ্ডে বিভক্ত পাষাণময় পদাঙ্গুলি। একাজের জন্য হরো বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্বশুরের কাছ থেকে পাঁচ বিঘা জমি উপহার পান। এছাড়া ঠিক হয়, নিত্য পুজোৰ জন্য তাদের কোনও পক্ষই নিভৃতে গোপনে মায়ের কোনও কিছু স্পর্শ করতে পারবেন না। এজন্য দু'জন সৎ ব্রাহ্মণ সন্তান মায়ের মূর্তি রক্ষা করা, তাঁর অঙ্গবাস ঠিক করা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হবেন।

কালীপুজোৰ দিন মা কালী পূজিতা হন মা লক্ষ্মী রূপে। যেহেতু কালীঘাটে মায়ের নিত্য পুজো হয় তাই কালীপুজোৰ দিন আলাদা করে কালীপুজো হয় না। সেবাইতরা মনে করেন মা কালী তাদের গৃহদেবী। তবে এই লক্ষ্মীপুজোৰ বিশেষ সময় আছে। অমাবস্যা

পড়ার পর যখন সন্ধ্যার সময় আসে তখন হয় লক্ষ্মীপূজা। যেমন কোনও বছর যদি অমাবস্যা পড়ে রাত নটা বেজে পঁয়ত্রিশ মনিটের পর, তাহলে তার পরেরদিন সন্ধ্যাবেলা যতক্ষণ অমাবস্যা থাকবে, সেইসময় কালীঘাটের মন্দিরে মহালক্ষ্মী পুজো হবে।

কালীঘাটের সেবাইতেরা মা লক্ষ্মীকে শ্যামালক্ষ্মী নামে সম্মোধন করে থাকেন। পুজো শুরুর আগে অলক্ষ্মী বিদায়ের পালা চলে মন্দিরের বাইরে মনসাতলা তথা ষষ্ঠীতলায়। তারপর গর্ভগৃহে মালক্ষ্মীর ধ্যানে মা কালীর পুজো করা হয়। লক্ষ্মীর ভোগ হিসেবে দেওয়া হয়, বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ খাবার। যেমন, পোলাও, সাদা ভাত, ডাল, চাটনি প্রভৃতি। তবে মা কালী যেহেতু আমিষ ভোগ গ্রহণ করেন তাই মা লক্ষ্মীর ভোগের থেকে একটু দূরে দেওয়া হয় আমিষ ভোগ। পুজোর পরে আরতি করে শেষ হয় সেদিনের আরাধনা। একই সঙ্গে আরতি করা হয় মা লক্ষ্মী ও মাকালীর উদ্দেশ্যে।

আলাদা করে কালীপুজো করা হয় বছরের একটি বিশেষ দিনে। ওই দিনটি হল, বৈশাখ বা জ্যেষ্ঠ মাসের কোনও শনি বা মঙ্গলবার যেদিন অষ্টমী, নবমী বা চতুর্দশী থাকবে। সেদিন কালীঘাট মন্দিরে রক্ষাকালীর পুজো করা হয়ে থাকে। পুজো চলে রাত নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত।

দুর্গাপূজার চারদিন কালীঘাটে মা কালী পূজিতা হন মা দুর্গা রূপে। পুরোহিতের কঠে ভেসে আসে, ‘দুর্গা কালিকা এ নমঃ’। শাস্ত্র তৈরি করেছেন শাস্ত্রকার অর্থাৎ এই ধরিত্রীর মানুষজন। আসলে মন যদি বলে তুমি অঙ্ককারে, অদৃশ্যলোকেও তুমি। আর মন যদি বলে তুমি নও, শত স্পর্শ-ঘাণ-স্বাদ-গন্ধ সন্ত্রেণ তুমি নিঃসাড়, তুমি নির্জীব তাহলে তাই। ‘মা’ এই একাক্ষরী মন্ত্রের কত জোর। তাকে ডাকলেই হয়ে যায় মন্ত্রোচ্চারণ। ন্যাস—প্রাণায়াম, ব্রত-তীর্থ কোনও কিছুরই প্রয়োজন নেই। সুখেও তিনি মা, দুঃখেও তিনি, আবার ভয়ের সময়েও তাঁর নামে ধৰ্মনি দিয়ে ওঠে। কারণ তিনি সর্বভাবিনী, সর্বব্যাপিনী মা।



ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরী

পীঠমালা তন্ত্রে শিব-পর্বতী সংবাদের এক-পঞ্চাশৎ বিদ্যোৎপত্তিতে বলা হয়েছে,
ত্রিপুরায়ঃ দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।
ভৈরবস্ত্রপুরেশ্বচ সর্বাভীষ্ঠ ফলপদঃ।

বাংলায় এই শ্লোকের মর্মার্থ হল, ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পড়ায় সেখানে পীঠদেবী ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হয়েছেন। এই পীঠদেবী ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে প্রতিষ্ঠাতা আছেন। সেখানকার বিভাগীয় অফিস থেকে পূর্বদক্ষিণ কোণে একক্রোশ দূরে একটি সামান্য উঁচু পাহাড়ের ওপরে মন্দিরটি অবস্থিত আছে। দেবীর মন্দির কতকটা কালীঘাটের মায়ের মন্দিরের আদলে তৈরি। মূল দরজা পশ্চিম দিকে। উত্তর দিকে ছোট একটি দরজা আছে তা পরবর্তী সময়ে খোলা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। মন্দিরের বাইরের পরিমাপ হল, ২৪×২৪ ফুট এবং ভেতরের পরিসর ১৬×১৬ ফুট। চারদিকে দেওয়াল ৮ ফুট চওড়া, উচ্চতা ৭৫ ফুট।

পুরনো দিনের প্রগল্পী অনুসারে নাতিস্থূল ইষ্টক ও উৎকৃষ্ট মসলা দিয়ে এই মন্দির তৈরি হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালগুলি এত মজবুত যে, দূর থেকে আসা কামানের গোলাও সহজে এই মন্দিরের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, ত্রিপুরার মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাকাল ১৪২৩ শকাব্দ। রাজমালায় পাওয়া যায়, এই মন্দির তৈরির সময় মহারাজ ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম থেকে মায়ের বর্তমান মূর্তি অনিয়েছিলেন। এ বিষয়ে রাজমালায় আছে :

আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল
বাস্ত্রপুজো সন্তুষ্ট বিষ্ণু প্রীতে কৈল ॥
ভগবত্তি রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে ।
এই মঠে আমাস্থাপ রাজা মহাসত্ত্বে ॥
চাটিগামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট ।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট ॥
তথা হতে আনি আমা এই মঠে পুজ ।
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ ॥

.....
রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে ।
স্বপ্নে সেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে ॥
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে রাজ্যতে আনিল ।

সন্দৰ গমনে রাজা নমস্কার কৈল ।।
কতদিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল ।
পুণ্যহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল ।।— ধন্যমাণিক্য খণ্ড ।

রাজমালায় আরও উল্লেখ আছে, এই মূর্তি চট্টগ্রাম থেকে আনা হয়েছিল। ‘ত্রিপুর বংশাবলী’ বইতে এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে :—

রাধাকৃষ্ণ স্থাপিবারে মঠ আরস্তিল ।
চট্টশ্শেরী দেবী আসি স্বপ্ন দেখাইল ।।
এমঠে আমাকে রাজা করহ স্থাপন ।
নতুবা অব্যাহতি তোমার নাহি কদাচন ।।
এই মঠে যদি আমা স্থাপন না কর ।
তবে জান রাজা তোমার নাহিক নিষ্ঠার ।।
চট্টগ্রামে সদরঘাটে এক বৃক্ষ মূলে ।
পুজয় আমাকে সদা মগধ সকলে ।।
সেই স্থান হৈতে শীঘ্ৰ আনহ আমায় ।—ত্রিপুর বংশাবলী ।

দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরেশ্বরী। ভৈরব ত্রিপুরেশ বা মূত্তাস্তরে ‘নল’। ভারত চন্দ্ৰ তাঁৰ অনন্দামন্দল গ্রহে লিখেছেন,

দক্ষিণ চৱণখানি পড়ে ত্রিপুরায় ।
নলনামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তাঁয় ।।

তত্ত্বচূড়ামণি গ্রহে উল্লেখ আছে, দেবী হলেন ‘ত্রিপুরাসুন্দরী’ এবং ভৈরব ‘ত্রিপুরেশ’। শিবচরিত আছে দেবী ‘ত্রিপুরা’ এবং ভৈরব ‘নল’।

ত্রিপুরায় আনার কতদিন আগে এই বিশ্বহ তৈরি করা হয়, মঘদের দ্বারা পুজিত হওয়ার আগে কোন বৎশে কতদিন তাঁৰ পুজো করা হয়েছে, চট্টগ্রামে তিনি কতদিন ছিলেন, সেসব বিষয় জানা যায় না। এজন্য বর্তমানে মন্দিরে দেবীর যে মূর্তি আছে তা কতদিনের পুরনো তা জানা সম্ভব নয়। এছাড়া বর্তমান মূর্তি স্থাপনের আগে মন্দিরে অন্য কোনও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল না, বা সেখানে দেবতার পূজার্চনা হত কিনা, তাও কোনও ভাবে জানা সম্ভব হয়নি।

দেবালয়ের সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়বে এক সুবিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তরকে বলা হয়, সুখসাগর। অনেকদিন আগে এখানে একটি বিশাল হৃদ ছিল, যা ক্রমেই চারদিকের ছোট ছোট পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া মাটি পড়ে এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি দীঘি আছে যা পুরনো হলেও এর জল খুব পরিষ্কার। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের আমলে এই দীঘি খনন করা হয় বলে এর নাম রাখা হয় ‘কল্যাণ সাগর’।

এই সরোবরের দৈর্ঘ্য ২২৪ গজ, প্রস্থে ১৬০ গজ। এ সম্বন্ধে রাজমালায় লেখা আছে :—

সেইকালে মহারাজার, স্বপনে আদেশ।
কালিকা দেবীয়ে স্বপ্ন দেখায় বিশেষ।
আমা সেবা কষ্ট হয় জলের কারণে।
জলাশয় দেও রাজা আমা সন্ধানে॥
রাত্রিকালে মহারাজা দেখয়ে স্বপন।
প্রভাতে কহিছে রাজা স্বপ্নের কথন॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বপ্ন ব্যাখ্যান করিল।
সিদ্ধান্ত বাগীশ আদি যত দিজ ছিল॥
হরিষ হইয়া নৃপ কহে সেইক্ষণ।
পুনর্গী খনিতে আজ্ঞা কালীর সদন॥
বাস্তুপূজা পরে পুনর্গীর আরঙ্গন।
উদয়পুর কালিকার সমীপে তখন॥
জলাশয় উৎসর্গিল বিধান তৎপর
পুনর্গীর নাম রাখে ‘কল্যাণ সাগর’॥। ~~কল্যাণমাণিক্য~~ খণ্ড।
রাজমালায় প্রস্তাবনায় লেখা আছে—
দুর্ভেদ্ন নাম ছিল চন্তাই শুধানো
চতুর্দশ দেবতাপূজাতে দিব্যজ্ঞান।—রাজমালা—৩ পৃষ্ঠা

. এই চতুর্দশ দেবতাই ত্রিপুর রাজবংশের কুল দেবতা।

মহারাজ দৈত্যের ছেলে ত্রিপুর, অত্যন্ত ত্রুটির প্রকৃতির, অত্যাচারী এবং উদ্বৃত স্বভাবের ছিলেন। দৈত্য শত চেষ্টা করেও তাঁর দুশ্চরিত্বা কোনওভাবে নিবৃত্ত করতে পারেননি। কালক্রমে বার্দ্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর ছেলের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি বাণপ্রস্তে চলে যান।

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার পরেও ত্রিপুরের চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি। দুর্দমনীয় বণস্পৃষ্ঠা, প্রজাপীড়ন, লঘুদোষে প্রাণদণ্ড, অবিচার, পরবরাজ্য ও পরস্ফীহরণ ইত্যাদি অনাচারে আশেপাশের সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এক সময় স্বয়ং মহেশ্বর, প্রজাদের দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে, দ্বাপরের শেষভাগে সংহার মূর্তি ধারণ করে নিজের হাতে ত্রিপুরকে সংহার করেন।

রাজমালার ১১ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে লেখা আছে—

মারিলেক শূল অন্ত হৃদয় উপর।

শিব মুখ হেরি রাজা ত্যজে কলেবর।

রাজরত্নাকর গ্রন্থে মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুরের নিহত হওয়ার যে বিবরণ পাওয়া যায়

তা থেকে আভাস পাওয়া যায়, শিবদ্বেষী ও অত্যাচারী ত্রিপুরের প্রতি রাজমন্ত্রীসহ সকলের মনেই বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। এমনকি এমন তথ্যও পাওয়া যায়, রাজাকে সংহার করার জন্য তারা সশাটের চিরশঙ্খ হেড়ম্বপতির শরণাপন্ন হন। তখন হেড়ম্বেশ্বর মনে করলেন, ‘ইহারা মহারাজ ত্রিপুরের বিরুদ্ধবাদীর ভাগ করিয়া আমার মনোগত ভাব জানিতে আসিয়াছে। আমি যদি ইহাদের নিকট মনের কথা প্রকাশ করি, তবে বিপদের আশঙ্কা আছে।’ একথা ভেবে হেড়ম্বেশ্বর রেগে গিয়ে তাদের আপন রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেন।

প্রজারা ত্রিপুর-রাজমন্ত্রী নরসিংহের কাছে গেলে তিনি বললেন, ‘মহাদেবের কৃপালাভ ব্যূতীত এই বিপদ হইতে পরিত্রাগের অন্য উপায় নেই। রাজা রাজধানীতে অবস্থানকালে আমরা এই কার্যে লিপ্ত হইব না। কারণ, আমরা তাঁহার অকল্যাণ কামনা করিতেছি, ইহা যদি কর্ণগোচর হয়, তবে আমাদের বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। রাজা মৃগয়া প্রিয়, তিনি যখন মৃগয়া ব্যাপদেশে বনে গমন করিবেন, তখন আমরা মহাদেবের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইব।’ এরপর এই পরিকল্পনামত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। মহাদেবের কাছে আকুল প্রার্থনা করার পর তিনি অত্যাচারী ত্রিপুরকে দমন করার ব্যবস্থা করলেন। এ বিষয়ে রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে,

শ্রীধর্মাণিক্য রাজা পরে জিজ্ঞাসিল।

ক্ষত্রিয়বৎশেতে কেন ত্রিপুর নাম হৈল।

চণ্ডাই কহে মহারাজা তাহা বলি আয়।

যেই মতে ক্ষত্রিয় বৎশে ত্রিপুর হৈলা তুমি।।

দক্ষকন্যা সতী অঙ্গ পতন কর্ত্তৃ স্থানে।

মহাপীঠ নির্ণয় মুনি বলিছে পুরাণে।।

শিববাক্য পীঠমালা তত্ত্বের প্রমাণ।

সেই রাজ্যে যেই অঙ্গ সেই পীঠস্থান।।

সেইরাজ্যে একদেবী তৈরেব আর জন।

দুই নামে পীঠস্থান করে নিরূপণ।।

অথ পীঠমালা তত্ত্বঃ

ত্রিপুরায়ঃ দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী।

ভৈরবন্তি পুরেশশ সর্বাভীষ্ঠ প্রদায়কঃ।

পদবক্ষে আছে,

সতীর দক্ষিণ পদ পড়ে ত্রিপুরাতে।

ত্রিপুরাসুন্দরী খ্যাতি ত্রিপুর ভূমিতে।।

ত্রিপুরেশ নাম শিব ত্রিপুরা রাজ্যেতে।

তান বরে ত্রিলোচন ত্রিপুর পত্নীতে।।

সেই সে কারণে ক্ষত্রী ত্রিপুর জাতি বলে।

অবধান কর রাজা মন কুতু হলে ।।
 ত্রিপুর বংশের প্রমাণ আর যথোচিত ।।
 পঞ্চবেদ মহাভারত প্রমাণ লিখিত ।।
 মহাভারতের সভাপর্বতে লিখিছে ।।
 সহদেব দিঘিজয় দক্ষিণে গিয়াছে ।।

তন্ত্রচূড়ামণিতে উল্লেখ আছে :
 ত্রিপুরায়ঃ দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মাতা ।
 ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ সর্বাভিষ্ঠ ফলপ্রদঃ ।।

এর দ্বারা বোৰা যায়, এই ত্রিপুরাই বৰ্তমানের ত্রিপুরা রাজ্য এবং পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরী। জ্যোতিস্তন্ত্রধৃত কূর্মচক্র, চৈতন্য ভাগবত, কবিকঙ্কণ চন্দ্রী ও ক্ষিতীশাবৎশাবলী প্রভৃতি বইতে বৰ্তমানে ত্রিপুরার নাম উল্লেখ আছে।

মহারাজ ত্রিলোচন, চতুর্দশ দেবতার পুজার্চনার জন্য দণ্ডীদের সাগরদ্বীপ থেকে আনবার জন্য দৃত পাঠিয়েছিলেন। রাজমালার ত্রিলোচন খণ্ডে এর উল্লেখ রয়েছে। উদ্বিত এবং অধার্মিক ত্রিপুর তখনও জীবিত আছেন মনে করে দণ্ডীরা ত্রিপুরায় আসতে সাহস করেননি। এই সূত্রেই সাগর দ্বীপের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ ছিল এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কথিত আছে, মহারাজ ত্রিলোচনের সঙ্গে দণ্ডীদের আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল এবং রাজার অত্যাচারের বিষয়ে দণ্ডীরা জানতেন। রাজরঞ্জাকারের মতে, এই দণ্ডীদের আগে দ্রুহ সন্তানেরা দেবতার সেবাইত ছিলেন। মহারাজ ত্রিপুরের অত্যাচারে তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এইসব ঘটনার দ্বারা জানা যায়, সুন্দরবনে রাজধানী থাকার সময়ে সন্তদের সঙ্গে রাজবংশের ঘনিষ্ঠতা হয়। এবং সেইসূত্রেই কিরাত দেশে রাজ্য স্থাপনের জন্য তাদের আনা হয়।

চন্দ্রাই নামে জনেক দণ্ডী ত্রিপুর রাজবংশের বিবরণ প্রাচীনকাল থেকে সংঘর্ষ করেছেন। রাজমালা, রাজরঞ্জাকর প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিহাস তাঁর মুখ থেকে শুনেই রচিত হয়েছে। এইভাবেও ত্রিপুর রাজবংশের সঙ্গে সাগরদ্বীপের ঘনিষ্ঠতা হয়। সন্তবত সেই কারণেই সুন্দরবনে স্থাপিত ত্রিপুর সুন্দরী মূর্তি দ্বারা ত্রিপুরার সঙ্গে সাগরদ্বীপের সমন্বয় সূচিত হয়। কালিদাস দত্তের লেখা, ‘সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস’ বইতে ত্রিপুরাসুন্দরীর উল্লেখ রয়েছে। ওই বইতে অস্মুলিঙ্গের নামও পাওয়া যায়। সেখানে আছে, বৰ্তমান সময়ে উক্ত প্রদেশের প্রাচীরতত্ত্বের নির্দর্শন সমূহের মধ্যে ভাগিনী নদীর পশ্চিমকূলে বড়শীতে অস্মুলিঙ্গ, ছত্রভোগ ত্রিপুরাসুন্দরী ও অন্ধমুনি প্রভৃতি নামে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান আছে।

ত্রিপুরাসুন্দরী শব্দের পাদটীকায় লেখা আছে, ‘ত্রিপুরাসুন্দরী তীর্থক্ষেত্রে এইক্ষণে ত্রিপুরা বালা ভৈরবী নামী এক দারুময়ী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই দেবালয়ের পুরোহিতগণ বলেন যে উহা একটি পীঠস্থান এবং দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী শক্তি ও বড়শিব অস্মুলিঙ্গ ভৈরব। সাধারণের বিশ্বাস, তথায় দেবীর বক্ষস্থল (বুকের ছাতি) পড়িয়াছিল। কথিত আছে

যে, উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির বহু প্রাচীনকালে কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের নিকটবর্তী গ্রামের নিকটবর্তী কাটান দীঘি নামক স্থান ছিল। পরে উহা তথা হইতে ছত্রভোগে স্থানান্তরিত হয়। এইক্ষণে যে দেবীগৃহ ছত্রভোগে বর্তমান আছে, উহাও তথাকার প্রাচীন মন্দির নহে। ১২৭১ সালে ঘড়ে উক্তপ্রাচীন মন্দির পড়িয়া যাইবার পরে ইদানীস্তন মন্দিরগৃহ নির্মিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রীর পথপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ত্রিপুরেশ্বরীর বিগ্রহের বিবরণ দিয়ে বলেছেন,

‘এইমত প্রভু জাহ্নবীর কুলে কুলে
আইলেন ছত্রভোগ মহাকৃত হলে ॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী ।
বহিতে আছেন সর্বলোকে করি সুখী ॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে ।
‘অশুলিঙ্গঘাট’ করি বোলে সর্বজনে ॥

অন্যদিকে, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, ধনপতির সিংহল যাত্রা পথের যে ভৌগোলিক বিবরণ দিয়েছেন সেখানেও ত্রিপুরাসুন্দরী ও অশুলিঙ্গের বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে কবিকঙ্কন লিখেছেন,

‘নাচনগাথা বৈষবঘাটা বামদিকে থুইয়া
দক্ষিণেতে বারাসাত গ্রাম এড়াইয়া ॥
ভাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা ।
ছত্রভোগে উত্তরিলা অবসান বেলা ॥
ত্রিপুরা পুজিয়া সাধু চলিলা সত্ত্বর ।
অশুলিঙ্গে দিয়া উত্তরিলা সদাগর ॥

সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর রচিত ‘যশোহর খুলনার ইতিহাস’—এ ত্রিপুরাসুন্দরীর কোনও বিবরণ দেন নি। কিন্তু সেখানে অশুলিঙ্গের উল্লেখ আছে, শশাঙ্কের রাজত্বকালে সমতটের নানাস্থানে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। হাতিয়াগড়ে সুপ্রিম অশুলিঙ্গ শিব, কালীঘাটে নকুলেশ্বর, দ্বিগঙ্গায় গঙ্গেশ্বর শিব, কুশদহে যমুনাতটে, লাউপালা নামকস্থানে জলেশ্বর শিব এইসময় বা তাহার অব্যবহিত পরবর্তীযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।’

ত্রিপুরাসুন্দরী পীঠদেবী এবং সতীর বক্ষঃস্থল পড়ায় এই পীঠের উত্তৰ হয়েছে, এটাই একাংশের বিশ্বাস ছিল। তন্ত্রচূড়ামণি, পীঠমালাতন্ত্র, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও শিবচরিত প্রভৃতি বইতে কোথাও সুন্দরবনে পীঠ প্রতিষ্ঠার কোনও উল্লেখ নেই। একমাত্র কুজিকাতন্ত্রের সপ্তম পটলে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু দেবীর কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়ার সূত্রে পীঠসৃষ্টির স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধপীঠ দেবীর অঙ্গ ব্যতীতও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তন্ত্রের বিধানে যে জায়গায় কোটি হোম বা কোটি মহাবিদ্যামন্ত্র জপ করা হয়েছে, সেই জায়গাকে সিদ্ধপীঠ বলা হয়।

এই ধরনের কোনও কারণে সাগর কিনারে ‘সিদ্ধপীঠ’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম কুজিকাতস্ত্রের মতে ‘জ্যোতিশ্ময়ী’। প্রাচীনকালে এই জায়গায় কোনও মূর্তি থাকবার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী একমাত্র ত্রিপুরাতেই রয়েছে। এ বিষয়ে সব শাস্ত্রের বইতে একই তথ্যের প্রতিক্রিয়া করা হয়েছে, ‘ত্রিপুরায়ং দক্ষপদে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী।’ এই দেবী মূর্তি দারুময়ী। ‘রাজরত্নাকর’ বইতে মহারাজ প্রতদ্বন্দ্বের নাতি কলিঙ্গ নামা ভূপতি বর্ণনা দিয়েছেন,

‘ত্রিবেগাঃ পূর্বদেশে মন্দিরম্ সুমনোহরং
নির্মায় সহাপয়ামাস ত্রিপুরাসুন্দরী পরাঃ।।
চতুর্ভূজাঃ দারুময়ীঃ যথোক্ত বিধিপূর্বকঃ।।
অদ্যাপি বর্ততে রাজন् সা মূর্তিঃ সুপ্রতিষ্ঠিত।।’

প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তথ্যভিজ্ঞ মহলের মতে, ত্রিপুরেশ্বরীর দেবীমূর্তি চার হাজার বছরের পুরনো। ত্রিপুরায় আনার কতদিন আগে এই বিশ্বহ তৈরি করা হয়, মঘেরা এই মূর্তি পুজো করার আগে, কোথায় কোন বৎশ, কতদিন অর্চিত হয়েছে, এই মূর্তি চট্টগ্রামে কতদিন রাখা হয়েছিল, তা জানার কোনও উপায় নেই।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে তাকালে এক বিশাল প্রাস্তর চোখে পড়ে। এই প্রাস্তরের নাম ‘সুখ সাগর’। এক সময় এটি একটি বড় হৃদয় ছিল। মন্দিরের পূর্ব দিকে একটা দীঘি আছে। এটি খুবই প্রাচীন। মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের শাসনকালে এই দীঘির খোঁড়ার কাজ শুরু হয় বলে এর নাম হয়েছে ‘কল্যাণ সাগর’।

প্রতিদিন অম্বব্যঙ্গন, লুচি, প্রিষ্ঠাইত্যাদি দিয়ে দেবীর ভোগ হয়। একটি করে পাঁঠা প্রতিদিন বলি হয়ে থাকে। অতীতে এখানে নরবলি হত বলে শোনা যায়। নগরের উপকঠে ভৈরব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ভৈরবের নাম কোনও তত্ত্বে ‘ত্রিপুরেশ’, কোনও কোনও তত্ত্বে ‘নল’ বা ‘অনল’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ভৈরবের বাড়িকে ‘মহাদেব বাড়ি’ বলা হয়ে থাকে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই মন্দির তৈরি ও বিশ্বহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ বিষয়ে ত্রিপুর বৎশাবলীতে উল্লেখ আছে।

‘আর এক মঠ তবে অপূর্ব গঠিত। সেই মঠে মহাদেব স্থাপন করিল।’

মন্দিরে ত্রিপুরেশ্বরীর সামনে পিতলের সিংহাসনে যে শালগ্রাম শিলা দেখা যায়, তাকে বলা হয় রাজ রাজেশ্বর চক্র।

মণিকর্ণিকার তীরে পিতৃবৎ অবস্থানরত ধন্যকে রাম নামে জনৈক যোগী মহারাজ দেখতে পান। যোগীপুরুষ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তাঁকে আরও অনেক তীর্থস্থান ভ্রমণ করান। এ বিষয়ে রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে, ‘নানা স্থানে ঘুরে এই যোগীবর নগরের উপকঠে আসে রাজ্যশ্঵র’। অনেক জায়গা ঘুরে যোগী বর্তমানে ত্রিপুরার উদয়পুরে কচ্ছপের পিঠের মত একটা ঊচু টিলা ভূমিতে জীর্ণ মন্দিরে ধন্যকে জপের জন্য বসার আদেশ দেন। বললেন, এই কুর্মপৃষ্ঠকার স্থানে সরোবর তীরে নানা জাতি ফুলে প্রশাস্ত নিবিড়ে

প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরে জপের জন্য কর পঞ্চমূর্তির আসন। যেদিন হবে অষ্টসিদ্ধি সাধন তারপর হবে জপ সমাপন। সেই শুভক্ষণে আমি পুনঃ আগমন করব।'

গুরুদেবের কৃপায় শ্রীধন্য কিছুদিনের মধ্যে অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন। যোগীবর তখন আবার সেই জায়গায় দেখা দিয়ে বললেন, 'এক দম্প বন সিদ্ধালয়।' ১৪২৩ শকাব্দে প্রতাপমাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজা হন শ্রীধন্য। রাজত্বের দায়িত্ব নেবার পরেই তিনি জীর্ণ মন্দিরটি সংস্কার করার পর রাজেশ্বর শালগ্রাম শিলাস্থাপন করেন। একদিন রাতে ত্রিপুরেশ্বরী মা রাজা শ্রীধন্যকে স্বপ্নে দেখা দেন। এ প্রসঙ্গে রাজমালায় বলা আছে,

'স্বপ্নযোগ কহে চষ্ণি শুন ধন্য রায়।

চট্টল হাতে ফিরে আন আমায়।'

পার্বত্য চট্টগ্রামে তখন 'মগ' জাতির মানুষ পুজো করতেন ত্রিপুরেশ্বরীকে। যখন মহারাজ শ্রীধন্যের সেনারা চট্টলে গিয়ে পৌঁছাল, তখন মগদের সঙ্গে তাদের ভয়কর যুদ্ধ বাঁধে। ত্রিপুরেশ্বরীর কৃপায় অবশেষে মহারাজের সৈন্যরা প্রস্তরময় মূর্তি উদ্ধার করে ত্রিপুরা অভিমুখে যাত্রা করে। এইসময় দৈববাণী হল, 'মহারাজ না,' ভয় করিও না, পীঠস্থান যথায় তথা রাত্রি ভোর হবে নিশ্চয়।'

নগরের উপকল্পে কুর্মপৃষ্ঠ স্থানে বর্তমানে মন্দিরের কাছে আসতেই সূর্যদেব উঠিল গগনে। দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, এখানে আমার মন্দির স্থাপন কর। মহারাজ বললেন, মা, মন্দিরে আমি বিষুওকে স্থাপন করেছি, তোমায় অন্য স্থানে আর একটি মন্দিরে রেখে পুজিব। কারণ, তুমি মহাশক্তি, তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তোমায় পুজো করতে হলে বলি দিতে হবে। কিন্তু এখানে বিষুওর সামনে কিভাবে বলি দেওয়া সম্ভব? আমি তোমায় অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করব। কিন্তু মা ত্রিপুরেশ্বরীর অকাট্য যুক্তিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না মহারাজ ধন্যমাণিক্য। একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল, বিষুও এবং শক্তির। সেই থেকে অর্থাৎ ১৪২৩ শকাব্দ থেকে আজ অবধি সেখানেই মা ত্রিপুরেশ্বরীর পুজো হয়ে আসছে। সেই সময় ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় মহারাজ উত্তর প্রদেশের কাষকুজ তথা কনৌজ নগর থেকে দুই ব্রাহ্মণ পাওকে সেখানে এনে মায়ের সেবায় কাজে লাগানো হয়। সেইকাজের জন্য রাজা ব্রাহ্মণদের কিছু জমিও দান করেন। আজও সেই বংশের উত্তর পুরুষেরাই মায়ের পুজো করছেন। পুজোর কাজের জন্য মহারাজ টলুয়া বা মাওবী, বাজনাদার, মশালধারীদের কিছু কিছু জমি দান করেন। মশালধারী পাহাড়ীয়া শ্রেণীর ঘানুষরা আজও প্রতিটি অমাবস্যার দিনে মন্দির চতুরে উপস্থিত হয়ে তাদের পূর্বসূরীদের মতো মশাল ধরে আলো দেখায়।

মূর্তির লাল জিভ না থাকায় তিনি কালী নন। তন্ত্রের ঘোড়শীরূপে তিনি পুজিতা হয়ে থাকেন। জানা গেছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে এখানে বেদীপীঠ ছিল। সেখানে কালীযন্ত্র দেখা যায়। যন্ত্রটি করবী ফুলের মতো। বেদীর চারপাশে অনেক দেবতার মূর্তি ও অস্পষ্টভাবে আরও কিছু দেখা যায়। মূর্তির আসনে যার মাথা থাকার কথা সেই মুণ্ডের মাপ অনুযায়ী চিহ্ন আজও দেখা যায়। মায়ের মূর্তির দক্ষিণদিকে একটি ছোট মূর্তি দেখা যায়। তাঁকে ছোট মা নামে পুজো করা হয়। কথিত আছে, ওই ছোট মূর্তি মা ত্রিপুরেশ্বরীর

মন্দিরের কাছে কোনও এক জলাশয়ের মধ্যে ছিল। অতীতে রাজারা যুদ্ধে যাবার আগে এই ছোট মূর্তিটিকে পূজো করতেন।

জানা যায়, ত্রিপুরার রাজা বংশানুক্রমে নিত্যদিন মন্দিরে এসে ত্রিপুরেশ্বরী মাকে দর্শন করতেন ও সকল কুলাচার মেনে চলতেন এবং তা যাতে বজায় থাকে তার জন্য নির্দেশ দিতেন। কিন্তু মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের ছেলে গোবিন্দমাণিক্য কুলাচার ভেঙে নরবলি বন্ধ করে দেন। দেবী তখন স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, কুলাচার মতে যদি না পুজ আমায়, গ্রাম ছাড়া হবে তুমি জানিও নিশ্চয়। একদিন সত্যি সত্যিই রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য থেকে বিতাঢ়িত হন।

মা ত্রিপুরেশ্বরীর পুজোয় আজও কোনও ছে পড়েনি। জনেক সত্যসাধনের বন্দনায় উল্লিখিত আছে,

শুনহে মায়ের অপূর্ব প্রতিভা, নানা দেশ হতে আসে ভক্ত অগনন মায়ের সেই দক্ষিণ চরণ পুজিতে নিত্য চলে ভোগবাদ্য আরতি উৎসব, দেবতা গন্ধর্বগণ করে মায়ের স্তব।

মৎস্য কৃষ্ণ নির্ভয়ে জলেতে খেলা করে।

পীর আওলিয়া আসে নানা স্থান হতে।।

নানা দেবতা, মুনি ঋষি আসেন হেথা শূন্য হতে।

কেহ ব্যাঘ, কেহ গজে, কেহ বা পথে ভগবান জন দেখা পায় আচম্ভিতে।।

হেথা বসে ত্রিপুরেশ শিব ভোলানাথ।

অন্যত্র শুভ্রা, বলরাম, জগন্মাথ,

মায়ের পূজার সনে এই সমদয়।।

দেখলে পুজিলে হয় মহা পুণ্যময়।।

বছর মোকাম আছে মায়ের ঘাড়ীর পথে।

হিন্দু মুসলমান যায় তথা সিন্ধি দিতে।।

বিপদে পড়লে নাবিক সকলে বছর বছর

বলে কাটে অমঙ্গল।।

ত্রিপুরপৌঠের কথা বড় পুণ্যময়,

যেই পড়ে সেই রাখে গ্রহদোষ ক্ষয়।

দেবীর মাহাত্ম্য কথা যে করে শ্রবণ,

সর্বপাপে মুক্তি আগে স্বর্গে গমন।।

বুধ গ্রহের শুরু এই ত্রিপুরা সুন্দরী।

এত দূর দেবী মাহাত্ম্য রচিল অধম সত্য সাধন।।

মোক্ষতীর্থ তারাপীঠ

না, একাম পীঠগুলির নামের মধ্যে তারাপীঠের উল্লেখ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশের মতে, তারাপীঠও মহাপীঠগুলির অন্যতম। এনিয়ে একদিকে যেমন অনেক সংশয় আছে, ঠিক তেমনি আছে বেশ কিছু অকাট্য যুক্তি। অগণিত সাধারণ মানুষ মনে করেন, তারাপীঠ হল প্রাণের পীঠ, আনন্দের পীঠ। মোক্ষলাভের আদর্শ জায়গা। সত্ত্বের তথা জীবনের সন্ধানে তাই অগণিত মানুষ বারবার ছুটে যান বীরভূমের তারাপীঠে।

মহাঘষি বশিষ্ঠদেব ছোটবেলায় সব বিষয়ে সব শাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। এক সময় মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি তপস্যা শুরু করেন। প্রথম প্রথম তাঁর সামনে উপস্থিত হয় নানান ধরনের বিভীষিকা। কিন্তু তাদের ভয়ে ভীত হননি তিনি। একসময় দৈববাণী শুনলেন বশিষ্ঠদেব, ‘তুমি চীন দেশে যাও’। কিন্তু চীন দেশের আচার আচরণ দেখে মনে যথেষ্ট ঘৃণা আসে তাঁর মনে। কিন্তু আবার দৈববাণী শুনে অবাক হয়ে গেলেন, ‘এভাবেই তোমাকে সাধনা করতে হবে। হঠাৎ-ই আগের জীবনের কথা মনে পড়ে গেল বশিষ্ঠদেবের। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে চীনদেশেই সাধনার জন্য তিনি যাবতীয় শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করেন। শিক্ষার শেষে বশিষ্ঠদেব ফিরে আসেন বীরভূমে। প্রথমে তিনি কবিন্দপুরে মূর্তি স্থাপন করার কথা ভেবেছিলেন। পরে নদীর ওপারে চন্দ্রচূড়ের পাশে শিমুলতলায় তারামূর্তি স্থাপন করেন ও সেখানেই সিদ্ধিলাভ করেন।

কথিত আছে, ব্ৰহ্মার ছেলে বশিষ্ঠ মহাবিদ্যার দৰ্শন লাভের আশায় বাবার কাছ থেকে মন্ত্র নিয়ে হাজার হাজার বছর কঠোর তপস্যা কৰৱেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেবীর দেখা পান নি। তখন বশিষ্ঠদেব ক্ষোভে ফেঁটে পড়ে শুধু ব্ৰহ্মাকে বলেন, আপনি আমায় যে মন্ত্র দিয়েছেন তা সিদ্ধিলাভের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাই আমায় অন্য মন্ত্র দিন। ব্ৰহ্মা তাঁকে বোঝান, তুমি মনপ্রাণ দিয়ে যোগের সাহায্যে আবার দেবীর দর্শন প্রার্থনা করো। তিনি নিশ্চয়ই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। বাবার আদেশে বশিষ্ঠদেব আবার এক হাজার বছর মন্ত্র জপ করলেন। তা সত্ত্বেও দেবীর দর্শন পেলেন না তিনি। নিজের ক্ষোভ চেপে রাখতে না পেরে একসময় তিনি মহাবিদ্যাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলেন। তখন দেবী তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি না জেনে আমাকে শাপ দিতে উদ্যত হয়েছে। যে আমার সেবা করার পদ্ধতি জানে না, আমার ভাবনার সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সে কি করে যোগের মাধ্যমে আমার পাদপদ্মের দর্শন পাবে? বেদেও আমার সাধনা সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। মহাচীনে যাও। সেখানে গেলে আমার মহাভাব প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। তারপর তুমি সিদ্ধিলাভ করতে পারবে।

দেবীর অন্তর্ধানের পর চীনদেশে গেলেন বশিষ্ঠ। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন বহুক্ষণী মহাদেবের সাধনার উপাচার। ভয় পেয়ে গেলেন পঞ্চতন্ত্র নিয়ে সাধনার রূপ

দেখে বৈদিকাচারনিষ্ঠ বশিষ্ঠদেব। কিন্তু দেবীর আদেশের কথা মাথায় রেখে তিনি মহাদেবকে বললেন, আপনার আচারের বিষয়ে জানতে চাই। জানতে চাই, কিভাবে আমি সিদ্ধিলাভ করব। তখন বশিষ্ঠদেব শিক্ষা পেলেন কৌলাচারের। সেই বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে তিনি ফিরে এলেন দ্বারকা নদীর তীরে।

কালিকাপুরাণে আছে, ব্ৰহ্মার মানসকন্যা চন্দ্ৰভাগ পাহাড়ে তপস্যার জন্য গিয়েছিলেন। পাহাড়ে যাওয়ার সময় বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে তার দেখা হয়। সেই সময় তাঁর কাছ থেকে তিনি তারা-উপাসনা পদ্ধতিৰ সন্ধান পান। তপস্যায় নারায়ণের আরাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মেধাতিথিৰ যজ্ঞকুণ্ডে আস্থাহৃতি দেন। মেধাতিথি, যজ্ঞকুণ্ড থেকে কামরূপে তাকে লাভ করেন। তাই তার নাম রাখেন অৱন্ধন্তী। কিশোরী অবস্থায় তিনি সাবিত্রী বেহলা, সৱস্বতী, চারুপদা ও গায়ত্রীদেৱৰ কাছে শিক্ষা নেন। একসময় বশিষ্ঠদেব ও তিনি, পরম্পৰেৰ প্রতি আকৃষ্ট হন। অৱন্ধন্তী মনে মনে বশিষ্ঠদেবকে স্বামী হিসাবে বৱণ কৱে নিয়েছিলেন। তাদেৱ এই পারম্পৰিক ভালবাসাৰ কথা সাবৰ্ণি, ব্ৰহ্মাকে জানান। তারপৰ ব্ৰহ্মাসহ সব দেবতারা মানস পাহাড়ে এসে বশিষ্ঠদেবেৰ সঙ্গে অৱন্ধন্তীৰ বিয়ে দেন। কন্যা সম্প্রদান কৱেছিলেন মেধাতিথি।

পুৱাণে আছে বিশ্বামিত্রেৰ সঙ্গে বশিষ্ঠেৰ বিবাদেৰ সুবাদে রাক্ষস সৌদাস বশিষ্ঠদেবেৰ একশ ছেলেকে হত্যা কৱে। এই বিবাদেৰ কাৱণ উল্লেখ আছে মৎস্যপুৱাণে। সেখানে উল্লেখ আছে, ক্লান্ত বশিষ্ঠদেব নিমিৱাজেৰ যজ্ঞে পৌৱেত্ত্বজ্ঞ কৱাৰ জন্য আপত্তি কৱায়, রাজা অন্য পুৱোহিতকে পৌৱোহিত্য কৱাৰ জন্য উদ্যোগ নিলে বশিষ্ঠদেব প্ৰচণ্ড রেগে গিয়ে তাকে শাপ দিয়ে বলেন, তুমি বিদ্যেয় হও। নিমিৱাজও বশিষ্ঠদেবকে একই অভিশাপ ফিরিয়ে দেন। ফলে দু'জনেৰ হাতৰ হয় একই রকম। ব্ৰহ্মাৰ বৱে নিমিৱাজ প্ৰতিটি জীবেৰ চোখেৰ পাতায় আশ্রয় পুন। বশিষ্ঠদেব জন্মগ্ৰহণ কৱেন মিত্ৰাৰূপণেৰ ছেলে হিসাবে। অন্য আৱ একটি মতে, বশিষ্ঠদেব ব্ৰহ্মাৰ নিৰ্দেশে দেহহীন অবস্থায় কামরূপেৰ পৌঠে তপস্যায় রত হন।

একসময় বিষুও তাঁৰ তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বৱ দেন। সেই বৱপ্ৰাপ্তিৰ সময় সন্ধ্যাগিৱিতে অমৃত নিয়ে এসে কুণ্ড তৈৱিৰ পৱ স্নান কৱে ও তার জল খেয়ে আগেৱ শৱীৰ ফিৱে পান। একসময় উগ্ৰতারা তাঁকেও তাড়াবাৰ চেষ্টা কৱেন। সেই প্ৰচেষ্টা দেখে তিনি অভিসম্পাত দিয়ে বলেন, তুমি যেহেতু আমায় তাড়াবাৰ জন্য ধৰেছ, এজন্য মায়েদেৱ ও অন্যজনেৰ কাছে বামভাবে পুজো পাৰে। তোমাৰ প্ৰমথৱা স্নেহেৰ মতো ঘোৱাফেৱা কৱছে বলে এই তীৰ্থে স্নেহ হয়ে থাকবে। এমনকি স্বয়ং মহাদেবও এখানে স্নেহেৰ মতো থাকবেন। যতদিন না বিষুও এখানে আসবেন ততদিন এই জায়গা এইভাৱেই থাকবে। একসময় কামরূপেৰ মাহাত্ম্য খুবই কম প্ৰচাৰ পাৰে। তবে যিনি এই মাহাত্ম্য জানতে পাৱবেন তিনি সম্পূৰ্ণ ফললাভ কৱবেন।

তন্ত্রসারের তারার্গ তন্ত্রে বলা হয়েছে,
 'বশিষ্ঠারাধিত্য বিদ্যা ন তু শীঘ্র কলা যতঃ।
 অগাস্তেনাপি মুনি না শাপো দত্তঃ সুদারুণাঃ।
 ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়াং ফলদ্বাত্রী ন কস্যাচ্চিতঃ।
 শাপোদ্বারমাহ চন্দ্ৰবীজং এ পান্তস্থ বীজোপরি নিয়োজিতঃ।
 ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং বধুরিব যশস্বিনী।
 ফলনী সৰ্ববিদ্যানাং জয়নী জয়কাঞ্জিণাং।
 বিবক্ষয়কারী বিদ্যা অমৃতত্ত্ব প্রদায়নী।।
 মন্ত্রস্য জ্ঞানমাত্রেণ বিজয়ী ভূমি জায়তে।

(তারাপ্রকরণম)

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে, অনন্তর যোগী রূপধারী বেতাল ভৈরব যে দিকে সন্ধ্যাচল
 আছে সেই দক্ষিণ দিকে গেলেন। সেখানে বশিষ্ঠ আনীতা কান্তানদী আছে। সেই নদীর
 তীরে ছায়া-ঘেরা গাছ তলায় ঢাকা এক বিরাট পর্বত। ব্রহ্মার মানসপুত্র এখানে বসে
 তপস্যা করেছিলেন বলে দেবতারা এর নাম সন্ধ্যাচল রেখেছেন; এখানে গিয়ে তাঁরা
 তপঃপ্রভা সম্পূর্ণ দ্বিতীয় সূর্য সদৃশ শিব-পূজা পরায়ণ ধ্যানসন্ত চিন্ত মূর্তিমান অগ্নিরূপ
 বশিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করে তাঁর সামনে অবনত মন্ত্রকে বন্ধুজ্ঞিলি দিয়ে স্তুতিবার করতে
 লাগলেন।

কোনও কোনও তন্ত্রে বশিষ্ঠদেবের চীনে যাইবাব বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে
 চীনাচারসার তন্ত্রের কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হল :-
new

ততঃ প্রণম্য তৎ দেবীঃ বশিষ্ঠে সঃ মহামুনিঃ।
 জগামাচার বিজ্ঞান বাঞ্ছয়া বুদ্ধরূপিণং।
 ততো গত্বা মহাচীনে দেশে জ্ঞানময়ো মুনেঃ।
 দদর্শ হিমবৎপার্শ্বে লোকেশ্বর সুসেবিতঃ।
 কামিনীনাং সহস্রেন পরিবারিতমীশ্বরঃ।
 মদিরাপান সজ্ঞাত মদ মহুর লোচনঃ।
 দুরাদেব বিলাক্ষ্যেনং বশিষ্ঠে বুদ্ধরূপিনঃ।
 বিস্ময়েন সদাবিষ্ট স্মরম্ সংসার তারিণীঃ।।
 কিমিদং ক্রীয়তে কর্মং বিষুণ্ণা বুদ্ধিপণা।
 দেবদেব বিরংকোহয়ং আচারসম্ভতো ময়।।
 ইতি চিন্ময়তন্ত্রস্য বশিষ্ঠস্য মহামুনেঃ।
 আকাশবাণী প্রাহাসু এবং চিন্তায় সুব্রত।
 আচার পরামার্থেহং তারিণী সাধনে মুনেঃ।
 এতদ্ বিরুদ্ধাচারস্য মতে না সৌ প্রসীদতি।

যদি তস্যা প্রসাদন্তঃ অচিরে নাভি বাঞ্ছিসি ।

এতেন চীনাচারেণ তদন্ত্রং ভজ সুব্রত ।

অথ বুদ্ধং প্রণম্যাহ ভক্তিন্ত্র মহামুনিঃ ।

প্রযুক্তং তারিণীদেব্যা নিজারাধন হেতবে ।

তচ্ছত্ত্ব ভগবান বুদ্ধস্ত্র জ্ঞানময়ো হরিঃ ।

বশিষ্ঠং প্রাহ সুজ্ঞানচীনাচারধি কারবান् ।

অপ্রকাশ্যেহয়মচোর স্তারিণ্যা সর্বদা মুনেঃ ।

তব ভক্তি বশাদশ্মিন् প্রকাশ্যামিহ তৎপরঃ ।

‘গুপ্ত চীনা চারক্রমে’ বুদ্ধরূপী মহাদেবে বশিষ্ঠ দেবকে বলেছেন, দক্ষের মেয়ে সতী মায়াপুরে (এখনকার হরিদ্বার বা কনখলে) শরীর ত্যাগ করার পর তাঁর দেহের নানা অংশ বিভিন্ন জায়গায় পড়েছিল। তাঁর ত্রিনেত্রের তিনটি মণি তিন জায়গায় পড়ে তিনটি তারাপীঠ তৈরী হয়েছে। এই তিনটি পীঠ বত্রিশ দেবযোজনব্যাপী ত্রিকোণের আকারে বিরাজ করছে। এখানে ত্রিপাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য ত্রিতারায় সাধনা করতে হয়।

গুপ্তচীনা চারক্রমেঃ দেবীর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে :

করতোয়া পশ্চিমে তু দক্ষনেত্রে প্রপাতনম্ ।

ভবানী সা মহাদেবী একজটা সুরেশ্বরী ।

রুদ্রশ্চ ভৈরবো যত্র চণ্ডবাপি প্রচণ্ডকৃত্বা ।

আগমোক্ত বিধানেন পূজাঙ্গপাদিকং ততঃ ।

ত্রিলক্ষজপমানেত্তু তত্র সিদ্ধির্ণ সংশয় ॥

বুদ্ধদেব, বশিষ্ঠমুনিকে বলেন, ত্রিথিলুর অগ্নিকোণে ভাগিরথীর উত্তরে তিনটি তারাপীঠের মধ্যে বাঁদিকের চোখের মণি পড়েছে। তারামায়ের দক্ষিণ চোখের মণি পড়েছে করতোয়া নদীর পশ্চিম দিকে। সেখানে দেবী ‘ভবানী’ নামে খ্যাত। পাশেই আছেন রুদ্রদেব চণ্ডভৈরব। দেবীর উর্ধনয়ন কোথায় পড়েছে সে সম্পর্কে বুদ্ধদেব বলেছেন :

বক্রেশ্বরস্য ঐশ্বান্যাং বৈদ্যনাথস্ত পূর্বতঃ ।

দ্বারকায়াং পূর্বভাগে তত্র তারা অধিষ্ঠাতা ॥

শিলাময়ীতি তদ্দেবী নিবসন্ শাশ্বলীমূলে ।

প্রত্যক্ষং সর্বযুগেহশ্মিন্ চণ্ডিকাস্থিতিঃ সর্বদা ॥

তত্র সিদ্ধির্ণ সন্দেহো দিবারাত্রে মুহূর্তকৈঃ ।

অক্ষয়াৎ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাদুগ্রভীরা প্রসাদতঃ ॥

অর্থাৎ বক্রেশ্বরের দৈশান কোণে দ্বারকানদীর পূর্বদিকে শিমূল গাছের মূলে দেবীর শিলামূর্তি আছে। তিনি যুগে যুগে পূজিতা মা তারা রূপে। কথিত আছে, এখানে যার শরীর চলে যায় তার আর জন্ম হয় না। আর এখানে সাধনা করলে সর্বসিদ্ধি লাভ করা সম্ভব। আরও শোনা যায়, তারাপীঠে পুজো দিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। সাধকদের মতে, তিনলক্ষ জপ করলেই এখানে সিদ্ধিলাভ করা যায়। বুদ্ধদেব বলেছেন তারাপীঠের

শিমূলতলায় একাদশ সহস্র সাধক সিদ্ধিলাভ করবেন। তারপর যিনি সাধকঘেণী তিনিই ধ্বংস করবেন শিমূলতলা।

বৃদ্ধদেরের নির্দেশে তিব্বত থেকে পঞ্চতন্ত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বশিষ্ঠদেব তারাপীঠে এসে তারামায়ের দর্শন পান। তারাগবতস্ত্রে বলা আছে বশিষ্ঠমুনির সাধনায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহাদেব শাপদমস্ত্রে তাঁকে পুনরজ্জীবিত করেন। সেখানে বলা আছে, ব্ৰহ্মানন্দ গিরি তাঁর ‘তারারহস্যময়’ বইতে লিখেছেন, প্রথম নিগমকল্পে রত্নদীপসহ দেবালয়ে উপবিষ্ট সদাশিব কালিকামুখনির্গ বাক্যাবলী শ্রবণপূর্বক পরিতোষ লাভ করিতে পারিলেন না, এহেতু পূর্বপৃষ্ঠ প্রশংগলি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূর্বে যে মূর্তিতে বিকট বদন দশানন্দকে বিনাশ করিয়াছিলেন, বৰাভয় করা, খড়গ ও মুণ্ডাধীরণী, লোলজিহা, ভীষণমূর্তি সেই কালিকাদেবী সকলেরই বিশেষ অর্চিতা। হে প্রিয়ে ! তৎকালে রুদ্রের জন্য সুরবৃন্দ চিন্তাকুল হইলে, ব্ৰহ্মা দেবগণের সহিত একত্র হইয়া সুৰ্ক কৰিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। বাকপটুতা, ধন ও মোক্ষদাত্রী কালিকাদেবী তাহাদিগকে দর্শনপূর্বক লজ্জিত হইলেন ও অবনতমস্তকে বাম করে ধৃত খড়গ দক্ষিণ করে আনয়ন করিলেন। তখন রুদ্রের পরিধেয় চৰ্মাঘৰ স্থলিত হইলে ব্ৰহ্মা তাহা ধারণ করিলেন। পরে কাঞ্চিমুদ্রা গ্রহণ, দক্ষিণে খড়গধারণ ও শিরস্থ মুকুট ভৃতলে নিষ্ফেপপূর্বক তথ্য রুদ্রকে আনয়ন করিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ভৃতলে পদ সমীপে পতিত হইয়া বলিলেন, হে সুরেন্দ্ৰি ! আমি দ্বাদশ অ্যুতশাস্ত্র গ্রহ পাঠ কৰিয়াও তোমার কলা কাহাকে বলে, বলিতে সময় হইতেছি না। অতএব হে ভক্তবৎসলে ! মাতঃ কালিকে। মৎপতি প্রসরা হইয়া যোগ উপদেশ কর।

‘প্রাণতোষিণী’ তন্ত্রে উল্লেখ আছে, তারাপুর অর্থাৎ বৰ্তমান তারাপীঠ, একান্নপীঠের অন্যতম বলে উল্লেখ না থাকলেও ‘পীঠনির্ণয়’ এ অন্যতম পীঠ হিসাবে উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে,

তারাদুয়োঁ বামনেত্রঁ তারাখ্যাতারিণী পরা

উন্মত্তো বৈরেব স্তৰ সৰ্বলক্ষণ সংযুতঃ।

নীলতন্ত্র বইতে উল্লেখ করা হয়েছে একটু অন্যভাবে। রাঢ় অঞ্চলে দ্বারকা নদীর পূবদিকে যে শ্বেত শিমূলগাছ আছে তার তলায় রয়েছে তারামায়ের শিলামূর্তি। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে এখানে যে উগ্রতারা তার অংশবিশেষ সতীর তৃতীয় নয়ন পড়েছিল, সেই তথ্য সবসময় গোপন করা হয়। বলা বাহ্য, বশিষ্ঠদেব এখানে দেবীর আরাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। এক সময় দ্বারকানদী দিয়ে বাণিজ্যাত্মায় যেত বড় বড় নৌকা। একবার রত্নগড়ের বণিক জয়দন্ত দ্বারকা নদী দিয়ে নৌকা করে যাচ্ছিলেন। একসময় নেমে এল সন্ধ্যা। মাঝি মাল্লারা যেখানে নৌকা ভেড়ালেন সেটিই ছিল তারাপীঠের শৃশান সংলগ্ন ঘাট। তখন অনেক রাত। থুরথুরে বৃদ্ধার বেশে স্বয়ং মা তারা নৌকায় এসে জয়দন্ত’র কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন জয় দন্ত। ঘটনাচক্রে ওই রাতেই জয়দন্ত’র একমাত্র ছেলেকে বিষধর সাপ দংশন করে। তখনকারদিনে সাপে কাটা মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হত কলার ভেলায়। জয়দন্ত ঠিক করলেন ছেলের ক্ষেত্রেও

একই পথ অবলম্বন করে নিজে আত্মহনন করে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যাবেন।

পরের দিন গঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে অমৃতকুণ্ডের ধারে বসে মাঝি মাল্লারা রামার আয়োজন করছিল। এমন সময় জনেকা জেনেনী একটি বড় শোলামাছ বিক্রি করার জন্য নিয়ে এল। মাঝিরা মাছটা কুটে ধোওয়ার জন্য নিয়ে গেল অমৃতকুণ্ডে। কুণ্ডের জলের স্পর্শ পেতেই টুকরো টুকরো করে কাটা মাছ জ্যাণ্ট হয়ে জলের মধ্যে চলে গেল। এই সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে মাঝিরা তো হতবাক। তারা ছুটে গিয়ে সমস্ত ঘটনার কথা জানাল তাদের প্রভু জয় দন্তকে। জয়দন্ত হতবাক হলেন তাদের কথা শুনে। তিনি ভাবলেন, টুকরো টুকরো করে কাটা মাছ যদি কুণ্ডের জলের স্পর্শে জ্যাণ্ট হয়ে ওঠে তাহলে তার মরা ছেলেও বেঁচে উঠতে পারেন। কিছুক্ষণের মধ্যে জয়দন্তের নির্দেশে মৃত ছেলেকে ভাসিয়ে দেওয়া হল অমৃতকুণ্ডের জলে। মুহূর্তের মধ্যে সে ‘জয় তারা’ বলতে বলতে উঠে এল জল থেকে। ঘটনার প্রভাবে কিংকর্তব্যবিমুক্ত জয়দন্ত যাত্রা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই রাতেই তারা মা জয়দন্তকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, তুমি যেখানে এখন রয়েছ সেটিই হচ্ছে মোক্ষতীর্থ তারাপীঠ। এখানেই শাশ্বতী মূলের কাছে আমি শিলামূর্তি আকারে রয়েছি। তুমি তা প্রতিষ্ঠা কর। শুধু আমার নয়, চন্দ্ৰচূড় মহাদেবের পুজোর ব্যবস্থাও তুমি করবে।

মায়ের নির্দেশমত জায়গায় জয়দন্ত খুঁজে পেলেন ব্রহ্মশিলা। সেখানেই শিলুলগাছের পাশে শশানের মধ্যে একটি ছোট মন্দির তৈরি করিয়ে তারা মা ও মহাদেবকে প্রতিষ্ঠা করলেন। খবর নিয়ে জানালেন, কাছেই রয়েছে মহলা গ্রাম। দেবীপুজোর জন্য সেখান থেকে আনা হল ভৈরব ঠাকুরকে। পুজোর জন্য কেনা হল বেশ কিছু সম্পত্তি। অমৃতকুণ্ডের নাম হয়ে গেল ‘জীবিত কুণ্ড’। অনেকে একে বলেন, জীয়ন পুকুর। তারাপীঠে তারা মায়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে আশৰ্য্য রক্তের মিল রয়েছে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের। সীতাকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে পুজো করে জাগিয়েছিলেন মা দূর্গাকে আর এই শরৎকালেই, আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে জয়দন্ত তারাপীঠে তারামায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির বন্যায় ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর ঢাকার রাজা রামজীবন নতুন করে মন্দির তৈরি করান। কিন্তু সেই মন্দিরও একসময় ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমান মন্দিরটি তৈরি করা হয় ১২২৫ বঙ্গাব্দে। শোনা যায়, মল্লারপুরের ব্যবসায়ী জগন্মাথ রায় এই মন্দির তৈরির কাজে প্রভুত অর্থ ব্যয় করেন।

রাজা রামজীবন রায়ের দন্তক পুত্র রামকান্ত রায়ের স্ত্রী রাণী ভবানী। তিনি তারামায়ের নিত্য পুজোর জন্য বিচ্ছিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন। শরৎকালীন চণ্ডীপুর মৌজার মালিক আসাদুল্লা খাঁ-র কাছে প্রস্তাব করেন, রাণীমার এলাকার বনহাটে আয় বেশি হয়। তাই আসাদুল্লা খাঁ যদি মৌজা চণ্ডীপুরের পরিবর্তে মৌজা বনহাট নিতে চান, তাহলে তিনি তা এখনই দিয়ে দিতে রাজী। তারা মায়ের ইচ্ছায় রাজী হলেন আসাদুল্লা। নাটোরের রাণীমার নিয়ন্ত্রণে আসে তারাপীঠ।

রাণী ভবানীর দন্তক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের আমলে তারাপীঠে আনন্দনাথ নামে জনৈক কৌল সাধক আসেন তারাপীঠে। রাজা তাঁকে তারাপীঠের প্রধান সেবাইত হিসাবে স্থিরভূত দেন। আনন্দনাথের পরে তাঁর শিষ্যও আনন্দনাথ নাম গ্রহণ করে প্রধান হিসাবে অভিষিক্ত হন। তিনি এখানে কৃষ্ণ এবং কালীর একত্রে পূজোর ব্যবস্থা করেন। তাঁর সময় থেকেই তারাপীঠে জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দোলযাত্রার প্রবর্তন হয়।

তারামায়ের পূজো কোন সময় থেকে প্রচলিত হয়েছে এ সম্পর্কে নানান মতভেদ আছে। তবে জানা গেছে, দীপক্ষের শ্রীজ্ঞানের সময় তারা মায়ের পূজোর ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। বৌদ্ধতত্ত্ব মতে, তারা মা হলেন লোকেশ্বর বুদ্ধের সূতা। তাঁর আর এক নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। মৎস্যসূত্র তত্ত্বের সপ্তম পটলে আছে, ‘লোকেশ্বরস্য সূতাপা নমতা বালা বৃদ্ধা কালী শ্রেতা স্বাহা স্বধা বিধেয়া’। সেখানে আরও উল্লেখ আছে,

জয় জয় তারে দেবি নমস্তে,
প্রভবতি ভবতি যদিই সমস্তে।
প্রজ্ঞাপারমিতা মিতচরিতে,
প্রণতজনানাং দুরিত ক্ষয়িতে ॥

তারাপীঠকে কেন্দ্র করে রয়েছে হাজারো কাহিনী, অসংখ্য গাঁথা। কালিকাপুরাণের সাতচলিশ থেকে একান্ন অধ্যায়ে এরকম একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আছে। অবশ্য অন্যত্রও এ ধরনের কল্পকথার সন্ধান পাওয়া যায়। স্মরণীয় আছে,

মহাদেব এবং সতী একসময় নিভৃত বিশ্রাম করেছিলেন। তখন দ্বার রক্ষা করেছিলেন ভূংদী এবং মহাকাল। হঠাৎ-ই সতী কিছুটা আবিন্দু বেশে বাইরে বেরিয়ে আসেন। দেবীকে ওই অবস্থায় দেখে লজ্জায় মাথা মুছ করেন দুই দ্বাররক্ষী। তাদের দেখে ক্ষুর সতী অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমরা মর্তে গিয়ে জন্মগ্রহণ করো। যেহেতু তোমরা আমায় এই অবস্থায় দেখেছ তাই তোমাদের মুর্খ হবে বানরের মতো। অভিশাপ শুনে মহাকাল ও ভূংদী বললেন, আমরা আপনার গভৰ্ত্তী জন্মগ্রহণ করতে চাই। সেজন্য আপনাকেও মর্তে আসতে হবে। আপনি অসংযত অবস্থায় আসলেও আমরা কিন্তু সংযতভাবে হিলাম। কিছুদিন পরে মহাদেব মর্তে এসে, দক্ষের পৌত্র তথা পৌষ্যরাজার ছেলে হয়ে জন্মান। একসময় তাঁর বাবা-মা বাণপ্রস্ত্রে চলে যাওয়ার পর তিনি, দুর্শত্বতী ধারে করবীরপুরের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। কপালে চন্দলেখা থাকায় তাঁর নাম রাখা হয় চন্দ্রশেখর। অন্যদিকে আর্যাবর্তের ভোগবতী নগরে রাজা কুকুৰস্থ ও রাণী মনোমাথিনীর কন্যা হিসেবে সতী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বুকে জন্ম থেকেই ছিল নক্ষত্রমালার মতো হার চিহ্ন। তাই তাঁর নাম রাখা হল তারাবতী। একসময় বিবাহ যোগ্যা তারাবতীর জন্য আয়োজন করা হয় স্বয়ম্ভুর সভার। সেখানে উপস্থিত অন্যান্য রাজার দিকে দৃষ্টিপাত না করে তিনি চন্দ্রশেখরকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেন। রাজা কুকুৰস্থ বিয়ের যৌতুক হিসাবে আটাশ হাজার দাসী ও দু'হাজার গাড়ী উপহার দেন। তারাবতীর মতো তাঁর বোন চিরাঙ্গদাও খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন।

তিনি দিদির সঙ্গে তাঁর শুশুরবাড়ি যান। চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয়েছিল উর্বশীর গর্ভে। শোনা যায়, অষ্টাবক্র মুনির শাপে চিত্রাঙ্গদাকে উর্বশীর গর্ভে জন্ম নিতে হয়।

আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল ওদের দিনগুলি। কাছেই নদীতীরে বাস করতেন কপোত ঝৰি। তিনি স্নানরত অবস্থায় তারাবতীকে দেখে মোহিত হয়ে যান। মুনিবর তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কায় কপোত হিসাবে থাকতেন বলে সকলে তাকে কপোত নামে অভিহিত করত। একদিন কপোত ঝৰি সরাসরি তারাবতীর কাছে তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। মুনির কথা শুনে তারাবতী তাকে অপেক্ষা করতে বলে চলে আসেন। চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল, কোনও সুন্দরী দাসীকে যথাযথভাবে সাজিয়ে ঝৰি কপোতের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু তারাবতী চিত্রাঙ্গদাকে মুনির কাছে যেতে বললেন।

কালে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে দুটি ছেলে হয়। একদিন তারাবতী নদীতে যখন স্নান করতে যান তখন তিনি ঝৰি কপোতের চোখ এড়াতে পারলেন না। চিত্রাঙ্গদাকে তার পরিচয় জানতে চাওয়ায় চিত্রাঙ্গদা শাপের ভয়ে সত্যি কথা বলে দিলেন। তখন কপোত মুনি তাঁকে শাপ দিয়ে বলেন, তুমি আমায় ছলনা করার জন্য খুব কুৎসিং দেখতে কর্মদক্ষীন কোনও ব্যক্তি তোমায় গ্রহণ করবেন। এক বছরের মধ্যে তোমার গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান আসবে এবং তাদের মুখ দেখতে হবে বানরের মতো।

এদিকে চন্দ্রশেখর রাণীকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতেই পঞ্চবিংশ বর্ষের নাম আবার রাণী, স্বামী ও মহাদেবের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকেন। একদিন মহাদেবের ও দুর্গা তারাদেবীকে দেখতে পাওয়ার পর তাদের মনে পড়ে গেল ভৃঙ্গি ও মহাকালের কথা। তখন দুর্গা আশ্রয় নিলেন তারাদেবীর শরীরে এবং মহাদেব কপোত ঝৰির অভিশাপ ঘরণ করে বীভৎস রূপ ধারণ করে তারাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলেন। কিছুদিনের মধ্যে জন্ম নিল এক কুৎসিত বানরের মুখের মতো পুত্র সন্তান। এরাত্তি ভৃঙ্গি ও মহাকাল। রাণী ও সদ্যোজাত দুই ছেলেকে দেখে রাজা চন্দ্রশেখরের মনে নামন সংশয় জন্মাল। এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন দেবৰ্ষি নারদ। তাঁর নির্দেশে তাদের নাম রাখা হল তৈরব ও বেতাল।

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে, রাজার আরও তিনটি ছেলে ছিল। তাদের নাম উপরিচর, অলর্ক ও দমন। তাই তৈরব ও বেতাল রাজার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হত। একদিন তাদের সঙ্গে কপোত ঝৰির দেখা হল। তিনি তাদের জন্ম রহস্য বর্ণনা করলেন এবং কামরূপের সন্ধ্যাচলে গিয়ে ব্ৰহ্মার ছেলে বশিষ্ঠদেবের পরামর্শ নেওয়ার উপদেশ দিলেন। তখন কপোত বশিষ্ঠদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে তারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সাধনার জন্য বশিষ্ঠদেব চীনদেশে গিয়েছিলেন। পরে তিনি তারাপীঠে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। তাই এই কাহিনীর সঙ্গে তারাপীঠের যথেষ্ট সংযোগ আছে বলে মনে করা হয়ে থাকে।

তত্ত্বসারে, পীঠের চারকোণে যে গুরুপংক্তি আছে সেখানে কেশানন্দনাথ নামে চারজন গুরুর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে পাঁচজন সিদ্ধগুরুর নাম। এরা হলেন,

বশিষ্ঠানন্দনাথ, কুর্মানন্দনাথ, মীননাথানন্দ, মহেশ্বরানন্দনাথ ও হরিনাথানন্দনাথ। তারামনেন্দ্র বলা হয়, আনন্দনাথ শক্তাস্তা গুরুবং সর্বসিদ্ধিদাঃ। অন্যদিকে বাবে বাবে প্রশ্ন উঠেছে, কে এই বশিষ্ঠদেব, তিনি কবে জন্মগ্রহণ করেন? কারও মতে, তিনি বুদ্ধদেবের সময়ের লোক। আবার কারও মতে, তিনি বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের মতে, তিনি ইষ্টকে নিজের বশে আনতে পেরেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় বশিষ্ঠ। আর এক মতে, তাঁর অন্য কোনও নাম ছিল। বশিষ্ঠ তিনি উপাধি হিসাবে পেয়েছিলেন। তারাতন্ত্রে বলা হয়েছে,

অথ তারাগুরুণ् বক্ষ্য দৃষ্টাদষ্টফলপ্রদান্ত।

উধর্বকেশো ব্যোমকেশো নীলকঞ্চ বৃষ্ণবচঃ।।

দিব্যোখাঃ সিদ্ধিদা বৎস সিদ্ধৌখান্ শণু তত্ত্বতঃ।।

বশিষ্ঠঃ কুর্মানাথচ মীনানন্দে মহেশ্বরঃ।।

হরিনাথঃ মানবৌখান্ শণু বক্ষ্যামি তদ্গুরুণ।

তারাবর্তী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরণ।।

সুখানন্দঃ পরানন্দঃ পারিজাতঃ কুলেশ্বরঃ।।

বিরুপাক্ষ ফেরবী চ কথিতঃ তারিণী কুলঃ।।

অর্থাৎ চারজন দিব্যোখ গুরু মহাদেবেরই চার প্রতিমূর্তি তত্ত্বসিদ্ধ সিদ্ধৌখরা হলেন, যোগী পুরুষ। বশিষ্ঠদেব, মীননাথ সেই যোগীদেরই অন্তর্ম। তাত্ত্বিক যোগিনী হলেন তারাবর্তী ও ভানুমতী। সুখানন্দ যোগীপুরুষদের একজন। তবে তারা সিদ্ধগুরু হিসাবে চিহ্নিত নন।

তারাপীঠের সঙ্গে অঙ্গাদিভাবে জড়িয়ে আছে সাধক বামাক্ষ্যাপার নাম। ওই গ্রামে সেই সময় অনেকে ব্রাহ্মণের বাস ছিল। বামাক্ষ্যাপার বাবা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। বামাক্ষ্যাপা ছেটবেলা থেকেই এত সরল ছিলেন যে, পাড়ার লোকেরা তাঁকে ‘হাউড়ে’ বলেই ডাকতেন। সর্বানন্দ ছিলেন ধর্মভীকু এবং সরল, সাধাসিধে মানুষ। কম বয়সে বুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি মনপ্রাণ নিবেদন করেন তারা মায়ের সেবায়। মা রাজকুমারীর দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন বামা।

১২৪৪ সনের ১২ ফাল্গুন তারাপীঠের কাছে আটলা গ্রামে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ছেটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বর প্রেমের উচ্ছ্঵াস চোখে পড়ত। পড়শীদের বাড়ির ঠাকুর ঘরের সব বিশ্ব চুপিসারে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে তিনি পুজোয় মতে উঠতেন। এক সময় তাঁদের সংসারে প্রবল আর্থিক অন্টন দেখা দেয়। কারণ হল, একদিকে যেমন সংসারে সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে খরচও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ব্যাপারে চিন্তাপ্রিয় হয়ে পড়েন সর্বানন্দ। তিনি ভাল গান গাইতে পারতেন, বেহালা বাজানোতেও তাঁর খ্যাতি ছিল চারপাশের মানুষজনের কাছে। এই দুটি পুঁজির ওপর নির্ভর করে তিনি একটি কৃষ্ণযাত্রার দল গঠন করেন। খুব একটা পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না বামাচরণ। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিক্রমী হিসাবে চিহ্নিত হত। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের

ধর্মকাব্য যথা, কবিকঙ্কন, কমলাকাস্ত, রামপ্রসাদের গান সেই ছোট্ট মনে বড় তুলত। পরবর্তী সময়ে এইসব গান গেয়ে ভক্তদের মাতিয়ে দিতেন বামাচরণ।

শুধু বাবা-মাই নন, বামাচরণের বড় বোন জয়কালী দেবী ছিলেন তাঁর কাছে পথদর্শকের মতো। জয়কালী ছিলেন প্রকৃত সাধিকা। ছোটবেলায় বিধবা হওয়ার পর তিনি বাপের বাড়ীতে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। এই মহীয়সী নারী একদিন নিজের শরীর ছাড়ার আভাস দেন। তারাপীঠে তারা মায়ের পায়ের তলায় তাঁকে আনা হলে ‘তারা নাম’ উচ্চারণ করতে করতে তিনি শরীর ত্যাগ করেন।

অনেকদিন আগের কথা। বিশেক্ষ্যাপা নামে এক মহাসাধকের আবির্ভাব হয় তারাপীঠে। এরপর আসেন কৌলাচার্য আনন্দনাথ। আনন্দনাথের শিষ্যের শিষ্য ছিলেন মোক্ষদানন্দ। এইসময় তারাপীঠে কৈলাসপতি বাবার আবির্ভাব হয়। তাঁর সামিধ্যে বামাচরণ হয়ে যান তারামায়ের কোলের ছেলে।

নাটোরের রাজরাণী একদিন এক দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে উঠলেন। মা-তারা তাঁকে স্বপ্নে জানিয়েছেন, চারদিন ধরে তিনি উপবাসী রয়েছেন। মা বলেছেন, যুগ যুগ ধরে আমি এখানে রয়েছি। কিন্তু আর আমার এখানে থাকার কোনও উপায় নেই। মন্দিরের পুরুত আর তোমার রক্ষী আমার ছেলে বামাকে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে। এই দেখ, সেই দাগের ছাপ পড়েছে আমার পিঠে। কেন তাকে তোমার লোকেরা মেরেছে? জান? মন্দিরে তখন আমায় ভোগ দেওয়া হয়েছে। আমি আমার ছেলেকে ডেকে বলেছিম, আয়, আমার সঙ্গে থাবি আয়। তাই তো ও মন্দিরে চুকে আমায় দেওয়া ভোগ থেকে খেতে এসেছিল। আজ চারদিন হল আমার ছেলে না খেয়ে শাশানে ঘৰে বেড়াচ্ছে। তাই আমিও উপবাসী রয়েছি।

কেঁদে উঠলেন রাণীমা। বললেন, মা তুমি যা চাইবে আমি তাই মেনে নেব। তখন মা-তারা বললেন, ঠিক আছে আর্যি তারাপীঠেই থাকব। তবে এখন খেকে এমন ব্যবস্থা করো যাতে আমায় ভোগ দেওয়ার আগে বামাচরণকে খেতে দেওয়া হয়।

সকালে উঠেই রাণীমা দেওয়ানকে আদেশ দিয়ে বললেন, এখন তারাপীঠে গিয়ে বামাচরণ আর মায়ের ভোগের ব্যবস্থা করুন। মনে রাখবেন, চারদিন ধরে আমার মা উপবাসী রয়েছেন। দেওয়ান তারাপীঠে পৌঁছে বরখাস্ত করলেন পুরুতমশাই ও রক্ষীকে। কিন্তু যার জন্য এত আরোজন তিনি কোথায়? তিনি তখন দেওয়ানজীকে দেখে ভয়ে লুকিয়ে পড়েছেন। অনেক খোঁজাখুজির পর তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল। সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলা হল, মা-তারাকে ভোগ দেওয়ার আগে বামাচরণকে ফেন খেতে দেওয়া হয়।

আর একবার বামাচরণকে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল তারাপীঠে। তিনি তখন প্রায়শই তারামায়ের মন্দিরে অথবা শাশানে ধ্যানাবস্থায় ও সমাধিতে মগ্ন থাকতেন। এক এক সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। এরই মধ্যে একদিন তিনি তারামায়ের মূর্তিতে প্রস্তাৱ করে দিলেন। উপস্থিত সবাই ও পুরোহিতৰা সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বামাচরণকে এ বিষয়ে বলা হলে তিনি বললেন, ‘বেশ করেছি আমার মায়ের গায়ে মুতেছি, তোদের

তাতে কিরে, শালারা।' সেদিনই সেই আশচর্যজনক খবর পাঠানো হল নাটোরের রাজদরবারে। এবারেও পাওয়া গেল মায়ের আদেশ। রাজদরবার থেকে আদেশ এল, মায়ের পুজো যেমন চলছে তেমনই চলবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপার কথায় পরে আসছি, তার মাঝে তত্ত্বাধিনা ও তিব্বত সম্পর্কে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অনুভূতি আভাস দিতে চান। উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে পরিক্রমার সময়ে ১৮৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্বামী অখণ্ডনন্দ মহারাজকে (গঙ্গাধর মহারাজ) লেখা চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন,

....তিব্বত সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছ, তাহা অতি আশাজনক, আমি সে-স্থানে যাইবার একবার চেষ্টা করিব, সংস্কৃতে তিব্বতকে 'উত্তরকুরবর্ষ' কহে-উহা প্রেছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চভূমি—এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে।তিব্বতীদের যে তত্ত্বাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে সকল তত্ত্ব প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম শৃষ্টা। ঐ সকল তত্ত্ব আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর এবং ঐ প্রকার immorality দ্বারা যখন নিবীর্য হইল, তখনই কুমারিল ভট্ট দ্বারা দূরীভূত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাউলরা মহাপ্রভুকে secret স্ত্রীসঙ্গী, সুরাপায়ী ও নানা প্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং 'প্রজ্ঞাপারমিতোক্ত' তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কৃৎসিত ব্যাখ্যা করে; ফলে এই হইয়াছে যে, এক্ষণে বৌদ্ধদের দুই সম্প্রদায়; বর্মা ও সিংহলের লোক প্রায় তত্ত্ব মানে না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীও দূর করিয়াছে এবং উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধেরা যে 'অমিতাভ বুদ্ধম' যানে, তাহাকেও ঢাকীসুন্দ বিসর্জন দিয়াছে। মূল কথা এই, উত্তরের নেতৃকর্তা যে 'অমিতাভ বুদ্ধম' ইত্যাদি মানে, তাহা 'প্রজ্ঞাপারমিতা' দিতে নাই, কিন্তু দেবদেবী অনেক মানা আছে। আর দক্ষিণীরা জোর করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া দেবদেবী বিসর্জন করিয়াছে। যে everything for other তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছ, ঐ phase of Buddhism আজকাল ইউরোপকে, বড় strike করিয়াছে।

....যে ধর্ম উপনিষদে জাতি বিশেষে বৃদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বারা ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়া ছিলেন। নির্বাণে তাহার মহস্ত্ব বিশেষ কি? তাহার মহস্ত্ব in his unrivalled sympathy. তাহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে নাই তাহার intellect এবং heart যাহা জগতে আর হইল না।

বেদের যে কর্মবাদ, তাহা Jew প্রভৃতি সকল ধর্মের কর্মপাদ, অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যিকরণ দ্বারা অন্তর শুন্দি করা—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব the first man যিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু ভাব ঢং সব পুরাতনের মতো রহিল, সেই তাহার অন্তঃকর্মবাদ—সেই তাহার বেদের পরিবর্তে সূত্রে বিশ্বাস করিতে হ্রকুম। সেই জাতিও

ছিল, তবে গুণগত হইল, সেই যাহারা তাঁহার ধর্ম মানে না, তাহাদিগকে ‘পাষণ্ড’ বলা। ‘পাষণ্ড’টা বৌদ্ধদের বড় পুরানো বোল, তবে কখনও বেচারীরা তলোয়ার চালায় নাই এবং বড় toleration ছিল। তর্কের দ্বারা বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্মের প্রমাণ? বিশ্বাস কর। যেমন সকল ধর্মের আছে, তাহাই। তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেইজন্যই তিনি অবতার হন। তাঁহার মায়াবাদ কপিলের মতো। কিন্তু শঙ্করের how far more ground and national! বৃন্দ ও কপিল কেবল বলেন—জগতে দুঃখ, দুঃখ, পালাও পালাও।উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম উঠেছে, তার উপর শক্তরবাদ। কেবল শক্তর বুদ্ধের আশৰ্চ্য heart অনুমাত পান নাই কেবল dry intellect—তবে তত্ত্বের mob-এর ভয়ে ফোড়া সাড়াতে গিয়ে হাতসুন্দ কেটে ফেললেন।

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ‘ইতি’ করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরের আপনাকে limited করিবার শক্তি নাই।

....আপন ইচ্ছায় ইতস্তত তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে, কখন শাশানে নিদ্রা যাইতেছেন; যেখানে বেদ শেষ হইয়াছে, সেই বেদান্তের পথে সঞ্চরণ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাঁহার শরীর। বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত, তিনি কখন উলঙ্ঘ, কখন উত্তম-বন্ধুধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রাই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্তবৎ, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে তোমার তাহাই হিউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ ভ্রমণ কর।

ইতি—

বিবেকানন্দ

আবার ফিরে আসি তারাপীঠে সাধক বামাক্ষ্যাপার নানান প্রসঙ্গে। মন্দির চতুরের ধারে খরঙ্গোত্তা দ্বারকা নদীর পাড়ে তারাপীঠের মহাশূশান। অনেকের বিশ্বাস, এই শূশানে কারও দেহ চিতার আগুনে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলে তার নির্বাণ লাভ হয়। শূশানের মধ্যে একধারে রয়েছে বশিষ্ঠ মুনির পঞ্চমুণ্ডীর আসন। তার পাশেই মাটিতে শোয়ানো আছে মহাসাধক বামাক্ষ্যাপার পুণ্য দেহ।

বেশ কয়েকটি কুকুরের সঙ্গে বামাক্ষ্যাপার সখ্যতা ছিল চোখে পড়ার মতো। বাবার সঙ্গলাভ থেকে তারা বঞ্চিত হত না কখনও। একপাতে তাদের সঙ্গে দুপুরের আহার করতেন মহাতাপস। তবে দিনের বিভিন্ন সময় তাঁর আচরণে নানান পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত। কখনও তিনি দিগন্বর অবস্থায় উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। আবার কখনও গাঁজা বা কারণ সেবন করে থাকতেন মহানন্দে। আবার কখনও বা আচরণ করতেন বালকের মতো। সেই তিনিও মাঝে মধ্যে হয়ে উঠতেন পিশাচবৎ।

শাস্ত্র অনুসারে জানা যায়, দন্তাত্ত্বে, দুর্বাসা, বশিষ্ঠদেব, ভূগু প্রভৃতি মুনিরা ছিলেন তারাসিদ্ধ। ইতিমধ্যেই এদেশের আটটি স্থান মা তারার সিদ্ধপীঠ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

বামাক্ষ্যাপার বাবা যখন প্রয়াত হন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। অনন্যপায়

হয়ে মা রাজকুমারী দেবী বামাক্ষ্যাপাকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। মামা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চাষের কাজে বামাচরণকে মাঠে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মাঠে গিয়ে তিনি অন্য ভাবে বিভোর হয়ে যান। তাঁর সেই অন্যমনস্থতার সুযোগে গরুগুলি অন্যের ফসলের ক্ষতি করে। দিনের পর দিন প্রতিবেশীদের অভিযোগ শুনে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়, আটলায়, নিজের বাড়ীতে।

বামাচরণকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় মা রাজকুমারীদেবী। কি করে সংসার চলবে? ভবিষ্যতে বামা কি করবেন—এইসব সাতপাঁচ ভেবে রাজকুমারী দেবীর দুশ্চিন্তা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারাপীঠের শাশানে তখন প্রায়শই আসতেন বিভিন্ন তন্ত্রসাধকেরা। মাঝে মাঝে বামাচরণও ছুটে যেতেন সেখানে। গ্রামের বিভিন্ন প্রাণ্তে ফুটে থাকা ফুল তুলে ঢেলে দিতেন তারামায়ের পাদপদ্মে। তারাপীঠের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বে তখন ছিলেন মোক্ষদানন্দ। বাবা কৈলাসপতিও তখন সেখানে থাকতেন।

কৈলাসপতি বাবার সংসার জীবন সম্পর্কে তেমন কোনও পরিচয় জানা যায় না। অনেকে তাঁকে মণি গেঁসাই বলে ডাকতেন। আবার কেউ কেউ তাঁকে শ্যাপা বলেও ডাকতেন। তিনি বশিষ্ঠাসনে বসার অধিকারী ছিলেন। জনশ্রুতি আছে, তারাপীঠে আসার আগে তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন। কৃষ্ণসাধনায় সফল হয়ে তিনি শ্যামা তথা তারা মায়ের সাধনায় ব্রতী হন তারাপীঠে এসে। তুলসীর মালা গলায় পরে, ভৈরবীকে সঙ্গে নিয়ে সর্বদা মেতে থাকতেন তারানন্দে। কুলার্ঘবের আনন্দ সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে—

বামে রামা রমনকুশলা দক্ষিণে পানপাত্
মগ্রে নস্তং মরিচ সহিতঃ শূকরস্যোঽমাঃসমঃ।
স্বক্ষে বীণা লনিত সুভগ্ন সদ্গুরুণাং প্রপঞ্চঃ।
কৌলেধুমঃ পরগগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥

অর্থাৎ কোনের বাম পাশে রমনকুশলা রামা, দক্ষিণে পানপাত্, সম্মুখে মরিচের সঙ্গে উষ্ণ বরাহ মাংস, স্বক্ষে সুলনিতা মোহিনী বীণা এবং সদ্গুরুদের সঙ্গ—এই ধরনের ভাবনা সাধারণ মানুষ তো বটেই মহাতাপসদেরও ধারণার বাইরে। বিজ্ঞনের মতে, শ্যাপাবাবার মধ্যে এই ভাব দেখা যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখ, তিনিই বামাচরণকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন। তারাপীঠে আরও একজন কৈলাসপতি বাবা ছিলেন। তিনি মোক্ষদানন্দবাবার শুশুরকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। সাংসারিক জীবনে তাঁর নাম ছিল ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়। নদীয়া জেলার অধিবাসী মোক্ষদানন্দ ত্রিশ বছর বয়সে বিবাহিত জীবনের মোহত্যাগ করে সম্যাস জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে চলে যান। সেখানে তিনি ব্রহ্মানন্দের কাছে মন্ত্রদীক্ষা দেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁকে বীরভূমের শক্তিপীঠে সাধনা করতে বলেন। তারাপীঠেই তাঁর সাধন জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে। একসময় রামানন্দ মণ্ডলের মেয়ে শুভক্ষরীকে তিনি ভৈরবী হিসাবে গ্রহণ করেন। মোক্ষদানন্দবাবার সঙ্গে বামাচরণের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। তিনি ডাবুকে অনাদিলিঙ্গের মন্দির তৈরি করান। অনেকে তাঁকে ডাবুকের কৈলাসপতি বলেও সম্মোধন করতেন।

বহুরমপুরের তারাক্ষ্যাপা, বামাক্ষ্যাপার কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিও একসময় তারাপীঠের মন্দিরের প্রধান হন। সেখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, চক্ৰবৰ্তী বাবা, খাঁকি বাবা, দয়ানন্দ সৱস্থতী, জটামা, নিগমানন্দ পরমহংস প্রমুখ।

দিন যত এগোয়, বামাচরণ ততই তারামায়ের টানে বিভোর হয়ে যান। আগে স্থানীয় মানুষেরা তাকে ডাকতেন ‘হাউডে’ বলে। কিছুদিন পর থেকে তাকে ডাকা হত ‘ক্ষ্যাপা’ নামে। পিতৃহারা হবার পর বামাচরণ বুঝতে পেরেছিলেন সংসারের আর্থিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। তাই কখনও কখনও অভাবে জজিরিত নিজের মাকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন, বামুনের ছেলে আমি। তুমি দেখো, কোথাও না কোথাও অস্তত পুজো করার কাজ আমার জুটে যাবে। মা, তুমি চিন্তা করো না, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাজের চেষ্টাও করেন বামাক্ষ্যাপা। দু'এক জায়গায় কাজও পান। কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার ফিরে আসেন নিজেদের বাড়িতে। খুব সুন্দর গান গাইতে পারতেন তিনি। পূর্বজন্মের সংস্কার অনুযায়ী তিনি বেশিদিন সেখানেও থাকতে পারেন। স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য চলে এসেছিলেন তারাপীঠের মহাশশানে।

এইভাবে চলতে চলতে একসময় লক্ষ্য করা গিয়েছিল, শরীরের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই, খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বেশির ভাগ সময়েই থাকতেন খোলা আকাশের নীচে। গরম-ঠাণ্ডা-বর্ষা সবেতেই তিনি একইভাবে বিচরণ করতেন।

এরই মধ্যে একদিন সকালে ঘটে গেল এক বিশ্বয়কর ঘটনা। বামাক্ষ্যাপা স্নান করতে গিয়েছিলেন শ্রশানসংলগ্ন নদীতে। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল নদীর ওপারে ছোট ভাই রামচরণ মায়ের মৃতদেহ সৎকার করার জন্য নিয়ে এসেছে। তখন ভরা বর্ষা। তাই কিছুতেই নদী পেরিয়ে ওপারে তারাপীঠের শশানে রাজকুমারী দেবীর দেহ নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু মহাসাধক মায়ের অস্তিম সময় কোনও বাধাই মানতে রাজী হননি। মনেপাণে চেয়েছিলেন মায়ের মৃতদেহের সৎকার হোক তারাপীঠের মহাশশানে, যেখানে এই পৃথিবীর সঙ্গে চিরবন্ধন থেকে প্রত্যেককে মুক্ত করে দেন স্বয়ং মা তারা।

শবদেহ বাহকেরা তখন রাজকুমারী দেবীর সৎকার করার ত্রৈড়জোড় করছেন। এমন সময় দেখা গেল, বামাক্ষ্যাপা সাঁতারে এপারে চলে আসছেন ওপার থেকে। তারপর শবদেহ বাহকদের কাছে থেকে কেড়ে নিলেন মায়ের মৃতদেহ। একখণ্ড কাপড় দিয়ে মাকে পিঠে বেঁধে বাঁপিয়ে পড়লেন নদীর জলে। তারপর নদী পার হয়ে এসে লেলিহান আগুনের মাঝে চিরবিদ্যায় দিলেন নিজের জন্মদাত্রীকে।

মায়ের শবদাহের পরে আবার সেই একই আচরণ। কোনও দিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ আদ্যাশ্রাদ্ধের দিন তিনেক আগে ছোটভাইকে আদেশের সুরে বললেন, দেখিস মায়ের শ্রাদ্ধের সময় আশেপাশের গ্রামের কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। রামচরণসহ উপস্থিত সবাই তো ক্ষ্যাপাবাবার সে কথায় হতবাক হয়ে গেলেন। কি যে বলছেন তিনি! নুন আনতে পাস্তা ফুরোনোর মতো তাদের অবস্থা। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিন দেখা গেল, জানা-অজানা অনেক মানুষ থেরে থেরে উপাচার ও খাবার নিয়ে আসছেন। চারিদিক ভরে গেছে অগণিত অতিথির

উপস্থিতিতে। হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। শুরু হল মেঘের প্রবল গর্জন। সবাই প্রমাদ গুণচ্ছেন কি হবে, তারই আশঙ্কায়? বামাক্ষ্যাপা তখন বসে আছেন তারাপীঠের শানানে আপন খেয়ালে। আকাশে মেঘ দেখে তিনি ছুটে এলেন নিজের বাড়িতে। ভাইকে সান্তোষ দিয়ে বললেন, তোরা কোনও চিন্তা করিস না। তারামায়ের আশীর্বাদে সবকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে যাবে।

সত্যিই তাই হল। তারামায়ের জয়ধবনির মাঝে সবাই দেখলেন, আটলা গ্রামের আশেপাশে উন্মত্ত হাতির মতো মেঘবৃষ্টির দাপাদাপি। অথচ শ্রাদ্ধের জায়গার আশেপাশে এক ফোটাও বৃষ্টি পড়ছেন। অনিব্রচনীয় আনন্দের মাঝে কয়েক শ' মানুষ সেই অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন।

তথাকথিত জাতপাত কিছুই মানতেন না বামাক্ষ্যাপা। তিনি সন্ধান করতেন প্রকৃত মানুষের। নন্দ হাড়ি একজন তথাকথিত পিছিয়ে পড়া মানুষ ছিল তাঁর অনুগত। একসময় নন্দ হাড়ির দুটি হাত কুঠরোগে আক্রান্ত হয়। ওই অবস্থাতেই সে মহাতাপসের খাবার জল তুলে দিত। একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, বাবা, ও জাতে হাড়ি তায় আবার কুঠরোগ, ওর দু'টো হাতে ছেয়ে গেছে। আপনার মতো মানুষ কি করে ওর হাতে জলগ্রহণ করছেন?

কথাগুলি শুনে প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে ক্ষ্যাপাবাবা বলেছিলেন, আমার ইচ্ছে আমি ওর হাতে জল খাই। তাতে তোর কী? এমন আর কত অসুস্থি পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে তিনি সুস্থিতার সন্ধান দিয়েছিলেন অলৌকিকভাবে। এমনকি হৃত্যু পথযাত্রী মানুষকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন প্রাণ। এমনও শোনা যায়, জনেক তরুণী বিধবা অতি শুদ্ধ মনে তাঁর জন্য খাবার তৈরি করে আনেন। ক্ষ্যাপাবাবা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, মা তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হবে। তাঁর সেই আশীর্বাদ পরবর্তী সময়ে সত্যে পরিণত হয়। এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সেই তরুণী বিধবার বিয়ে হয় এবং যথাসময়ে তিনি সন্তানের মা হন।

১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাস। বৃষ্টির প্রকোপে এক মিনিটও রেহাই মিলছে না। এমন সময় ক্ষ্যাপাবাবা ভক্তদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, মোক্ষদানন্দ বাবাকে যেখানে সমাধি দেওয়া হয়েছে সেখানেই যেন এ দেহকে সমাধিস্থ করা হয়। ২ৱা শ্রাবণ রাতে তিনি তারামায়ের নাম জপ করতে করতে তারাপীঠে মহাসমাধিতে লীন হয়ে যান।

তারাপীঠে ক্ষ্যাপাবাবার আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন চটক বাবাজী ও হরে গোঁসাই। ক্ষ্যাপাবাবার শরীর চলে যাবার পর তাঁরা বাবাকে সৃষ্টিভাবে দর্শন করেন। গোঁসাই খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। শোনা যায়, গোঁসাই একসময় মা তারার জ্যোতি দর্শন করেন।

বামাক্ষ্যাপা তখন স্বমহিমায় বিরাজ করছেন তারাপীঠে। সেসময় অনেক সাধকের আবির্ভাব হয় সেখানে। এদেরই একজন হলেন, পঞ্চানন মিশ্র। তিনি ছিলেন বিহারের মিথিলা অঞ্চলের বাসিন্দা। সব সময় মগ্ন থাকতেন তারামায়ের জপধ্যানে। অন্যদিকে তিনি ভজনা করতেন গোবিন্দেরও। পরবর্তীসময়ে তিনি ফিরে যান মিথিলাতে। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

বামাক্ষয়াপার পরে তারাপীঠের উচ্চমানের সাধক হিসাবে প্রমথনাথ চক্রবর্তীর নাম শোনা গেছে। ১৩১৪ সালে তিনি তারাপীঠে আসেন। তাঁকে সবাই চক্রবর্তীবাবা বলে ডাকতেন। তারাপীঠের মহাশ্শানে একটি উঁচু মাচানের ওপর তৈরি কুটীরে তিনি সাধনভজনে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। একসময় তিনি ক্ষ্যাপাবাবাকে পুরোপুরি ভুল বোঝেন। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভাঙে। কিন্তু কখনও বলতেন না, আমি দুশ্শরের প্রতিভূ ইত্যাদি। সবসময় বলতেন, তারামাকে ডাকো, তিনিই তোমায় কৃপা করবেন। অথচ তাঁর আশীর্বাদে অনেকে কঠিন রোগের হাত থেকে রক্ষা পান। বিশেষ সূত্রে জানা যায়, তিনি জনেক ডেভিড আর্থার সাহেবের ছেলেকে মারণ ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত যন্ত্রারোগ থেকে মুক্ত করেন।

চক্রবর্তীবাবা তারাপীঠে থাকার সময় সেখানে আসেন সাধক নাপিত গেঁসাই। তাঁর আদিবাড়ি ছিল সাঁইথিয়ার কাছে দেবপুর গ্রামে। তিনি বেশ কিছুদিন সংসারজীবনে আবদ্ধ ছিলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী, কন্যা ছিল। তারাপীঠের লাগোয়া শ্শান হল মুগুমালিনীতলা। অনেকের মতে, দ্বিতীয় জায়গাটি হল তারাপীঠ মহাশ্শানেরই অংশ। নাপিত গেঁসাই সেখানে সাধনভজনে মেতে থাকতেন।

মাত্র তেক্রিশ বছর বয়সে মহাসাধিকা আনন্দময়ী মা তারাপীঠে আসেন। এক ব্যতিক্রমী প্রেক্ষাপটে তিনি সেখানে আসার প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর স্থানীয় রমণীমোহন চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তারাপীঠে থাকার সময় আনন্দময়ী মা নিজে বাসা করে স্থানীয় মহিলাদের রান্না করে খাওয়ান। আনন্দময়ী মা'র আশ্রম মাঝে মাঝে মায়ের সম্পর্কে কিছু বিচিত্র ঘটনার কথা জানা গেছে। সেখানে থাকার সময় মা আনন্দময়ী মেয়েদের উপবীত দিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি সেখানে আশ্রম ও বানলিঙ্গ শিব স্থাপন করেন।

তারাপীঠে এসে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ অন্যান্য সাধক-সাধিকারা হলেন, ব্রহ্মাণী জটামা, পুরুনন্দ স্বামী, সারদাচরণ শাস্ত্রী, যতীমোহন পান্তা, সারদাচরণ সাহা, শ্রীকৃষ্ণ সাধু, নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার বাবা, দয়ানন্দ সরস্বতী, যোগেশ পাণ্ডু, ভৈরবদাস জ্ঞানানন্দ, নগেন্দ্রনাথ বাগচী, যোগমায়া ভৈরবী, সত্যানন্দ গিরি, মিহির কিরণ ভট্টাচার্য, হরিহর বাবা, স্বামী হরানন্দ, ভোগলা বাবা, বশিষ্ঠানন্দ স্বামী, ব্ৰহ্মচৱণ শুন্দ নন্দ, ব্ৰহ্মচৱণ সৰ্বানন্দ, হীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, বিজয় অঘোরী, রামদাস মিশ্র, কুকুরদাস মুখোপাধ্যায়, ল্যাংটা বাবা, শ্রীশ্রী রামঠাকুৰ, সত্যানন্দ মহারাজ, ভোলানন্দ গিরি প্রমুখ।



সমন্বয়ের মহাতীর্থ হিংলাজ

তন্ত্রচূড়ামণিতে বলা হয়েছে,

‘ব্রহ্ম রস্তাৎ হিঙ্গুলায়ং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।

কোটুরী সা মহাদেব ত্রিশুণা যা দিগন্ধুরী॥।

অর্থাৎ প্রাচীন হিঙ্গুলায় পড়েছিল দেবীর ব্রহ্মারস্ত। পাকিস্তানের মানুষ দেবীর স্থানকে বলেন, ‘নানী কি হজ’। পাকিস্তানের করাচী থেকে ৯০ মাইল উত্তরে বালুচিস্তানে দেবী মার সেখানকার মুসলমান মানুষজন বলেন, ‘নানী বিবি’। কাছেই রয়েছে অঘোর নদী। সমতল থেকে প্রায় চারহাজার ফুট ওপরে পাহাড়ের গুহায় দেবী অংশের অবস্থান। পীঠ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম। পাহাড়ে দেবীর ব্রহ্ম রস্তাৎ পড়েছে বলে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে বলা আছে, তাকে দুটি ভাগে ভাগ করে তার বুক চিরে বয়ে গেছে হিঙ্গুলা নদী।

এক সময় হিংলাজ তীর্থে যাবার জন্য তীর্থ্যাত্মীদের অবগন্ধিয় কষ্ট সহ্য করতে হত। ছড়িদারদের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুদিন মরুভূমির পথ পার হয়ে যাত্রীরা পৌছতেন চল্লনাথে। সেখান থেকে দৈবাদেশ পেলে তারপর যাত্রা করতেন হিংলাজের উদ্দেশ্যে। অতীতে তীর্থ্যাত্মীরা হিংলাজের উদ্দেশ্যে রওনা না হবার আগে জমা হতেন নাগনাথের আখড়ায়। বহু প্রাচীন এই আখড়া থেকে মূলত যাত্রা শুরু করা হত পথের নদীর জল শুকনো থাকার সময়ে। তা না হলে কোনও কোনও সময় নদীর জল বেড়ে গিয়ে, না খেতে পেয়ে তীর্থ্যাত্মীদের মৃত্যু হয়েছে। তখন কেউ হিংলাজতীর্থের উদ্দেশ্যে রওনা না হলে ধরে নেওয়া হত তিনি আর ঘরে ফিরে আসবেন না। মরুভূমি দিয়ে চলার একমাত্র যান হল উট। তথ্যের মাধ্যমে জানা গেছে, ভাগ্য মোটামুটি সুপ্রসন্ন থাকলে যাত্রীরা ঘোল থেকে বিশ্রাম দিনের মধ্যে পৌছে যেতেন হিংলাজ মায়ের কাছে। যাবার হিসাবে সঙ্গে নেওয়া হত আটা, নুন, গুড় ও মরিচ।

পথে চলার সময় ছড়িদারদের হাতে থাকত অনেকটা ত্রিশূলের মত দেখতে গাছের ডাল। এর গায়ে লাগানো থাকত সিঁদুর ও জড়ানো থাকত বিচিত্র বর্ণের কাপড়। যেখানে তাঁরা যাত্রাবিরতি করতেন সর্বপ্রথম সেটি বালির ওপর পুঁতে তার উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া হত। এক ছিলিম গাঁজা।

করাচী ছাড়ানোর পর পড়ে হাব নদী। সেখানে পৌছে প্রত্যেক তীর্থ্যাত্মীকে রুমালের মাপে একটি নতুন কাপড় গেরুয়া রঙে ছাপিয়ে হাতে দেওয়া হত। সেটি হাতে নিয়ে প্রত্যেককে সন্ধ্যাস্বরত নেওয়া ও কাউকে হিংসা না করার শপথ নিতে হত। আরও শপথ নিতে হত, প্রত্যেকে প্রত্যেকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই নিজের

কুঁজোর জল অপরকে দেবে না। এর কারণ হল, নিজের কুঁজোর জল অপরকে দিলে দুটো জীবনই নষ্ট হতে পারে। এমনকি স্তৰী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে, মা তার সন্তান বা সন্তান তার মাকেও জনের ভাগ দেবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই পীঠকে ‘প্রথম পীঠ’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়? ব্রহ্ম রন্ধ্র হল দেহ তথা সৃষ্টির উৎস। এখান থেকেই সৃষ্টি হয় শব্দ। বিজ্ঞনের মতে, মানুষের ব্রহ্ম রন্ধ্রে যে শক্তির সৃষ্টি হয় হিংলাজ মা তারই প্রতীক।

পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদদের মতে, দেবী হিংলাজ আসলে কোনও হিন্দু দেবী নন। তিনি সুমেরীয় ইলিনী এবং প্যালেস্টাইনের দেবী ‘নিনা’। বেদজ্ঞদের মতে, তিনি রণদেবী ইন্দ্রাণী। মধ্যপ্রাচ্যের দেবতা বাল-এর প্রকৃতি হলেন বালিং বা শাইবোল। বিবর্তনের সুবাদে সেই নামের অপভ্রংশ হয়ে দাঁড়ায় বালুচিতে। মনে করা হয়, এই থেকে ওই জায়গার নাম হয় বালুচিস্তান যা শটী বা বালুচির জায়গা। সেই জন্য অনেক ধর্মগবেষক মনে করেন, বালুচিস্তান তথা হিংলাজ মায়ের অবস্থান হাজার হাজার বছরের। কোনও কোনও মতে, হিংলাজ মাতাই শেষ সতীপীঠ। আর যে সব পীঠকে সতীপীঠ বলা হয় সবই পরবর্তীসময়ে মানুষ তৈরি করেছে অথবা বসতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পীঠাসন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।

অতীতে হিংলাজের পথে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাবার সন্ধয়স্থানী, ছড়িদার, উটওয়ালা, তথা জলবাহকেরা নিজেদের মধ্যে একটি নিয়ম তৈরি করত। সেই পথা হল, প্রত্যেকদিন প্রত্যেক যাত্রী একটি করে রুটি উটওয়ালা এবং জলওয়ালাকে দেবে। পথ চলতে চলতে যেখানে পানীয় জলের কৃপের সন্ধান পাওয়া যাবে সেখানে যে কৃপওয়ালা সেটির পাহারায় থাকে সেও যাত্রীদের কাছে থেকে একটি করে রুটি পাবে। এ তথ্যের স্বপক্ষে মতপ্রকাশ করেছে কালিকানন্দ অধ্যুষিত তার লেখা ‘মরুভূমী হিংলাজ’ বইতে।

পথেই পড়বে শোনবেনী ও রিয়াসত। দূরদূরান্তের মরুভূমি থেকে অনেকেই এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এখনকার বাড়িগুলির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। সবগুলির মুখ পূর্বদিকে। আজও এই যাত্রাপথে কাউকে দেখলে পুণ্যার্থীরা একটি থালায় ছেবড়াসুন্দ নারকেল, হলুদে ছেপানো সুতোর গুচ্ছ কিছু শুকনো মিছরি যাত্রীদের হাতে মায়ের পুজো দেবার জন্য তুলে দেন। আর একই সঙ্গে গাওয়া হয় হিংলাজ মায়ের গান। তবে যেহেতু এখন আর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয় না, তাই যাত্রার ধরনে ব্যপক পরিবর্তন আসায় যাত্রীদের ভাবনাতেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

হিংলাজ মায়ের কাছে যাবার আগে চন্দ্ৰকূপ বাবার কাছে যেতে হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেখান থেকে আদেশ পেলে তবেই হিংলাজ মায়ের কাছে, যাওয়া যায়। তারও আগে পৌছাতে হয় গুরুশিষ্য পাহাড়ে। স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস জনৈক গুরু এবং তাঁর শিষ্য কালো পাথরে পরিণত হয়ে যুগ যুগ ধরে এখানে অবস্থান করছেন। লম্বায় প্রায় তিন হাত, চওড়ায় দেড় হাত, উচ্চতায় হাত দুয়েক। দু'টি মানুষের দেহ পাথরে

পরিণত হয়ে এখানে রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হবে না। এই দু'টি পাথরকে ঘিরে গল্লকথা প্রচলিত আছে ওই চতুরে।

এক সময় জনৈক গুরু ও শিষ্য গিয়েছিলেন হিংলাজ মায়ের দর্শনে। জল ছিল দু'জনের কাছেই। গুরু কিন্তু বারবার শিষ্যের কাছে থেকে জল চেয়ে খাচ্ছিলেন। গুরুর আদেশ শিষ্য অমান্য করতে পারেননি। এক সময় শিষ্যের রাখা শেষ জলটুকুও গুরু খেয়ে নেন। এরপর জলের অভাবে শিষ্য বালির ওপর পড়ে গিয়ে মারা যান। শিষ্যের ওই পরিণতি দেখে গুরুদের ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলেন, একসময় যখন তার জলও ফুরিয়ে যাবে তখন কি হবে? হঠাৎ ঘটে গেল এক অস্বাভাবিক কাণ্ড। তার জলের পাত্রটি ফেটে চৌচির হয়ে গেল ও মুহূর্তের মধ্যে মরুভূমি সব জলটুকু শুষে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকেও চিরবিদায় নিতে হয় এই পৃথিবী থেকে।

আসলে এই ধরনের কাহিনীর প্রচলন করার অন্য উদ্দেশ্য আছে। তা হল, তীর্থ্যাত্মীদের সতর্ক করে দেওয়া। তবে এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। সরাসরি গাড়ীতে করে চলে যাওয়া যায় মায়ের মন্দিরের কাছে।

যারা অতীতে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে হিংলাজ তীর্থে যেতেন তাদের প্রত্যক্ষ করতে হত নানান ধরনের দৃশ্য। মাইলের পর মাইল ধূ ধূ করছে। তারই মাঝে এক একটা জলের কৃপ পরিষ্কার রেখে কিছু পরিষ্কার দিন ঞ্জরান করে থাকে। অন্যান্য জায়গার মতো মরুভূমি অঞ্চলেও ভূতের কাহিনী শেন্মা যায়। উটকে কেন্দ্র করেই সাধারণত এই ধরনের গল্লকথা আবর্তিত হয়। অনেকের ধারণা, চলার পথে উটের পিঠের ওপর পাতা খাটিয়ায় যদি কোনও মানুষ বসে না থাকে তাহলে সেখানে ভূতেরা চেপে বসে। এই সব ভূতেরা নাকি খুবই নিষ্ঠুর হয়। সুযোগ পেলেই তারা উটকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিপথে নিয়ে গিয়ে দিক্কান্ত করে দেয়।

চন্দ্ৰকূপের অবস্থান সমুদ্রের থেকে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে। প্রচলিত বিশ্বাস, চন্দ্ৰকূপ সকলের সবধরনের পাপ হরণ করে নেন। সকলের পাপ তাঁর কৃপে জমা হয়ে ধূনোর মাধ্যমে আকাশের দিকে উড়ে যায়। কতদিন ধরে এই ধূনি জ্বলছে তা কেউ জানে না। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের মধ্যে পাপ যতদিন থাকবে ততদিন এই কূপেরও অস্তিত্ব থাকবে। ধর্মভীকুদের বিশ্বাস, যেখান থেকে প্রথম চন্দ্ৰকূপ স্বামীর দর্শন পাওয়া যাবে, সেখান থেকে দণ্ডি খেটে কূপের কাছে পৌছাতে হবে।

পুরাণে চন্দ্ৰকূপ স্বামীর বিষয়ে উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে, সেখানে পৌছানোর পর বাবা, মা, ঠাকুরদাদার নাম বলে হিংলাজ যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। একই সঙ্গে তিনি যদি তার পাপ স্বীকার না করেন তা হলে ছাড়পত্র পাওয়া সম্ভব নয়। মূলত যদি কেউ জীবনে নারীহত্যা বা ভুগহত্যার মতো পাপ করে থাকেন তাহলে তা স্বীকার করতেই হবে কূপের সামনে। চন্দ্ৰকূপ স্বামীর, হিংলাজ দর্শনের অনুমতির প্রদানের পদ্ধতিও বড় বিচ্ছিন্ন ধরনের।

যাত্রীদের পুজো দেবার জন্য নিয়ে যেতে হয় দুটি করে নারকেল, ছোট একটি গাঁজা ভরা কক্ষে। অনুমতি না পাওয়া গেলে যদি কেউ নারকেল আর গাঁজা ভর্তি কক্ষে কৃপের মধ্যে ফেলেন তাহলে তা পড়ে থাকবে কাদার মধ্যে। অন্যথায় যাবে কৃপের কাদায়। অনেক যাত্রী নারকেল আর গাঁজাভর্তি কক্ষে ছাড়াও কৃপের ধারে রাখা করা ভোগ নিবেদন করেন দুর্ঘারের উদ্দেশ্যে। শাস্ত্রানুযায়ী, মাটিতে রেখে ভোগ মাখা যাবে না। মাটি স্পর্শ করলেই তা এঁটো হয়ে যায়।

চন্দ্ৰকুপ বাবার অনুমতি নিয়ে আবার পথচলার শুরু হয়। এক সময় পার হতে হয় অঘোর নদী। সেটি পার হয়ে সামনে যে পাহাড় পড়ে সেখানেই হিংলাজ মায়ের গুহা। কথিত আছে, রাবণের মতো ত্রিসঙ্ক্ষা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা ব্রাহ্মণকে হত্যা করার জন্য ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয়েছিল স্বয়ং রামচন্দ্রে। হিংলাজ মাকে দর্শন করার পর তিনি সেই পাপ থেকে মুক্ত হন।

বর্তমানে করাচী থেকে বাসে করে বেলুচিস্তানের শহর বিস্দরে যেতে হয়। একসময় যেখানে ছিল শুধুই মরুভূমি। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে দোকানপাট, ঘরবাড়ি। যে পাহাড়ে হিংলাজ মা অবস্থান করছে সেখানকার অনেকটাই দুর্গের মতো। এখানে নদীর ধারে কয়েকটি ডাঁটাগাছ আছে। সকলে সেই ডাঁটা দুটি করে ভেঙে আনে। একটি দিয়ে দাঁতন করে অন্যটি পুঁতে দেয় সেখানেই তীর্থ্যাত্মাদের এটিএকটি অবশ্য পালনীয় কাজ।

বাস থেকে যেখানে নামতে হয় তার পাশেই এখন তৈরি হয়েছে সুন্দর লজ। তীর্থ্যাত্মাদের অন্যান্য কর্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে সন্তুষ্টপূর্ণ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা ইত্যাদি। হিংলাজের মোহস্তুরে যিরে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। মাত্র আটাশ বছর বয়সে নাথ সম্প্রদায়ের জন্মেক সন্ন্যাসী হিংলাজ মাকে দর্শন করতে এসে সেখানেই থেকে যান। নদীর তীরেই তিনি বাস করতেন। প্রায় মাস ছয়েক পড়ে একদল তীর্থ্যাত্মী সেখানে এসে দেখতে পান এক কক্ষালসার মানুষকে। তার সেই অবস্থানের বিষয়ে জানতে পেরে যাত্রীরা সবচেয়ে আগে পুজো করেন তাঁকে। সেই থেকে সব তীর্থ্যাত্মী মোহস্তু মহারাজকে সবচেয়ে আগে পুজো দেন। জীবনের নিয়মে এক মোহস্তু মহারাজের জায়গায় আর এক মোহস্তু আসেন। স্থানীয় মানুষ তাঁদের ‘কোট্ৰী পৌ’ বলে ডাকেন আর ছড়িদারেরা বলেন, ‘অঘোৱী বাবা’। স্থানীয় মানুষ এবং তীর্থ্যাত্মাদের তাঁদের প্রতি থাকে অবিচল ভক্তি। দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর প্রতিটি কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনেন।

কিছুদিন আগে তৈরি গেস্টহাউস থেকে আঁকাবাঁকা পাথুরে পথ দিয়ে গেলে দেখা যাবে মায়ের গুহার মধ্যে কালী মূর্তি আছে। কাউকে বলে দিতে হয় না কোনটি হিংলাজ মায়ের গুহা। তার সামনে রয়েছে একটি জলাধার। হাঁটুজলে স্নান করেন সবাই।

দশ বারোটি সিঁড়ি ভেঙে মায়ের বেদীর কাছে পৌছানো যায়। বৃক্ষের মতো বেদী। অনেক উঁচুতে ছাদ। বেদীর উপর দুটি গোলাকৃতি সিঁদুর মাখানো শিলা জরির কাপড় দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। পুরোহিতের মতো, সেগুলি হল, মা, বেটি অর্থাৎ হিংলাজ মা ও

তার মেয়ে। এই বৃত্তাকার বেদীর ভিতরে ঢেকা যায়। দুপাশে দুটি দরজা আছে। চুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। ভিতরে ঘন অঙ্ককার। ওই গুহার মধ্যেই হিংলাজ দর্শন হয়।

অতীতে বেদীর ওপর কোনও মূর্তি ছিল না। একটি প্রদীপ জুলত সেখানে। লাল সালুতে বেদী মোড়া থাকত। পাকিস্তান হবার আগে পর্যন্ত মুসলমানেরা নদী পার হয়ে কোনও পীঠস্থানে যেতেন না। সূর্ণী সাধকেরা হিন্দু যাত্রীদের মারফৎ নানীর উদ্দেশ্যে মেওয়া, মোমবাতি পাঠিয়ে দিতেন। সামনে ত্রিশূল পৌতা আছে। তার পিছনেই রয়েছে বেদী। শোনা যায়, অনেক সাধক সেখানে মায়ের জ্যোতিরূপ দর্শন করেছেন। অঙ্ককারে কিছুই দেখা যায় না। তবে যাঁরা ভাগ্যবান তাদের কথা আলাদা। বেদীর ওপর রাখা মালা যাত্রীদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বিশ্বাস, যতদিন এই মালা গলায় থাকবে ততদিন তার কোনও ক্ষতি হবে না।

আর একটি প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে। মাকে দর্শন করার পরে পরনের কাপড় ছেড়ে আসতে হয় সেখানেই। নতুন কাপড় পরে যেতে হয় মাকে দর্শন করতে। এক বিচির ঘটনা সেখানে চোখে পড়ে। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দেখা যায় একটি খুব বড়মাপের পাথর বেরিয়ে আছে পাথরের গা থেকে। সেই পাহাড়ের গায়ে আঁকা আছে সূর্য ও চন্দ্র। জনশ্রুতি হল, স্বয়ং রামচন্দ্র এখানে পুজো দিতে আসার সময় সূর্য-চন্দ্র এঁকে তাঁর আসার চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন।

হিংলাজ দর্শন হয়ে গেলে আকাশ গঙ্গা দর্শন করতে হয়। পাহাড়ের মাথায় তার অবস্থান। এও এক পৃণ্যতীর্থ। এখানে একধরনের গাছ আছে, যা চোখের অসুখের ক্ষেতের মহৌষধি হিসাবে পরিচিত। অন্য আর একটি মুতে, আকাশ গঙ্গার জল দিয়ে ভালভাবে চোখ ধুলে অনেকে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পান। সেখানে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। পৌছাতে সময় লাগে দু-আড়াই ঘন্টা।

এখন হিংলাজ মাকে দর্শন করার জন হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। মুসলমানেরা হজের সময় এখানে আসেন হজ করতে। ধর্ম সমষ্টিয়ের মহাপীঠ হিসাবে হিংলাজ তাই সব ধর্মের মানুষজনের কাছে ক্রমশ দুর্নিবার আকর্ষণে পরিণত হচ্ছে।



করবীরপুরে দেবীর ত্রিনেত্র

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর অনন্দামঙ্গলে লিখেছেন,

শর্করারে তিন চক্ষু ত্রিগুণভৈরব (বৈভব)
মহিষ মদিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব।।

করবীরপুরকে বলা হয় দ্বিতীয় পীঠ। এ সম্পর্কে পীঠ নির্ণয়ে বলা হয়েছে,

করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমদিনী।
ক্রোধী শে ভৈরব স্তুত্র.....

এখানে দেবী মহিষমদিনী এবং ভৈরব হলেন ক্রোধীশ। বেলপাতার তিনটি সুন্দর পাত্রের মতো দেবীর তিনটি নেত্র। তত্ত্বচূড়ামণিতে করবীর পীঠের উল্লেখপর্বে যেভাবে বলা হয়েছে, সেই অনুযায়ী এই মহাপীঠ সিঙ্কু প্রদেশের শর্করার, বর্তমানের সুকুচরে অবস্থিত। তবে এর অবস্থান নিয়ে অনেক দ্বিমত আছে। কালিকাপুরাণ মতে, করবীর পুর ছিল প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত দেশের রাজধানী। দৃষ্টব্যতী নদীর তীরে কোনও কোনও গবেষকের মতে, এই পীঠগুলির অবস্থান হল মুম্বাইয়ের কাছে মহারাষ্ট্রের কোলহাপুরে। কাছেই রয়েছে পঞ্চনদীর সঙ্গম এবং এই মন্দিরটি পঞ্চসাগর মান্দির নামে পরিচিত। তবে এ সম্পর্কে আরও একটি মতেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের মতে, এটি একটি পৃথক পীঠ, কোলহাপুরে দেবীর ত্রিনেত্র পঢ়ে নি। তাঁরা বলেছেন, বর্তমান পাকিস্তানের সিঙ্কু প্রদেশের সুকুর বা শকরই প্রাচীনকালের শর্করার বা করবীরপুর। এখানকার কাবেরী মৌজার করবীরে শক্তিপীঠ রয়েছে এবং সেখানে দশভূজা দুর্গার মূর্তি আছে। দুঃখের বিষয়, এখানকার ভৈরবের বিষয়ে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না।

পাকিস্তানের করাচী থেকে ট্রেনে সুকুরে যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে রিস্কা, গাড়ি বা বাসে করেও মহাপীঠে যাওয়া যেতে পারে।



খুলনায় নারায়ণী

পীঠ নির্ণয়তন্ত্র অনুযায়ী শুচিদেশের স্থান হল এয়েত্রিংশৎ। তত্ত্বে বলা হয়েছে, সাহারাখ্যে উধর্বদন্তো দেবী নারায়ণী শুচৌ। সেখানে দেবীর উপরের পাটির দাঁত পড়েছে। ভারতচন্দ্র বলেছেন,

উধর্ব দন্তগীতির অনলে হইল স্থান
সংকুর তৈরব, দেবী নারায়ণী নাম।।

এখানে দেবীকে সম্মোধন করা হয় নারায়ণী নামে। কবি ভারতচন্দ্রের মতে, তৈরবের নাম সংকুর। তবে স্থানীয় অনেকে তৈরবকে ডাকেন, সংহার নামে। পীঠস্থানের নাম অনল। কিন্তু এই নামের কোনও অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এই জায়গাকে শুচিদেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সমস্যা হচ্ছে, ভাগবত বা কুঞ্জিকা তত্ত্বে শুচিদেশ বা অনলের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে তন্ত্রচূড়ামণিতত্ত্বে শুচিপীঠকে তেত্রিশতম পীঠ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, আহমেদাতাদের নল হৃদকে অনল নামে চিহ্নিত করেছেন। অমিয়কুমার মজুমদার তাঁর সতীপীঠ পরিক্রমা বহিতে উল্লেখ করেছেন, পঞ্জিকাকারদের অনুসারে এই জায়গাটির অবস্থান বর্তমান বাংলাদেশে। তাঁর মতে, শুচিদেশের বাঁ দিকে আছে যমুনা নদী। তাঁর দিকে মেঘনা। সেই সূত্র অনুসারে, শুচিদেশের অবস্থান হল, বাংলাদেশের ধুলনা জেলার ইশ্বরীপুরের কাছে। তবে এ নিয়ে দ্বিমতের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, এর কোনও প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না।



ଲାଭପୁରେ ଫୁଲ୍ଲରା ତୀରେ

ତନ୍ଦ୍ରଚାମଣିତେ ଏକାଗ୍ରଟି ପୀଠେର ମଧ୍ୟେ ବୀରଭୂମେର ଲାଭପୁରକେ ଉନ୍ପଥାଶତମ ଉପପୀଠ ହିସାବେ ବର୍ଣନା କରା ହେଁଛେ । ଶିବଚରିତେ ଅବଶ୍ୟ ଫୁଲ୍ଲରାକେ ଉପପୀଠ ହିସାବେ ଚିହ୍ନିତ କରା ହେଁଛେ । କିନ୍ତୁ ଶିବସଂହିତା ଅନୁମାରେ ଲାଭପୁରେର ଫୁଲ୍ଲରାତୀରେ ମହାପୀଠେର ସବ ଲକ୍ଷଣହିଁ ବର୍ତମାନ ।

ବଳା ହେଁଛେ,

ଅଟ୍ରହାସେ ଚୋଟପାତା ଦେବୀ ମା ଫୁଲ୍ଲରା ସ୍ମୃତା

ବିଶେଷେ ଭୈରବସ୍ତ୍ରର ସର୍ବାଭିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାୟକ ।

ଦେବୀର ଓଷ୍ଠ ବା ଓଷ୍ଠାଂଶ ପଡ଼େଛେ ଏଥାନେ । ଦେବୀର ନାମ ଫୁଲ୍ଲରା ଏବଂ ଭୈରବ ହଲେନ ବିଶେଷ । ପୀଠସ୍ଥାନ ହିସାବେ ଅଟ୍ରହାସେର ଉପରେଥ ଆଛେ । କାରାଓ କାରାଓ ମତେ, ବର୍ଧମାନେର କାହେ କେତୁଗ୍ରାମେ ରଯେଛେ ଅଟ୍ରହାସ । ତବେ ଯେ ସବ ଲକ୍ଷଣ ଥାକଲେ କୋନାଓ ଜ୍ଞାନଗାକେ ମହାପୀଠ ବଲା ହୟ, ସେଇ ସବକିଛୁବହି ଲକ୍ଷଣ ରଯେଛେ ବୀରଭୂମ ଜେଲାର ଲାଭପୁରେ ଫୁଲ୍ଲରା ମାଯେର ଥାନେ । ମନ୍ଦିରେର ସାମନେ ଆଛେ ଏକଟି ବଡ଼ ଜଳଶୟ । ତାକେ ଚିହ୍ନିତ କରା ହୟ, ରାମାଯଣେ ଦେବୀଦିହେର ସଙ୍ଗେ, ଯେଥାନ ଥେକେ ଅକାଲବୋଧନେର ସମୟ ନୀଳପଦ୍ମ ସଂଘର୍ଷ କରା ହେଁଛିଲ । କାହେଇ ରଯେଛେ ମହାଶ୍ରଦ୍ଧାନାମ । ମନ୍ଦିରେର ଦକ୍ଷିଣ ଦିକେ ରଯେଛେ ବିଶେଷର ଭୈରବ ।

କୃଷଣନନ୍ଦ ଗିରି ମତାନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଦୟାଲ ଗିରି ଏକଦି ଦେଖିବାମାଧ୍ୟନାୟ ମଧ୍ୟ ଥାକତେନ କାଶୀର ମନିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟେ । ମେଥାନେ ତିନି ମାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଦିନ ସ୍ଵପ୍ନାଦେଶେ ପେଯେଛିଲେନ ଲାଭପୁରେ ଗିଯେ ଫୁଲ୍ଲରା ମାକେ ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ପୁଜୋ କରାର ଜନ୍ୟ । ତଥାନ ଯାତ୍ରାତରେ ରାତ୍ରା ଛିଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ । କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛାଯ ତିନି ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନଗାୟ ଏସେ ପୌଛାନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀର ଦିନ ମାଯେର ଦର୍ଶନ ପାନ । ଆଜଓ ଫୁଲ୍ଲରା ମାଯେର ମନ୍ଦିରେ ମହାଷ୍ଟମୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣେ ଛାଗବଲି ହୟ । ହୃଦୀଯ ଅଧିବାସୀ ଓ ପୁରୋହିତଦେର ମାଧ୍ୟମେ ଜ୍ଞାନ ପେଛେ ମାଯେର ମନ୍ଦିରେ ସାମନେର ପୁକୁରେ ମହାଷ୍ଟମୀର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣେ ଏକଟା ଆଓୟାଜେର ସୂତ୍ର ଧରେ ଛାଗବଲି ଦେଓଯା ହତୋ । ଏଥନ ଆର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୋନା ଯାଇନା । ତବେ କାରାଓ କାରା ବିଶ୍ଵାସ, ଆଜଓ ଦୁର୍ଗାପୁଜୋର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣେ ସେଇ ଆଓୟାଜ ହୟ ।

ଫୁଲ୍ଲରା ମାକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ଶୋନା ଯାଇ ଅନେକ ଅଲୋକିକ କାହିନୀ । ଯେଦିନ ଏକଲକ୍ଷ ଛାଗ ବଲି ସମ୍ପନ୍ନ ହୟ ସେଦିନ କବକକେ ସଥନ ମାଯେର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାନୋ ହିଁଛିଲ ତଥନ ମେ ମେ ‘ମା’ ‘ମା’ ବଲେ ଡେକେ ଓଠେ । ଘଟନାଟି ଘଟେ ପ୍ରାୟ ଚାର ପୁରୁଷ ଆଗେ । ସେଇ ବଲିର ଖାଡ଼ା ଆଜଓ ସଯତ୍ତେ ରାଖା ଆଛେ ପୁରୋହିତଦେର ବାଢ଼ିତେ ।

ଦେବୀ ଏଥାନେ ପୂଜିତା ହନ ସାକ୍ଷାତ ଜୟଦୁର୍ଗାରୂପେ, ଚର୍ତ୍ତୁଭୂଜା ସିଂହବାହିନୀର କଳନାୟ । କଥିତ ଆଛେ, ଦେବୀତେ ବଟେଇ, ଯେ କୋନାଓ ମନୋବାଙ୍ଗ୍ଳା ପୂରଣ କରେନ ‘ବିଶେଷ’ ଶିବ । ମାୟିପୂର୍ଣ୍ଣମାର ଦିନ ଏଥାନେ କୃଷଣନନ୍ଦ ଗିରିର ମାଯେର ଦର୍ଶନେର ମ୍ରାଗେ ବାରୋଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଉଂସବ ହୟ ।

ବେଶ କିଛୁଦିନ ଆଗେଓ ଏଥାନେ ଶିବାଭୋଗେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛିଲ । ତଥନ ଏଥାନକାର ଜଙ୍ଗଲେ

রূপী, সুপী নামে দুটি শিয়াল বাস করত। এছাড়াও থাকত অন্যান্য জীবজন্তু যাদের ভোগনিবেদনের পরে মাকে ভোগ দেওয়া হত।

মন্দির চতুরের মধ্যেই রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। এর প্রতিষ্ঠা করেন সাধক নারায়ণ গিরি। কেউ কেউ এখানে তপ্তি-সাধনার প্রক্রিয়া না জেনে বসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের সেই মনোবাঙ্গ পূরণ হয়নি।

শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব - সব ভাবনা এখানে এক হয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় গড়ে উঠেছে। বৈষ্ণব তত্ত্বের সাধক রঘুবর গোস্বামী এখানে দীর্ঘদিন মায়ের সাধনা করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি তাঁর মৃত্যুর দিন ও সময় ঘোষণা করেছিলেন। পূর্বনির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে মায়ের নাম জপ করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন। মন্দির প্রাঙ্গণের এক কোণায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

মন্দিরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা রয়েছে মোহন্তদের অধিকারে। আজও তাদের দায়িত্বে রয়েছে দেবীর যাবতীয় পূজার্চনা। এখান যারা এই দায়িত্ব পালন করছেন প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী তারা উন্নতিশ পুরুষ। পথিকৃতের নাম কালিকানন্দ প্রভুচারী।

এই মোহন্তদের আনা হয়েছিল বিহারের দ্বারভঙ্গ থেকে। জন্মসূত্রে তাঁরা মৈথিলি সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। পদবী ‘মিশ্র’। কিন্তু প্রয়োরতীসময়ে তাদের ‘উকিল’ পদবী দেওয়া হয়। নবাবের কাছে থেকে পাওয়া এই পদবীর গৃহ অর্থ আছে। পুরোহিতদের কাজ হল, ভক্তদের প্রার্থনা মায়ের আদালতে যথ্যথভাবে পৌছে দেবার জন্য ওকালতি করা। সেই সুবাদেই এই পদবীর সৃষ্টি হয়েছে। শোনা যায়, স্থানীয় নবাব নিঃসন্তান ছিলেন। দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে মৈথিলি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পুরোহিতদের এখানে নিয়ে এসে পুজোর ব্যবস্থা করতে বলেন। দেবীর ইচ্ছাপূরণ করার পর নবাব সন্তানলাভ করেন।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে এক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। শ্রীরামজী গেঁসাই নামে জনৈক মহাসাধক এখানে সাধনায় মগ্ন থাকতেন। সন্তান হচ্ছে না দেখে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা তাঁর শরণাপন্ন হন। ভক্তের আর্জি শুনে তিনি কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন। তারপর বলেন, দুর্গাপুজোর পরের চতুর্দশীর দিন তারামায়ের কাছে পুজো দিয়ে দেবী ফুল্লরার কাছে প্রার্থনা করলে সন্তান লাভ করা সম্ভব হবে। তিনি সেই মহাসাধকের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং সন্তানের নাম রাখেন তারাশঙ্কর।

মন্দিরের দায়িত্বে থাকা মোহন্তদের পূর্বপুরুষ জনৈক মহাপুরুষ দেবী ফুল্লরাকে মা কালীরূপে দর্শন করেছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পরে স্থানীয় অঞ্চলে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা পাইফলা কালীমন্দির নামে সুপরিচিত। এখান থেকেই ওই মন্দিরে মা কালীর ভোগ যায়।

প্রতিদিন এখানে অন্নভোগ হয়। ভাত, ডাল, তরকারী, মাছের টক অবশ্যই থাকে সেই অন্নভোগে। একসময় মায়ের বিপুল দেবোত্তর সম্পত্তির মাধ্যমে বছরের বাহার সপ্তাহে

বাহার মন চাল আসত। কিন্তু কালের নিয়মে তার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন সরকার থেকে মন্দিরের জন্য দেওয়া হয় মাত্র ১৬০ টাকা।

দেবীমা'র মন্দিরের সামনে রাখা হাঁড়িকাঠের মাটি চর্মরোগের অব্যর্থ ওষুধ — এধরনের ধারণা প্রচলিত আছে। পুরোহিত প্রণবকুমার উকিল জাগলেন, তাঁর হাতে একটি ছোট 'চিউমা'র হয়েছিল। কয়েকদিন ভক্তিভরে ওই মাটি লাগানোর পরে আজ আর তার কোনও চিহ্ন নেই। অনেকের বিশ্বাস, শ্঵েতীর উপসমে এই মাটি খুবই কার্যকরী। হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে সবধর্মের মানুষই ফুলরা মায়ের কাছে এসে তাদের আর্জি জানান এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। ১৩০২ বঙ্গাব্দে স্থানীয় জমিদার যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির প্রাঙ্গণের থাকার ঘর আছে। ভাড়া ২০ টাকা। তবে বিছানাপত্র সঙ্গে আনতে হয়।

বোলপুর ও সাঁইথিয়া রেল স্টেশন থেকে লাভপুরে যাওয়া যায়। এছাড়া আহমেদপুর স্টেশন থেকে ছোট লাইনে আহমেদপুর—কাটোয়া রেলপথেও লাভপুরে যাওয়া যায়।



চৈতন্যপীঠ কঙ্কালীতলা

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। কি জানি কেন বাড়ি থেকে কাউকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিলাম বোলপুরে। তার কিছুদিন আগে কঙ্কালীতলার নাম শুনেছিলাম আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষকের কাছে। শাস্তিনিকেতনের কয়েকটি বিশিষ্টজায়গা দেখে ঠিক করলাম, কঙ্কালীতলায় যাব। তখন আজকের মতো কঙ্কালীতলায় বাসের যাতায়াত ছিল না। সারাদিনে দুটি কি তিনটি। তাই ঠিক করলাম, সরাসরি রিঙ্গায় করে গ্রামের পথঘাট দেখতে দেখতে চলে যাব কঙ্কালীতলায়। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। দু'একটি ছেট ছেট চালাঘর। মন্দির চতুরে রয়েছে রূদ্র ভৈরবের মন্দির। শুনলাম, সন্ধ্যার আগেই সবাই ফিরে যান যে যার বাড়িতে। এখানে রাত্রিবাস কেউ করেন না। পাশেই রয়েছে মহাশুশান। এখানে একইসঙ্গে শবদাহ ও সমাধি দেওয়া হয়। জনৈক স্থানীয় অধিবাসীর কাছে শুনেছিলাম, বৈষ্ণবেরা এখানে শবদেহ দাহ না করে সমাধি দিয়ে দেন। কেন জানি না, প্রথমবার সেখানে গিয়েই মনে হয়েছিল এটা আমার খুব চেনা জায়গা। এর আগে হয়ত কোনওদিন এখানে আমি এসেছি।

এর কিছুদিন পরে ভবগুরে মন্টা আবার নড়ে চড়ে বসল। বেরিয়ে পড়লাম আমার এক অগ্রজ সহকর্মীর সঙ্গে। কোথায় যাব কোনও ঠিক নেই। চলে গেলাম দুমকায়। হাতমুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে রিঙ্গাওয়ালাকে জিজেস করলাম, কাছাকাছি কোথায় যাওয়ার মতো কোনও জায়গা আছে কি না? শুনলাম, সেখান থেকে রিঙ্গায় করে বেশ কিছুটা দূরে গেলে সন্ধান পাওয়া যাবে এক আশ্রমে, যেখানে নাকি থাকেন জনেকা গৃহী অথচ সন্ধ্যাসিনী ও তাঁর দু'একজন অম্বগামী ম্যাসানজোড় পাহাড়ের কোলেই সেই আশ্রমে রিঙ্গা করে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল এক ঘণ্টা।

সেখানেই আমার দেখা ও পরিচয় হয় সতী মা'র সঙ্গে। অপূর্ব সুন্দরী বললেও কম বলা হবে। সন্ধ্যাসিনী অথচ টাঙ্গাইল শাড়ি পরেছেন আর পাঁচজন বাঙালি মায়েদের মতো। তখনও তেমন কোনও ধারণা ছিল না কঙ্কালীতলার সম্বন্ধে। সেদিনটা রাত্রিবাস করার সুযোগ হয়েছিল মায়ের আশ্রমে। পরে জেনেছি, ব্যবহারিক জীবনে মায়ের নাম ছিল সতীদেবী। তাঁর স্বামী মহেশ্বর বর্মণ একসময় সিউড়ির সেচ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। মহেশ্বরবাবু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলেও সতীমা জগদীশবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

রাতের খাবার গ্রহণ করার পর সতীমার কাছে শুনেছিলাম, কঙ্কালীতলা আশ্রমের এক বিশ্ময়কর ঘটনা। কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলাম, ভূত শব্দটা বইতে লেখা থাকে। বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই নেই।

আমার কথা শোনামাত্র পালটে গেল মায়ের মুখ। বললেন, না, ভূত আছে। কানে
শোনা নয়, নিজের চোখে তার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছি। তখন আমি কঙ্কালীতলায় জগদীশ
বাবার আশ্রমে কঠোর সাধনায় মগ্ন। রাত কতো হবে জানি না। হয়ত বারোটা কি একটা।
বাবা বললেন, যাও নদী (কোপাই নদী) থেকে জল নিয়ে এসো। যাঁরা কঙ্কালীতলা আশ্রমে
গিয়েছেন, তাঁরা জানেন যেখানে বাবার আশ্রম স্থান থেকে কোপাই নদী কিছুটা দূরে।
আর নদী থেকে জল আনতে হলে অনেকটা নিচে নামতে হয়। যাইহোক, বাবার আদেশ
পাওয়ামাত্র কলসি নিয়ে যাত্রা করলাম নদীর দিকে। গুরুর আদেশ অতএব কোনওকিছু
ভাবার প্রয়োজন নেই। অন্ধকার হলেও ওই পথ আমার চেনা। নদী থেকে জল তুলে
নিয়ে আসছি আশ্রমের দিকে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমার হাতের পাশে রোমশ দুটো
মোটা হাত একই গতিতে চলেছে। ভাবলাম কোনও খারাপ লোক আমার পিছু নিয়েছে।
কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। তখন বুবাতে পারলাম, কোনও অশরীরী আমার পিছু
নিয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, যা হবার তাই হবে। জীবন যদি চলেও যায় তাতেও আমার
কোনও আক্ষেপ থাকবে না। কারণ, গুরুর কাছে সাধনায় সিদ্ধ হবার জন্যই তো জীবনপণ
করেছি। অতএব, যদি এই দেহ থেকে প্রাণ চলে যায়, যাক। আশ্রমের প্রায় কাছে চলে
এসেছি। দেখলাম, গুরুদেব তাঁর কুটীরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ তিনি উচ্চেষ্টবে
চীৎকার করে কিছু বললেন। মুহূর্তের মধ্যে আমার হাতের পাশ থেকে সেই দু'টি রোমশ
হাত উধাও হয়ে গেল। কঙ্কালীতলায় এধরনের অভিজ্ঞতা আমি ছাড়াও অন্য অনেকের
হয়েছে বলেও পরবর্তী সময়ে শুনেছি।

তত্ত্ব চৃড়ামণিতে উন্নেব আছে,

কাঞ্চীদেশে চক্রকঙ্কালো ভৈরব রূপ - নামকঃ।

দেবতা দেবগর্ভাখ্যা।

এই তথ্যের সুবাদে জানা যায়, সতীর দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে তার কঙ্কাল পড়েছে
কাঞ্চীদেশে। ভৈরবের নাম রূপ, দেবীর নাম রত্নাগভী। শিবচরিত মতে এখানে দেবীর
নাম দেবগর্ভ। দেবস্থানের পাশেই বয়ে চলেছে কোপাই নদী। মন্দিরের ডানপাশে রয়েছে
কুণ্ড। সেই কুণ্ডের জলে নিমজ্জিত রয়েছে দেবীর কাঁকাল। শোনা যায়, রাজা রাজেন্দ্র
চোল রণশূরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে কোপাই নদীর তীরে সাময়িকভাবে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।
রাজা রাজেন্দ্র ছিলেন শিবভক্ত। তিনি সেখানে শিবস্থাপনা করেন। সেই থেকেই নাকি
ওই মহাদেবকে ‘কাঞ্চীশ্বর শিব’ বলা হয়। কাছেই রয়েছে পঞ্চবটী, মহাশ্মশান। যে কুণ্ডে
দেবী নিমজ্জিতা রয়েছেন, দু'টি উৎস বা প্রস্তরণ থেকে অবিরত জলশ্বেত এসে সেখানে
মিশছে। জলে কোনও দিন পোকা হয় না। এই জল খাবার পর শরীরের অনেক ব্যাধি
সেরে যায়। এই জলপান করার পর অনেক মহিলা নাকি সন্তানসন্তান হয়েছেন বলে শোনা

গেছে।

কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
বেদগর্ভা দেবতা তৈরব রঞ্জন নাম॥

একসময় কুণ্ডের চারদিকে খোলা বেদীতে দেবীর পুজো হত। অনেকে বলেন, ওই বেদীর তলায় ১০৮টি নরমুণ্ড পৌতা আছে। সেখানে একটি মন্দির তৈরি করা হয় ১৩৬৯ বঙ্গবন্দে মহা সাধক জগদীশবাবার নির্দেশে, তাঁর ভক্তশিষ্যদের দানে। ওই বছর ২৪ জৈষ্ঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিন পৌরহিত্য করেন, আদিত্যপুর নিবাসী নলিনাক্ষ আচার্য।

এই মন্দির সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় গেজেটিয়ারে। সেখানে উল্লিখিত আছে,

Jaljol - A Village in Bolpur thana of the Suri subdivision containing the temple of Kankali. The latter is claimed as one of the 52 pithas of sacred places where a part of the dismembered body of Sati felt in this case, the waist (Kankal) hence the name.

বিজ্ঞনের মতে, সতীর দেহের কক্ষাল (কাঁকাল) যা কক্ষালতলায় কুণ্ডে নিমজ্জিত আছে বলে কথিত আছে, সেটি হল জীবের মুলাধাৰ অর্থাৎ কূলকুণ্ডলিনী। একান্ন পীঠের শেষ পীঠ। বলা হয়, মহাদেব অচৈতন্য অবস্থায় সতীর দেহের অন্যান্য অংশ ও কাঁকাল বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেন। এরপর চেতন্য হয় তাঁর। সেজন্য এই জায়গাকে বলা হয় চেতন্যপীঠ। একসময় তিনি বুঝতে পারেন কী কাজ করেছেন!

বর্তমানে যাঁরা এই মন্দিরের পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন তাঁদের অনুমান প্রায় চারশ বছর ধরে বংশপরম্পরায় তারাই এখানকার মন্দিরের পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন। যোগনাথ নামে জনৈক সাধুর নাম শোনা যায় যিনি অতীতে (গত চারশ বছর আগে) এই পীঠের অস্তিত্বের বিষয়ে উপলক্ষ করেন। তারপরে রামঠাকুর নামে আর এক সাধক বিষয়টি আরও ব্যাপক আকারে মানুষের সামনে নিয়ে আসেন। তার আগেও এখানে পুজো হয়েছে বলে শোনা যায়। রামঠাকুরকে দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন, আমি এখানে কাঁকালরূপে পড়ে আছি। তুমি পুজোর ব্যবস্থা করো। তিনি শুনতে পান একটি শব্দ ‘কং’। ‘কং’ শব্দ হলো মহাকালীর বীজ মন্ত্র। সেই সূত্রেই তাঁর বংশের একজনের পরে আরেকজন এই পীঠে পুজো করে চলেছেন।

ডঃ হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন তাঁর ‘বাঙালীর কথা’ বইতে উল্লেখ করেছেন, দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল রাজা মহীপালের রাঢ় বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। তিনি শৈব ছিলেন এবং যেখানে শিবির সন্নিবেশ করেছিলেন সেখানেই শিবপূজা করেছিলেন। বীরভূমের

কক্ষালীতলা কাঞ্চীপীঠ কক্ষালীতে রাজেন্দ্র চোলের এরূপ একটি সেনা নিবাসভূমি (জয়স্থন্দাবার) ছিল। মনে হয়, তিরমলয় লিপির প্রমাণ অনুসারে অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বঙ্গে বন্যার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় রাজেন্দ্রচোল নদীতীরের সেনানিবাস তুলে রাঢ় ত্যাগ করে ছিলেন; পিছনে রেখে গিয়েছিল স্বনামাঙ্কিত শিষ্য কাঞ্চীশ্বরকে।

১৯৬১ সালে প্রকাশিত ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস হ্যান্ডবুক (বীরভূম) বইতে লেখা হয়েছে, বোলপুর থানার অন্তর্গত আশুডহরা, জলজোল, ডানবারিপুর ও বেঙ্গুটিয়া প্রভৃতি গ্রামে সতীত কক্ষাল পতিত হইয়া পীঠস্থানে পরিণত হইবার কাহিনীর উল্লেখ আছে।

সমস্যা হচ্ছে, বীরভূম কোনদিনই ‘কাঞ্চীদেশ’ হিসাবে পরিচিত ছিল না। তামিলনাড়ু’র কাঞ্চীপুরম তথা কাঞ্চী ভরমাংকেই ‘কাঞ্চী’ নামে চিহ্নিত করা হয়। এটিও একান্নপীঠের অন্যতম প্রাচীন পীঠ বলে কথিত। এখানে দেবীর নাম কনককাঞ্চী।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলার ইতিহাস’ গ্রন্থে লেখা আছে, বঙ্গেশ্বর প্রথম মহীপালের রাজত্বের সময় রাজা ছিলেন রাজেন্দ্রচোল। সময়কাল ৯৮৮ থেকে ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গা থেকে জল এনে রাজধানী পবিত্র করার উদ্দেশ্যে উত্তরপূর্ব ভারতে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। এই ওড়ড বিষয় (ওড়িশা) ও কোম টলনাড়ু জয়ের পর তাঁর সেনাবাহিনী দণ্ডভুক্তিরাজ (দাঁতন) ধর্মপালকে পরাজিত করে। পরে রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে বিতাড়িত করে বিরামহীন বৃষ্টিন্দুত বঙ্গালক্ষ্মী (পূর্ববঙ্গ) অধিকার করেন। অতঃপর কর্ণভূবগ, চর্ম পাদুকা এবং বলয় বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হতে বিতাড়িত হতে বাধ্য করেন ও তাঁর অস্তুত বলশালী কঁবিসমূহ এবং রঞ্জোপমা রাণীগণকে হস্তগত করেছিলেন।

জানা গেছে, দশম - একান্নশতকে বীরভূমের এই জায়গাটি কাঞ্চিরাজ রাজেন্দ্র চোলের অধীনে ছিল এবং সেই স্মৃতেই জায়গাটির নাম হয়েছে, কাঞ্চীদেশ।

বিশ্বয়ের কথা গরমের সময় বীরভূমের সর্বত্র জলাশয় শুকিয়ে গেলেও কক্ষালীতলায় কুণ্ডের জল কখনও শুকোয় না। কক্ষালীতলায় যে কুণ্ডে মায়ের কক্ষাল পড়ে আছে সেখানে যদি কেউ নামেন তাহলে কোনও না কোনও ভাবে তার ক্ষতি হয়। বারবার এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কক্ষালীতলার ভৈরবের নাম কুণ্ড ভৈরব। ‘কুণ্ড’ শব্দের অর্থ আলো। অর্থাৎ আলোয় আলোয় এই অঞ্চলটি আলোকিত হয়ে প্রতিনিয়ত সুন্দরের উপাসনা চলছে। এই আলো হল, চৈতন্য অনুভূতি এবং ভাবনার।

বুদ্ধদেব আচার্য তাঁর ‘বেদগর্ভা কক্ষালী’ বই- তে লিখেছেন, বর্তমানে যাঁরা কক্ষালীতলায় দেবীর পুজো করছেন তারা বেঙ্গুটিয়া গ্রামের রাঢ়ী কাশ্যাপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। পদবী চৌধুরী। এই বংশের যোগীন্দ্রলাল চৌধুরী ও তাঁর ছেটভাই রামদাস চৌধুরী একসময় মায়ের পুজো করতেন। তারপরে পুজোর দায়িত্বে ছিলেন নীরোদ গোপাল চৌধুরী ও নিত্যগোপাল চৌধুরী। তিনি আরও লিখেছেন, শোনা যায়, পাশের সর্বানন্দপুর গ্রামের হীরালাল

অধিকারীর বাবা একসময় এই পীঠস্থানের পূজারী ছিলেন।

বর্তমান পুরোহিত জানিয়েছেন, এখনও রাত্রিবেলা এখানে একা কেউ থাকতে পারেন না। নানান কারণ এই ঘটনা ঘটে থাকে।

তালজোরের জমিদারদের সম্পত্তির আয়ে দেবীর অঞ্চলভোগ দেবার ব্যবস্থা আছে। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিশেষ পুজো হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংক্রান্তির দিন ভক্তেরা কুণ্ডের পাক পরিষ্কার করেন। কুণ্ডের জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকেন পঞ্চশিব। সেদিন জল থেকে তাদের তোলা হয়। তাঁদের এনে রাখা হয় কাঞ্চীশ্বর শিবের মন্দিরে। উৎসবের শেষে ১লা বৈশাখ তাদের আবার কুণ্ডের জলে রেখে দেওয়া হয়। তখন এখানে তিনিদিন ধরে উৎসব চলে।

কারও কারও ধারণা, কুণ্ডের পশ্চিমদিকে যে দুটি সুড়ঙ্গ আছে তার সঙ্গে যোগ রয়েছে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের। চৈত্র সংক্রান্তির দিন স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা কুণ্ডের চারপাশে বসে পুজো করেন। অতীতে চেকাবাড়ির জমিদারদের দেওয়া ছাগল প্রথম উৎসর্গ করা হতো। এখন আর তা হয় না। বর্তমানে পুরোহিতদের উৎসর্গ করা ছাগল প্রথম বলি দেওয়া হয়।

কঙ্কালীতলায় সিদ্ধ হয়েছেন এমন কয়েকজন মানুষের সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

এঁদের একজন সাধক জগদীশবাবা বীরভূমের তাড়াপুরের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। ছোটবেলা থেকেই সাধকের সব লক্ষণ তাঁর মধ্যে পুরোপুরিভাবে লক্ষ্য করা যায়। এক একদিন তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে সাধক বামাঙ্গ্যপার কাছে চলে যেতেন। জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। শোনা যায়, যখন তাঁর দেড় বছর বয়স, বাড়ির পাশে ‘তেঁতুল ডোবার’ জলে ডুবে মৃত্যুয়ে ইয়েছিলেন। পনেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়-জামালপুর গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে কালীদাসী দেবীর সঙ্গে। তখন তাঁর স্তৰীর বয়স ছিল সাত বছর। জগদীশ বাবা ও তাঁর স্ত্রী দীক্ষা নেন রাঙামার কাছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে তিনি কঙ্কালীপীঠে আসেন। সেখানে একটি ছেট্ট পর্ণকুটীরে সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তাঁর কলকাতার ভক্ত শিষ্যেরা তাঁকে যাদবপুরে নিয়ে আসেন ও দক্ষিণ শহরতলীর নরেন্দ্রপুরের কাছে ‘কুমড়োখালি’-তে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় কুড়িবছর তিনি কঙ্কালীতলায় কাটিয়েছেন। ৮১ বছর বয়সে ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ১৭মাঘ তিনি শরীরের মায়া কাটিয়ে অনন্তলোকে যাত্রা করেন।

কঙ্কালীতলায় সিদ্ধ পুরুষ ভৈরবগিরি ছিলেন বীরভূম জেলার কীর্ণাহার অন্তর্গত আঁকুপুরের বাগদী পরিবারের ছেলে। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় কঙ্কালীতলার মহাশ্মশানে।

এখানে সিদ্ধ হয়েছিলেন ভৈরবী মা, সাংসারিক জগতে যাঁর নাম ছিল নীলা। তাঁর পরিবারের সঞ্চিত সবকিছু দান করা হয়েছে কঙ্কালীতলায় সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি মহাসাধনায় মগ্ন হন। জীবনধারণের জন্য তিনি মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করে দিনযাপন

করতেন। কঙ্কালীতলায় বৈরবনাথ মন্দিরের উত্তর দিকে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

এছাড়াও সাতুক্ষেপা, সারদা গোস্বামী, ভূপেন্দ্রনাথ মিশ্র, বিবেক বাবা, গুরুরেবাবা, সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সতীমা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বোলপুর থেকে চার মাইল দূরে এই মহাপীঠ, বাস, প্রাইভেট কার বা সাইকেল রিক্সায় যাওয়া যায়। রাতে সেখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা ‘বেদেনী’, ‘কবি’ গল্পে কঙ্কালীতলায় মেলার উল্লেখ করেছেন। শিল্পী নন্দলাল বসু এই মেলার একটি ছবি এঁকেছিলেন। মেলার ছবি এঁকেছেন শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজও।

কঙ্কালীতলা আদৌ সতীপীঠ কিনা এনিয়ে দ্বিমত থাকলেও কালিকাপুরাণ, মন্ত্রচূড়ামনিতত্ত্ব, অনন্দামঙ্গল, প্রাণতোষনীতত্ত্ব, পীঠ নির্ণয়, শিবচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে এই তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। পীঠ নির্ণয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

যোজনভ্যন্তরে লিঙ্গম উত্তরবাহিনী নদী
সমীপস্থ শাশানাঞ্চ মহাবীঠং ব্রবীমি তে ॥

যদিও অধ্যাপক উপেন্দ্র কুমার দাস বলেছেন, দেবীদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে আস্ত
কঙ্কাল থাকতে পারে না। যাঁরা কঙ্কালের কথা বলেছেন, মনে হয় এদিকে তাঁদের নজর
পড়েনি। ঐতিহাসিক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, পূর্বের কোন প্রাচীন গ্রন্থে এমনকি
পীঠ নির্ণয়ের অন্যান্য পুঁথিতেও নলহাটী, কঙ্কালীঘাট, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর, কঙ্কালীর নাম নেই।
পঙ্গিত হরেক্যু মুখোপাধ্যায়ের মতে, বারভূমে একটিই মহাপীঠ আছে বক্রেশ্বর। বাকী
সব উপপীঠ বা সিদ্ধপীঠ।



সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী

পৃষ্ঠামি বীরভূম। সমন্বয়ের মহাক্ষেত্র। জেলায় রয়েছে পাঁচটি সতীপীঠ। তার অন্যতম হল সাঁইথিয়ায় মা নন্দিকেশ্বরী। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সাঁইথিয়া দীঘদিন ধরে সুপরিচিত। এখানকার আগেকার নাম ছিল নন্দিপুর। এখনও এই মহকুমা শহরের একাংশ নন্দিপুর হিসাবে পরিচিত।

একদা এই জায়গাটি ছিল জঙ্গলে ভর্তি। পরিচিত ছিল ‘নিশানদারীর বন’ নামে। মহাশ্শান। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মযুরাঙ্কী নদী। জনশ্রুতি, ‘সাইত’ শব্দ থেকে প্রথমে এখানকার নাম হয় ‘সাইতা’। পরে তাই লোকমুখে সাঁইথিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, কোনও সাঁই-এর সুবাদে ওই জায়গার নাম সাঁইথিয়া হতে পারে। এই বিষয়ে আর একটি কাহিনীও শোনা যায়।

একদা নবাব ইখ্তিয়ার-উদ্দীন-বখতিয়ার খিলজির অধীনে বাংলায় শাসনভার থাকলেও রাজনগর তার সাম্রাজ্যের অধীন ছিল না। সেখানে তখন বীররাজা নামে জনৈক শক্তিমান রাজা রাজত্ব করতেন। ইখ্তিয়ারউদ্দীনের দুই অনুচর জোনেদ আলি ও আসাদ আলি - মন্ত্রবীরের ছন্দবেশে বীররাজার অধীনে চাকরী নেয়। তারা প্রায়শই মন্ত্রযুদ্ধে মেতে থাকতেন রাজার সঙ্গে। বলাবাহ্ল্য, তারা সেই সময় রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করত।

হঠাৎ-ই একদিন তারা গুরুতরভাবে আক্রমণ করে বীররাজাকে। বেঁধে যায় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। একসময় বীররাজা কুয়োতে পড়ে মাঝে মাঝে রাজা। একই সঙ্গে একই জায়গায় পড়ে গিয়ে মারা যায় আসাদ-ও। তারপর ওই জায়গাটি চলে যায় মুসলমান রাজার দখলে। ইখ্তিয়ার উদ্দীন, বীরভূমের শাসনভার তুলে দেন জোনেদ আলি-র হাতে।

বর্তমানে মা নন্দিকেশ্বরী ভাস্তিরের প্রধান পুরোহিত ইন্দুভূষণ চক্ৰবৰ্তী জানিয়েছেন, এখন যেখানে মায়ের মন্দির সেখানে সুদূর অতীতে কোনও জনবসতি ছিল না। তখন এখানে মূলত বসবাস করত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষজন।

মা নন্দিকেশ্বরী সম্পর্কে পীঠতন্ত্রে বলা হয়েছে,

হায় পাতো নন্দিপুরের ভৈরব নন্দিকেশ্বরঃ।

নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধি ভবাপূয়াত্ঃঃ।।

তন্ত্র অনুসারে জানা যায়, নন্দিপুরে সতীর গলার হাড় পড়েছিল। অপর এক মতে, নন্দিপুরে সতীর কঠহার পড়েছে। ‘একান্ন পীঠের সন্ধানে’ গ্রন্থে নিগৃঢানন্দ, মা নন্দিকেশ্বরীকে উন্পঞ্চশতম পীঠ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও এই পীঠকে পঞ্চশতম

পীঠ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিশাল বটগাছের তলায় তাঁর অবস্থান। শোনা যায়, প্রতিদিন মযুরাঙ্কী নদী পেরিয়ে ‘উমা’ নামে জনৈকা বাল্যবিধবা নন্দিকেশ্বরী মায়ের পুজো করতে আসতেন। সেই উমার নামানুসারেই নদীর অন্য পারের একটি গ্রাম ‘ওমো’ বা ‘অমুয়া’ নামে পরিচিতি পায়।

সাঁইথিয়ার জমিদার পঞ্চানন ঘোষের পূর্বপুরুষ দেওয়ান দাতারাম ঘোষ বসবাস করতেন দক্ষিণেশ্বরে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি ঘটনাচক্রে বীরভূমে আসেন। তখন নীলকুঠি সাহেবের রমরমা ব্যবসা চলছে। এই সময় একদিন নীলকর সাহেবের জাহাজ দক্ষিণেশ্বরের চড়ায় আটকে যাওয়ায় তিনি বিপাকে পড়েন। সামনের মাঠে কয়েকটি ছেট ছেলে তখন খেলছিল। সাহেব তাদের ডেকে, জাহাজ ঠেলে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু লালমুখো সাহেবকে দেখে অন্যান্য ছেলেরা পালিয়ে যায়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিল কিশোর দাতারাম। সুস্থান্ত্রের অধিকারী। সে সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সাহেব তাকে বলেন, জাহাজ ঠেলে দিয়ে সাহায্য করলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। দাতারাম পরিপূর্ণভাবে সেই কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ওই নীলকর সাহেব গুনুটিয়া-রাজনগর কুটির কুঠিয়াল হিসাবে কাজ করতেন। তিনি চাকরির সুযোগ দিয়ে দাতারামকে নিয়ে আসেন বীরভূমে। তাঁকে নিয়োগ করেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে। তাঁর দায়িত্ব ছিল এক কুঠি থেকে আরেক কুঠিবাড়িতে টাকা প্রেচ্ছে দেওয়া। তাঁকে গুনুটিয়া থেকে রাজনগর, রাজনগর থেকে গুনুটিয়া যেতে হত। এই দীর্ঘপথ তাকে হেঁটে যাতায়াত করতে হত। একসময় ভাল কাজের জন্য তিনি সাহেবদের সুনজরে আসেন।

তাঁর যাতায়াতের পথে সাঁইথিয়া পড়া জনশ্রুতি আছে, মথুরাপুরে তখন শিবচন্দ্র বিশাস নামে জনৈক প্রখ্যাত জ্ঞাতিশীল ছিলেন। যাতায়াত করার সময় শিবচন্দ্রের সঙ্গে দাতারামের ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিন শিবচন্দ্র, দাতারামের ভাগ্য গণনা করে বলেছিলেন, তুমি ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছো এহেন ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি দাতারাম অবশ্য তেমন কোনও ভরসা রাখতে পারেননি।

মথুরাপুরের মতো যাতায়াতের পথে দাতারাম মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতেন সাঁইথিয়াতেও। নন্দিকেশ্বরী মায়ের মন্দির তখনও পীঠস্থান হিসাবে পরিচিতি পায়নি। গভীর বনজঙ্গলে ভরা এক বটগাছের নিচে ছিল মায়ের অবস্থান। একদিন সেখানেই গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য কয়েক মুহূর্ত বসলেন দাতারাম। চোখ বুঝে আসে ক্লাস্তিতে।

এমনসময় স্বপ্নে দেখলেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন অপরাপ সুন্দরী এক কিশোরী। পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি। কপালে ও সিঁথিতে জুলজুলে সিঁদুর। কিশোরী দাতারামকে বললেন, আমি মা নন্দিকেশ্বরী। তোর কাছে যে টাকা আছে তা নিয়ে এখনই কাটোয়ায় চলে যা, সেখানে সাঁইথিয়া (সাইতা), কাগাস বেলেসহ আর একটি মহাল নীলাম হবে। আমি আদেশ করছি, তুই ওই মহালভূমি নীলাম ডাকবি। ওই জায়গার ভূস্বামী তুই হবি। আমি অনেকদিন এই বনের মধ্যে রয়েছি। ভূস্বামী হয়ে আমার নিত্যসেবার ব্যবস্থা করবি। পুজো

ছাড়াও আমার প্রচারের দায়িত্বও তুই নিবি। আমি আশীর্বাদ করছি, তুই জয়যুক্ত হবি।

একসময় তন্দ্রা ভেঙে যায় দাতারামের। তখন চোখ মেলে কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চিত স্বয়ং মা তাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন। বারবার কানে ভেসে আসছিল মায়ের কথাগুলি।

বর্তমান পুরোহিত শ্রীচক্রবর্তীকে দেখে মনে হল, দেবীমায়ের কথা বলতে বলতে অন্য কোনও জগতে চলে গেছেন। একটু থেমে তিনি আবার বললেন, টাকা নিয়ে সেখানে দাতারামের যাওয়ার কথা রাজনগরে। কুঠিবাড়ি থেকে পৌছে দিতে হবে। বলাবাহল্য, সাহেবদের টাকা। তা দিয়ে মহালনীলাম ডাকবেন কি করে? ওই টাকায় তো তার কোনও অধিকার নেই। সাতপাঁচ ভেবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না তিনি।

রাতের শেষে তিনি পৌছে যান কাটোয়ায়। বিশ্বিত হয়ে লক্ষ্য করলেন, সেখানে তখন মহাল নীলাম হচ্ছে। কি এক শক্তি ভর করেছিল দাতারামের ওপর। নীলাম ডাকলেন দাতারাম। তবে যেহেতু টাকাটা সাহেবদের তাই ডাক ছিলেন সাহেবদের নামে।

নীলামের শেষে ভয় পেয়ে যান তিনি। ভাবেন সাহেব যদি তার এই দৃঃসাহসকে ক্ষমা না করেন। তাই আর দেরী না করে পালিয়ে আসেন কাটোয়া থেকে দক্ষিণেশ্বরে। এদিকে তার খবর না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন নীলকুঠির সাহেব।

একসময় দক্ষিণেশ্বরে এসে সাহেব খোঁজ পেলেন দাতারামের। সমস্ত কথা তিনি দাতারামের কাছে শোনেন। আশ্চর্যের বিষয়, ত্রিবৰ্কুল না করে সাহেব দাতারামকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি দাতারামের কাঁধেই চাপিয়ে দিয়ে জমিদারীর দেখাশোনার ভার।

বৃন্দ বয়সে দেশে ফিরে যাবার আগে সাহেব সব জমিদারী দান করেন দাতারামকে। ভূক্তির মনে ছিল ভগবানের নিদেশে সেই থেকে শুরু হয় মা নন্দিকেশ্বরী মায়ের নিত্য পূজো।

একসময় এই মন্দির চতুরে সাধনার জন্য এসেছিলেন হরানন্দ বৈরবী। মা নন্দিকেশ্বরীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি মন্দিরের হরিনাম সংকীর্তনের জন্য কালীয় দমনের মন্দির তৈরি করান।

প্রতি বছর পৌষ মাসের ২০ তারিখের পর সাঁইথিয়ার নন্দিকেশ্বরী মন্দিরে পৌষাল্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। একসময় বামাক্ষ্যাপা এখানে এসেছিলেন মায়ের দরবারে। সেসময় ঘটে যায় এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

ক্ষ্যাপাবাবা সাঁইথিয়ায় এসে ভুলেই গেছেন যে, সন্ধ্যায় তারাপীঠে ফিরে গিয়ে মায়ের মন্দিরের আলো জ্বালাতে হবে। এদিকে নন্দিকেশ্বরী মন্দিরের পাশে রেলওয়ে স্টেশনে তখন চলছে ছলুস্তুল কাণু। শত চেষ্টা করেও তারাপীঠ যাওয়ার ট্রেন নড়েছে না। হঠাৎ ক্ষ্যাপাবাবার মনে পড়েছে সন্ধ্যা হওয়ার আগে তারাপীঠে ফিরে যেতে হবে। বামাচরণকে তখন দুঁচারজন চিনতেন। ক্ষ্যাপাবাবাকে দেখে তারা বলে উঠলেন, বাবা এসে গেছে। এবার ট্রেন চলবে।

কি হয়েছে জানতে চাইলেন বামাচরণ। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? ট্রেন নড়ছে না শুনে বললেন, এই চলো। আশচর্যের ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করল তারাপীঠগামী ট্রেন।

সুখের কথা, বর্তমানে মন্দির চতুরের মধ্যে মহাতাপস মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে বালানন্দ যাত্রীনিবাস। যে কোনও মানুষের থাকার জন্য আদর্শ জায়গা। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী ছাড়াও এখানে এসেছেন ঠাকুর সত্যানন্দ, ওক্ষারনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাধু সন্ন্যাসীরা।

রথ্যাত্রার সময়, বিপদ্তারিণী পুজোয় এখানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সমাগম হয়। শনি, মঙ্গলবারেও অনেকে মাকে পুজো দিতে আসেন। এখানে মায়ের পুজোর নৈবেদ্য হিসাবে কলাবাতাসা খুবই পরিচিত। অমরানন্দ স্বামী নামে জনৈক সাধু এই ধরনের প্রসাদের প্রচলন করেন। এছাড়াও খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি, পায়েস, চাটনি ভোগ হিসাবে মাকে ভোগ দেওয়া হয়। মাছের ব্যবস্থা আছে। মন্দির খোলা থাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। মাঝে ভোগের জন্য আধঘণ্টা বিশ্রাম।

এখানে মাকে পুজো করা হয় চৰ্মীর পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী, চতুর্ভুজা ধ্যানে। দুর্গাপুজোর চারদিন মাকে পুজো করা হয় দুর্গারূপে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছে এখানে। বিশেষ বিশেষ দিনে মায়ের প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় জমিদার বাড়ি থেকে। এছাড়া কালীপুজো, বাসন্তী, জগন্নাথী পুজো-সব উৎসবেই মান নদিকেশ্বরীকে নিয়ে মেতে ওঠেন সাঁইথিয়ার মানুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নদিকেশ্বরী মন্দিরের সামনেই রয়েছে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মন্দির।

অতীতে এখানে রথ্যাত্রার ব্যবস্থা ছিল। মাঝে তা বন্ধ বা সীমিত হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষেরা আবার এই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন, যদিও মূল মন্দিরের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই।

নদিকেশ্বরী মায়ের মন্দিরের কাছেই ময়ুরাক্ষী নদী। কোনও কোনও বছর বর্ষার সময় সাঁইথিয়ার মতো মহকুমা শহরও বন্যায় ভেসে যায়। আশচর্যের বিষয়, একবারের জন্যও বন্যার জল স্পর্শ করেনি মায়ের মন্দির চতুর।

এখানে একটা প্রবাদ আছে যা বাস্তবেও বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তা হল, এখান থেকে অর্থ আয় করে বাইরে কোথাও বিনিয়োগ করলে তার ফল ভাল হয় না।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এখানে পাঞ্চার কোনও উৎপাত নেই। কিন্তু আছে এক মনোরম পরিবেশ।

হাওড়া থেকে ট্রেনে সাঁইথিয়া স্টেশনে নেমে মায়ের মন্দিরে পৌছতে পায়ে হেঁটে সময় লাগে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিট।

নলহাটীর নলাটেশ্বরী

আনুমানিক পাঁচশ বছর আগে, ১০০ সনের আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে পাইকপাড়া গ্রামে রামশরণ শর্মা নামে জনেক ব্যবসায়ী তথা সাধককে স্পন্দ দিয়ে মহামায়া অধিষ্ঠিতা হন নলহাটীতে। কলকাতা থেকে নলহাটীর দূরত্ব দুশো আঠাশ কিলোমিটার। রেলস্টেশন থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে একটি টিলার ঢালে পার্বতী মায়ের মন্দির। একেই মানুষজন নলাটেশ্বরী মন্দির নামে চিহ্নিত করেন। এখানে দেবীর নলা পড়েছিল বলে নাম হয়েছে নলাটেশ্বরী। একাংশের মতে, মন্দিরটি গড়েছেন রাণী ভবানী। এ ব্যাপারে অবশ্য অন্য মতও আছে। তা হল, মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন রামশরণ শর্মা। বাণিজ্য করতে এসে তিনি মন্দির তৈরির জন্য স্ফুরণে পেয়েছিলেন।

এই মন্দিরটিকে একান্ন পীঠের একটি পীঠ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

পীঠ নির্ণয়ের বর্ণনায় চতুর্শত্বারিংশৎ শাস্ত্ৰপীঠ হল নলহাটী। সেখানে আছে,
“নলহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।

তত্ত্ব সা কালিকা দেবী সবসিদ্ধি প্রদায়িকা।”

অর্থাৎ নলহাটীতে পড়েছে সতীর নলা। দেবীর নাম ‘কলী’।

ভৈরবের নাম যোগীশ’।

সংস্কৃত শব্দ ‘নলক’ যার অর্থ দীর্ঘ অস্তি, বাল্লায় তারই ক্রটিপূর্ণ উচ্চারণ হল নলা। অনেকের বিশ্বাস, এখানে পড়েছে দেবীর নলাটুকিস্ত শাস্ত্ৰ, পুরাণে রয়েছে এই জায়গায় পড়েছিল দেবীর নলা। জনেক ‘মাহা জমিদার’ মন্দিরটি তৈরি করিয়েছেন বলেও শোনা গেছে। বৈষ্ণব জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ মন্দিরের জন্য অনেক জমি দান করেছিলেন। পার্বতীর ভৈরব যোগীশের ভিত্তি খোঁড়ার সময় একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে আঁকা ছিল নারায়ণের পদচিহ্ন। ওই পাথরটিকে মন্দিরে গেঁথে রাখা হয়েছে। স্থানীয় প্রকাশক-পুস্তক ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী অমিয় কুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, অতীতে মন্দিরের পেছনে দুটি প্রস্তরণ ছিল। আমি তার জলও খেয়েছি। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক মানুষ এখানে স্বাস্থ্যেদ্বারের জন্য আসতেন। বেশিরভাগ মানুষ সেই প্রস্তরণের ঠাণ্ডা জল খেতেন। পরে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এখন সেখানে পুকুরের মতো হয়ে আছে। এখানে একটি গড় ছিল। মন্দিরের পিছনে টিলার মাথায় বর্গী যুদ্ধের পির কেবালা আশা শহিদের মাজার আছে। বাংলার শেষ নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধ হয়েছিল উদয়নালার মাঠে, যা টিলার ওপর থেকে দেখা যায়। পিরবাবার মাজারের পেছনে একটি নিমগ্নাছ ছিল। ওই নিমগ্নাছের মন্দিরের দিকের পাতাগুলি ছিল তিতো আর অপরদিকের

গাতাগুলো ছিল মিষ্টি। এগুলি আমার দেখা। ওই নিমগাছের তিতো ও মিষ্টি, সব পাতাই খেয়েছি। পুরো পাহাড়টি ছিল জঙ্গলে ভরা। সেখানে চারটি বটগাছ ছিল। প্রচলিত কাহিনী আছে, রামচন্দ্র নাকি এখানে এসে অস্থায়ীভাবে থাকার সময় রামাবানা করার পর তাঁর পেঁতা গাছের ডাল থেকে একসময় সেগুলি বটবৃক্ষে পরিণত হয়। সেখানে একটি পাথর আছে যার গায়ে রয়েছে অনেকগুলি দাগ। প্রবাদ আছে, সীতা এখানে বসে চুল শুকিয়েছেন বলে পাথরের গায়ে ওই দাগগুলি হয়ে যায়।

১৯৬৪ সালে মন্দিরের কাছাকাছি জায়গা থেকে প্রস্তরযুগের কিছু টাকা, পয়সা ও মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এখন সেগুলি যাদুঘরে রাখা আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, রামশরণ শর্মার বংশধরেরা এখনও নলহাটীতে বসবাস করেন। তাঁদের কাছেই জেনেছি, ওঁর পূর্বপুরুষ এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্পর্কে স্পন্দনিষ্ট হন। এখানকার একটি এলাকার নাম অরূপাচল, আর একটির নাম উদয়াচল। বামদেব তারাপীঁষ্ঠ থেকে এখানে প্রায়ই আসতেন এবং চারদিন-পাঁচদিন থেকে যেতেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কমলচন্দ্র মসকরা'র কাছে জানা গেছে দেবীর বিভিন্ন মাহাত্ম্যকথ। তিনি বলেছেন, একসময় মন্দিরের খুবই খারাপ অবস্থা হয়েছিল। ছাদ থেকে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ত। মায়ের পুজো হত কোনওরকমে। অনেকেই তখন মন্দিরে যেতে চাইতেন না। রাতে তো সেখানে থাকার কোনও প্রশ্নই ছিল না। সময়টা ছিল ১৯৯৪-৯৫ সাল। আস্তে আস্তে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। '৯৬ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে শুরু করে। দুঃখের বিষয় ছল, স্থানীয় জনগণের অনেকেই জানতেন না, নলাটেশ্বরী একান্ন পীঠের অন্যতম এবং মায়ের নলা এখানে পড়েছে। অবশ্য কারও কারও মতে, এখানে প্রতিদেবীর পায়ের নলি। নলহাটী নাম কেন হয়েছিল এ নিয়েও দ্বিমত রয়েছে। একপক্ষের মতে, রাজা নলের নামে এই জায়গার নামকরণ করা হয়েছে। অন্যমতে হল দেবীর অঙ্গ পতনের জন্যই এই জায়গার নাম নলাটেশ্বরী রাখা হয়েছে। এটি এক ঐতিহাসিক জায়গা। লুঁঠনকারীদের জায়গা হিসাবে চিহ্নিত বর্গীডঙ্গা আছে। এখান মাটির তলায় জায়গার স্ফীকান পাওয়া গেছে। সেখানেই বর্গীরা আশ্রয় নিত। একসময় এখানে মুসলমান ও বর্গীদের মধ্যে যুদ্ধও হয়েছিল। শোনা যায়, নলহাটী নাকি তিনটি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমান রাজাত্মের সময় মহাদেব যোগীশকে নলহাটী থেকে সরিয়ে 'হরিওকা'-তে (চলিত ভাষায় বলা হয় হরিওকা, আসল নাম হরিতকা—এখানে হরিতকির গাছ ছিল বলে জায়গাটির এরকম নামকরণ করা হয়েছে) ওই নিয়ে যাওয়া হয়। নলহাটী থেকে জায়গাটির দূরত্ব প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। আরও শোনা যায়, মায়ের মন্দিরে দু'টি সাপ ছিল। প্রতিদিন পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুললে দেখতে পেত মহামায়ার ওপর দু'টি নাগ-নাগিন রয়েছে। দরজা খোলার পর সাপ দু'টি সামনের পুকুরের মধ্যে চলে যেত। আশ্চর্যজনকভাবে, পরের দিন সকালে আবার মন্দিরের মধ্যে সাপ-দু'টিকে দেখা যেত। একদিন এই দু'টি সাপের মধ্যে একটিকে কেউ বা কারা ঘেরে

ফেলে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই হত্যাকারীর বংশ লোপ পেয়ে যায়। আমার অনুভব, মন্দিরের উত্তরদিকে একটি পাথরের নীচে এখনও অন্যতম সাপটি থাকে। কেউ কেউ তাকে দেখতেও পেয়েছে। স্থানীয় দোকানদারেরা সাপটির অবস্থান সম্পর্কে জানানোর পর সেখানে গিয়ে দেখেছি, পাথরের নীচে দিয়ে যাবার রাস্তা আছে। একসময় সেখান থেকে বড়মাপের সাপের খোলসও পাওয়া গেছে।

মন্দিরের দক্ষিণদিকে একটি সাদা নাগ আছে। তার মাথাতে সিঁদুরের দাগ ছিল বলে অনেকে দাবি করে থাকেন।

অনেক পঙ্কু মানুষ মা নলাটেশ্বরীর কাছে এসে সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। একদিন মন্দিরের অফিসে বসে কাজ করছি। কলকাতা থেকে জনৈক ভদ্রলোক এসে বললেন, আপনি কি জানেন মায়ের মন্দিরে আসার চারটি রাস্তা আছে। মন্দিরে আসবার রাস্তা তো আছেই, কিন্তু ভদ্রলোক কেন সংখ্যায় চারটি বললেন, তেবে পেলাম না। কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে বললাম, না এরকম কোনো তথ্য আমার জানা নেই। তখন ওই ভদ্রলোক, ঠিক আছে চিন্তা করে দেখবেন বলে, চলে গেলেন। অনেকদিন আমি এই বিষয়ে ভেবেছি। কিন্তু কিছুতেই উত্তর খুঁজে পাইনি। একটি রাস্তা তো রয়েছে যেখান দিয়ে মন্দিরে আসা যায়।

অনেকদিন ধরেই এই নিয়ে মনের মধ্যে দৃঢ় থেকেই যায় নলহাটির কমল চন্দ্র মসকরার। মন্দিরের যদি চারটি রাস্তা থাকে, তাহলে তার প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়? বেশ কিছুদিন চিন্তা করার পর কয়েকটি বিষয় তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। বগীরা লুঠনকারী, ওরা মা কালীর ভক্ত। মায়ের পুজো না করে ওরা কোনো কাজ করত না। তাই মা নলাটেশ্বরী মন্দিরে আসার জন্য বগীডাঙ্গা থেকে কোনও একটি আভার গ্রাউন্ড রাস্তা নিশ্চয়ই আছে। অনুসন্ধান করে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এর আগে বছরের পর বছর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ওই রাস্তার খোঁজ করেছি। কিন্তু তখন কোনও সন্ধান পাইনি। মায়ের ঘরের পাশে একটি কুয়ো আছে। তার পাশে একটি গর্ত আছে। মনে হয়েছিল, সেখান দিয়ে কোনো রাস্তা থাকতে পারে। কিন্তু একসময় সেই সন্দেহ অমূলক বলে ধরে নেওয়া হয়। একসময় মন্দির কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ অমল ধর। একদিন তিনি কথায় কথায় বললেন, মন্দিরের চারদিকে অনেকগুলি গর্ত আছে। ওইসব গর্তের মধ্যে কেউ পড়ে গেলে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তখন আর সন্দেহ রইল না যে মন্দিরের পাশে ডাঃ ধরের যে জায়গা আছে সেখানে দিয়েই বগীডাঙ্গায় যাওয়ার রাস্তা আছে।

নলহাটির ব্যবসায়ী-ভক্ত কমল চন্দ্র মসকরা আরও জানিয়েছেন, নলহাটিতে রাজপরিবারের বাড়ি এখনও আছে। রাজারা যখন মা নলাটেশ্বরীকে প্রণাম করতে যেতেন তখন চারিদিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। একথা ধরেই নেওয়া যেতে পারে, এই সময়

রাজবাড়ির বিশেষত মহিলাদের যাতায়াত করার জন্য কোনও ‘আন্দারগ্লাউন্ড’ রাস্তা ছিল। তখন জায়গাটি এমনই জঙ্গলে ঢাকা ছিল, দর্শনার্থীরা সকাল সকাল মাকে দর্শন করে ফিরে যেতেন। সূর্য ডোবার পর সেখানে কেউ থাকত না। আর এখন যেদিক থেকে সকলে মাকে দর্শন করতে যান সেই রাস্তাটি তো ছিলই। তাহলে চতুর্থ রাস্তাটি কোথায় আছে?

এরপর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আরতির সময় মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছি হঠাৎ চোখে পড়ল গাছের নীচে একটি দীর্ঘদেহী লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমায় ডেকে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমার তখন মন ছটফট করছে আরতির সময় মন্দিরে মায়ের কাছে যাবার জন্য। সে কথা বুবতে পেরেও ভদ্রলোক আমায় বললেন, বাকি রাস্তাটা খুঁজে পেলেন? হচ্ছকিয়ে গেলাম ওঁর কথায়। একি বলছেন, আমি তো এই কথাই দিনরাত ভাবছি। বললাম, আপনি আমার মনের কথা জানলেন কী করে? আমার প্রশ্নে কান না দিয়ে তিনি বললেন, মন্দিরে আসার চারটে রাস্তা আছে? বললাম হ্যাঁ, তিনটে সন্ধান পেয়েছি। বলে ওঁকে তিনটে রাস্তার সন্ধান দিলাম।

তখন ভদ্রলোক বললেন, নলহাটি থেকে পূর্বদিকে তিনি, সাড়ে তিনি কিলোমিটার দূরে একটি শুকনো ইন্দারা ছিল। তার মধ্যে দিয়ে মন্দিরে আসতে রাস্তা ছিল। তিনি আরও জানলেন, সন্ধ্যাসী, মহাআশ্রাম ওই রাস্তা দিয়ে আসতেন মা নলাটেশ্বরী মন্দিরে।

জানতে চাইলাম ওই রাস্তাটা কোথায় আছে? ভদ্রলোক প্রত্যন্তে জানলেন, সে কথা জানার সময় এখনও আপনার হয়নি। সময় হলেই জানতে পারবেন।

এদিকে আরতির ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। শ্রীকমলবাবু মন্দিরের দিকে ব্যস্ত হয়ে কয়েক পা এগিতেই হঠাৎ মনে হল, কে এই ভদ্রলোক, কী তাঁর পরিচয়, যিনি আমায় এত কথা বলে এত গভীর রহস্যের সন্ধান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে সেই জায়গায় এসে দেখলেন সেখানে কেউ কোথাও নেই। এরপর আশেপাশের অনেককে জিজ্ঞেস করলাম, যে লোকটির সঙ্গে কথা বলছিলাম তাঁকে কেউ দেখেছে কিনা? কিন্তু কেউ তাঁকে সদৃশের দিতে পারেনি।

সেই রহস্য আজও ভাবায় ওকে। আর একবার এক অন্তর ঘটনা ঘটে তাঁর জীবনে। মন্দিরের অফিসে বসে রয়েছেন শ্রীমসকরা। সময় বারোটা-সোয়া বারোটা। একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে অফিসঘরের গেটের কাছে দাঁড়াল। শ্যাওলা রং, পাতলা গড়ন। ফিকফিক করে হেসে বলল, আমি ভোগ খাব। শ্রীমসকরা বললেন, মা, তুমি ভোগ খাবে, কিন্তু এখন তো সময় হয়ে গেছে। ভোগ ‘রেডি’ হয়ে গেছে। এর থেকে ম্যানেজ করা তখন খুবই মুশকিল ছিল। বললাম, মা আজ হবে না। কাল এসো, নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে দেব। মেয়েটি বলল, আমি আজই ভোগ খাব।

জিজ্ঞেস করলাম, মা, কোন বাড়িতে থাকো? মনে হচ্ছে, তুমি আশেপাশে কোথাও

থাকো ?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল, আমি পাশের বাড়িতে এসেছি।

কথাগুলি শুনে আমার খটকা লাগতে শুরু করল। আবার বললাম, মা তুমি কাল এসো। অবশ্যই ভোগের ব্যবস্থা করে দেব।

কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম, মাকে দেখেও চিনতে পারলাম না। এই চিন্তা করতে করতে চার-পাঁচটা বিনিন্দ্র রাত কেটে গেল। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? তখন তাঁকে সব বললাম, তিনি আমার সব কথা শুনে বললেন, হ্বহ্ব এই মেয়েটি তো আমাদের বাড়িতে খেয়ে গেছে। মনে মনে স্ত্রীকে বললাম, তুমি আমার থেকেও বেশি ভাগ্যবান।

বুঝতে পারলাম, মায়ের কিছু আদেশ আছে। সেই আদেশ পালন করা বিশেষ প্রয়োজন। পরের দিন মন্দিরে গিয়ে ঠিক করে দিলাম, প্রথমে কোনও কুমারীকে ভোগের প্রসাদ দেওয়া হবে। তারপর যথাক্রমে মন্দিরের ব্রাহ্মণ ও ভক্তেরা প্রসাদ পাবে।

আর একবার জনৈক অপরিচিত ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমাদের মা নলাটেশ্বরী আসলে একজন পাঁচ বছরের মেয়ে। উনি লাল পোশাক পরে ঘুরে বেড়ান। পায়ে মল পরা আছে এটাই হল ওর প্রকৃত রূপ।

একবার এক সাধক নবরাত্রির সময় এসে বললেন, ~~আমি~~ এখানে ন'দিন পুজো করব। বললাম, করুন। ন'দিনের মাথায় বললেন, ~~আমি~~ ভক্তদের প্রসাদ খাওয়াব। উভয়ের জানালাম, যেমন বললেন, তেমনি ব্যবস্থা করে দেব। তিনি যতটা জিনিসের কথা বলেছিলেন আমি তার অর্ধেক ~~দিয়েছিলাম~~ বলেছিলাম, একশ জনক কুমারীর ব্যবস্থা করতে। সেদিন ষাট-সত্ত্বে ~~জন~~ কুমারী, ব্রাহ্মণসহ দেড় থেকে দু'জনের মানুষ মায়ের প্রসাদ পেয়েছিল। শেষপর্যন্ত কিন্তু প্রসাদ কর পড়েনি।

মায়ের যে নলা আছে, সেখানে দুধ বা কিছু দিলে মানুষ যেতাবে খায় সেইভাবে আস্তে আস্তে নেমে যায়। এই নয় যে, কিছু দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দিয়ে নেমে যাবে। শোনা যায়, যখন মন্দির হয়নি, তখন সাহা পরিবারের কর্তাকে মা স্পন্দ দিয়ে বলেন, আমি এখানে খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছি। আমার আচ্ছাদনের ব্যবস্থা কর। তাঁরই তত্ত্বাবধানে মন্দির তৈরি হয়। একসময় এই জায়গায় নানান ধরনের জীবজন্তু থাকত। আজও মন্দিরের চারপাশে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কোনও পাথরের আকৃতি হাতির মতো, আবার কোনটা বাঘ বা অন্য প্রাণীর মতো। কারও কারও মতে, এগুলি হল জীবজন্তুর ফসিল, পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

অহিন্দৃষ্ণ কবিরাজ এবং আমার দাদু— দু'জনে ছিলেন কালীভক্ত। আমাবস্যার রাতে মায়ের চতুরে যে পঞ্চমুক্তির আসন আছে ওঁরা সেখানে পুজো করতে যেতেন। মা তখন শিয়ালরনপে সেখানে আসতেন। আমার বাবা চণ্ডীপ্রসাদ নক্ষর এবং আমার আর

এক দাদুর ছেলে (তাঁর নাম আমার জানা নেই) ওঁরা তখন ছেলে মানুষ। দু'জনে ঠিক করেন অমাবস্যার রাতে সেখানে কী হয় দেখবেন। শিবাভোগ দেওয়ার পর শিয়ালের লকলকে জিভের থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা আগুনের রূপ দেখে তাঁরা ভীষণ ভয় পেয়ে যান। ওঁরা চিৎকার শুনে কবিরাজ মশাই বলেন, আরে এখানে বাচ্চার আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। ওই ঘটনা দেখার পর আমার বাবার সাতদিন পর জ্ঞান ফেরে এবং সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁর জ্ঞান ফেরে তিনমাস পরে।

মা নলাটেশ্বরী মন্দিরের জন্য রাণী ভবানী তিনশো পঁয়বত্তি বিঘা জমি দান করেন। এখানে একটা মায়ের বাগান আর একটা বাবার বাগান ছিল। এটা আমরা ছেটবেলায় দেখেছি। এখনও ওই জায়গাগুলি রেজিস্ট্রি করা সম্ভব হয়নি। মায়ের পুজোর জন্য রাণীমা সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। সামান্য দূরত্বে বয়ে চলেছে যকধরী নদী, যার আসল নাম ব্রান্ডগী। একসময় এই নদী মায়ের মন্দিরের পাশ দিয়েই বয়ে যেত।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : (শিয়ালদা থেকে গৌড় এক্সপ্রেস বা অন্য কোনও ট্রেনে অথবা রামপুরহাটে এসে সেখান থেকে ট্রেনে ২০ মিনিটের মধ্যে নলহাটিতে যাওয়া যায়। স্টেশনের কাছে থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে। স্টেশন থেকে নলাটেশ্বরী মন্দিরে রিকশায় যেতে সময় লাগে ১০-১৫ মিনিট। সকাল ৬-১২ মিনিটে নলহাটি স্টেশন থেকে ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে বেলা ১১-২৫ মিনিটে হাওড়ায় পৌছনো যায়।)

850

শুশানতীর্থ বক্রেশ্বর

একসময় শুশানতীর্থ বক্রেশ্বরে কয়েক ঘর মানুষ ছাড়া কারও বসতি ছিল না। তখন এখানকার নাম ছিল ‘ডিহি’। এখনও অনেকে ‘ডি-বক্রেশ্বর’ নামে এই জায়গাকে চিহ্নিত করে থাকেন। এর পূর্বদিকে একটি নদী আছে। নদীর পারে একটি জঙ্গলের মতো ছিল যেখানে বক্রেশ্বর শিবের অবস্থান।

বক্রেশ্বর শিবের সঙ্গে অষ্টাবক্রমুনির জন্ম এবং তাঁর জীবন নানাভাবে জড়িয়ে আছে। অষ্টাবক্র মুনির বাবার নাম কহোড়মুনি এবং মায়ের নাম ছিল সুজাতা দেবী। বেদজ্ঞানে, পারদর্শী কহোড়মূলৰ মতো মানুষের সংখ্যা তখন হাতে গোনা যেত। অষ্টাবক্রমুনি যখন তাঁর মায়ের গর্ভে ছিলেন, তখন স্ত্রীকে বেদ পাঠ করে শোনতেন কহোড়মুনি। অনেকের ধারণা, গর্ভে থাকার সময় বাবার বেদ পাঠ শুনে অষ্টাবক্র মুনি পৃথিবীর আলো দেখার আগেই বেদজ্ঞানের অধিকারী হন। ওই সময় একদিন কহোড়মুনি নাকি কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভুল বেদপাঠ করেন। তখন গর্ভস্থ সন্তান অষ্টাবক্র বলে ওঠে, বাবা, আপনার কৃপায় মায়ের গর্ভে থাকার সময়েই আমি বেদজ্ঞানে পারদর্শী হয়েছি। সেই সূত্রে বেদপাঠের সময় আপনি যে কিছু ভুল পাঠ করছেন, তা রেখাতে অসুবিধা হয়নি।

কহোড়মুনি গর্ভস্থ সন্তানের কথা শুনে অত্যন্ত অগ্রমাণিত বোধ করেন এবং তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেন, তোমার অষ্টাঙ্গ বিকৃত হোক। সেই অভিশাপের সূত্রেই অষ্টাঙ্গ বিকৃত সন্তানের জন্ম হয় এবং তিনি অষ্টাবক্র নামে পরিচিত হন।

একসময় জনকরাজাকে যিনি সন্তুষ্ট কর্তৃতে পারতেন তার কোনও অভাব থাকত না। অভাবের তাড়না থেকে যুক্ত হৃষ্বার জন্য কহোড়মুনি একদিন জনকরাজার রাজসভায় যান। কিন্তু রাজাসভার সভাপণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত হন। তখন কহোড়মুনিকে বরণের সেবায় নিযুক্ত করা হয়।

অষ্টাবক্রের বয়স যখন বারো বছর তখনই তিনি সর্বশাস্ত্রে পদ্ধিত হয়ে ওঠেন। সেই সময় তিনি তাঁর মা সুজাতার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারেন। মায়ের কাছে থেকে সবকিছু শোনার পর সেখানে চলে যান। কিন্তু দ্বাররক্ষী তাঁকে সেখানে প্রবেশাধিকার দেননি। বালক তখন স্বয়ং রাজাকে পাণিত্যে আকৃষ্ট করেন এবং রাজসভায় প্রবেশের অধিকার লাভ করেন। রাজার অনুমতিক্রমে সভাপণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শর্ত ছিল, যদি অষ্টাবক্র সভাপণ্ডিতকে তর্কে পরাজিত করতে পারেন তাহলে তাঁর বাবাকে বন্দিদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে।

শাস্ত্রযুদ্ধে সভাপণ্ডিত বন্দীকে পরাজিত করেন বালক অষ্টাবক্র। ছেলের এহেন

সাফল্যে মুক্ত কহোড়মুনি তাকে আশীর্বাদ করে বলেন, তুমি সমঙ্গ নদীতে স্নান করলে তোমার অঙ্গ-বিকৃতি দূর হয়ে যাবে। সমঙ্গ অর্থাৎ সমান গতিতে যে নদী বয়ে চলেছে এমন জলতরঙ্গের সন্ধান করতে করতে অষ্টাবক্র ডিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে এসে তিনি দেখলেন, পূর্বদিকে জঙ্গলের মধ্যে আটটি কুণ্ড অর্থাৎ জলধারা রয়েছে, যেখান থেকে জলপ্রবাহ বয়ে চলেছে। তিনি আরও দেখলেন, সাতটি কুণ্ডের জল গরম আর একটি কুণ্ডের জল ঠাণ্ডা। এই সাতটি কুণ্ডের জলধারা একটি জায়গায় মিলিত হচ্ছে। অষ্টাবক্র সেখানে স্নান করে তাঁর শরীরের বিকৃতি থেকে মুক্তি পান।

অবশ্য এ সম্পর্কে অন্য জনশ্রুতিও শোনা যায়। শরীরের গঠন অনুযায়ী ইড়া পিঙ্গলা হচ্ছে নদীর মতো আশ্বাস-প্রশ্বাস হচ্ছে তার জলধারা। একদিন এই শ্বাসপ্রশ্বাস শরীর থেকে একুশহাজার ছ’শ বার বের হয়। মুনি এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

অষ্টাবক্র একদা ডিহি গ্রামে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে শিবলিঙ্গের সন্ধান পান। কয়েক হাজার বছর তিনি এখানে শিবের সাধনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব ‘তুমি সব শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হও’—এই বর দেন। অষ্টাবক্রমুনির নামানুসারে এই শিবের নাম হয় বক্রনাথ এবং ডিহি গ্রামের নামকরণ করা হয় ‘বক্রেশ্বর’।

এই গ্রামেই অষ্টাবক্রমুনির সিদ্ধিলাভের পর অনেকে^{সাধু} এখানে এসে সাধনা করেছেন। তাঁদের অনেকেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

দক্ষযজ্ঞের পর সতীহারা শিব পাগলের মতো স্তুর দেহ কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় সুদৰ্শন চক্র দিয়ে সতী’র তিনটি চোর কেটে ফেলেন। দেবীর তৃতীয় নয়ন পড়েছে এই বক্রেশ্বর তথা ডিহি গ্রামে। তাই দেবী এখানে মহিষমদিনী।

বাবা বক্রেশ্বরকে কেন্দ্র করে পাঁচটি শিব আছেন। কুবেরেশ্বর আছেন দক্ষিণ দিকে। সিদ্ধেশ্বর আছেন নাটশালার উত্তরদিকে। জ্যোতিলিঙ্গেশ্বর আছেন শ্঵েতগঙ্গার উত্তর পূর্বদিকে। কালাকুণ্ডেশ্বর আছেন ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিমে আর জন্মেশ্বর আছেন বক্রেশ্বরের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে। এখানেই আছে আটটি জলের কুণ্ড। এদের আলাদা আলাদা নাম আছে। যেমন, ভৈরবকুণ্ড, ক্ষারকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, জীবৎসকুণ্ড, সৌভাগ্যকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, ব্ৰহ্মকুণ্ড এবং শ্বেতকুণ্ড।

জনশ্রুতি আছে, কোনও একসময় ভৈরবদেব তাওবন্ত্য শুরু করেন, যার জন্য অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি দেখে ভৈরবদেব কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি শান্তির উদ্দেশে তীর্থে তীর্থে ঘূরতে শুরু করেন। একসময় বক্রেশ্বরে এসে কুণ্ডের জলে স্নান করে তপস্যা শুরু করেন। তারপর তাঁর মন শান্ত হয়। সেই থেকে এই কুণ্ডের নাম হয় ভৈরবকুণ্ড। এখানে জলের উষ্ণতা ৬৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

আর একটি কুণ্ডের নাম ক্ষারকুণ্ড। একবার দৈবশক্তিতে বলীয়ান জনৈক মুনি সমুদ্রের সব জল পান করতে শুরু করেন। তখন মুনির ভয়ে ভীত হয়ে সমুদ্রের নুন কুণ্ডের

জলের আশ্রয় নেওয়ায় সেখানকার জল ক্ষারে পরিণত হয় এবং এই জায়গাটি ক্ষার কুণ্ড নামে পরিচিত হয়। এখানকার জলের উষ্ণতা ৬৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

অগ্নিকুণ্ডের নামকরণের সঙ্গে ভগবান নৃসিংহ ও হিরণ্যকশিপুর নামও জড়িয়ে আছে। হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করার জন্য ভগবান, নরসিংহ রূপ ধারণ করেন। তপ্ত অবস্থায় ভগবান নরসিংহ বক্রেশ্বরের কুণ্ডে স্নান করার পর তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হয়। তখন থেকে ওই কুণ্ডের নাম হয় অগ্নিকুণ্ড। এই কুণ্ডের জলের উষ্ণতা ৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

বক্রেশ্বরের আর একটি কুণ্ডের নাম জীবৎসকুণ্ড। আশচর্যজনকভাবে এখানকার জল সবসময়ে ঠাণ্ডা থাকে এবং কোনও সময়েই এখানকার জল বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই। এই কুণ্ডের নামকরণের ক্ষেত্রেও এক অলৌকিক জনশ্রুতি আছে। বাল্মীকি আশ্রমে শিক্ষা নেওয়ার পর ব্রাহ্মণ-সন্তান সর্বজয়া এবং ক্ষত্রিয়-সন্তান মধুকর তীর্থ ভ্রমণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁদের গুরু বলেন, তোমাদের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। তারপর তোমরা তোমাদের সংসার জীবন শুরু করতে পারবে। গুরুদেবের আশীর্বাদ নিয়ে বিভিন্ন তীর্থে ঘূরতে ঘূরতে একসময় তাঁরা বক্রেশ্বরে এসে উপস্থিত হন। সেখানে দু'জনেই মহাদেবের কৃপালাভের জন্য সাধনায় ব্রতী হন। একদিন মধুকর পুজোর জন্য বেলপাতা সংগ্রহ করতে যান।

দীর্ঘক্ষণ সময় পার হয়ে যাবার পরে সর্বজয়া তাকে খুঁজতে বের হন। একসময় তিনি দেখেন বেলগাছের তলায় দিবাকর মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। আর্তনাদ করে ওঠেন সর্বজয়া, তখন সেখানে ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হন বাবা বক্রেশ্বর। তিনি সর্বজয়াকে বলেন, তুমি দিবাকরকে কুণ্ডের জলে স্নান করালে ও প্রাণ ফিরে পাবে। সর্বজয়া দিবাকরকে কুণ্ডের জলে স্নান করানোর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণ ফিরে পায়। সেই থেকে ওই কুণ্ডের নাম হয় জীবৎস কুণ্ড। ইন্দোনেশিকালে অনেক মেয়েরা, যাদের সন্তান হয় না, তারা এই কুণ্ডে স্নান করে বাবা বক্রেশ্বরের পুজো দিয়ে সন্তান কামনা করেন।

বক্রেশ্বরের অন্যতম একটি কুণ্ডের নাম সৌভাগ্যকুণ্ড। এখানকার জলের তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বিশেষ বিশেষ তিথিতে সূর্যোদয়ের আগে থেকে দুধ মেশানো জলের যেমন হালকা সাদা রং হয়, তেমনই এই কুণ্ডের জল সেরকম আকার ধারণ করে। আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তা দ্রুত মিলিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, যাদের ভাগ্যে থাকে তাঁরাই এই বিরল দৃশ্য দেখতে পান। কথিত আছে এক সময় পার্বতীর ইচ্ছা ছিল রূপবতী হওয়ার আর সেইজন্য তিনি বক্রেশ্বরে কঠোর তপস্যা শুরু করেন। তপস্যার সময় তিনি এই কুণ্ডের জল ব্যবহার করতেন। একসময় তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহাদেব পার্বতীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তখন থেকেই এই কুণ্ডের নাম হয়, সৌভাগ্য কুণ্ড।

বক্রেশ্বরের সূর্যকুণ্ডের জলের তাপমাত্রা ৬১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই কুণ্ডকে আবর্তিত

করেও নানান কাহিনী শোনা যায়। শোনা যায়, এক সময় নাকি বিন্দ্য পর্বত ভীষণ রেগে যান, যার জন্য তিনি ক্রমশ তার উচ্চতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। এই অবস্থা এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যে, সূর্যদেবের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থার নিরসনে সূর্যদেব বক্রেশ্বরে এসে বক্রনাথের সাধনা শুরু করেন। দীর্ঘদিন সাধনায় বক্রনাথ সন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেবকে এমন বর দেন যে, বিন্দ্য পর্বতের মাথা নিচু হয়ে যায়। যেহেতু এই কুণ্ডের পাশে সূর্যদেব সাধনা করেছিলেন, সেইজন্য এর নাম হয় সূর্য কুণ্ড।

এখানেই আছে ব্রহ্মকুণ্ড। এখানকার জলের তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। স্বয়ং ব্রহ্মা একবার কামদেবের কবলে পড়েন। তখন একদিন কামনার জ্ঞালায় নিজের মেয়ে সন্ধ্যার রূপ যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে এগিয়ে যান। ব্রহ্মার ছেলেরা বাবার এই অবস্থা দেখে হাতজোড় করে তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদন করেন। তখন তিনি (ব্রহ্মা) নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বক্রেশ্বরে এসে কুণ্ডের জলে স্নান করে পাপমুক্ত হন। সেই থেকেই কুণ্ডের নাম হয় ব্রহ্মকুণ্ড।

শ্বেতকুণ্ড বক্রেশ্বরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কুণ্ড। এখানকার জলের উষ্ণতা ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এখানকার জলের বক্রেশ্বরের অধীশ্বরদের ভোগ রাখা হয়।

অনেকদিন আগে এখান থেকে ৪০ মাইল দূরে মঙ্গলকেটে শ্বেত রাজার রাজধানী ছিল। ধার্মিক ও ঈশ্বরপ্রেমিক হিসেবে শ্বেতরাজার পরিচিতি ছিল। শোনা যায়, প্রতিদিন তিনি মঙ্গলকেট থেকে বক্রেশ্বরকে দর্শন করতে আসেন। শ্বেতরাজার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বাবা বক্রেশ্বর দর্শন দেন এবং বর প্রার্থনা করতে বলেন। শ্বেতরাজা প্রার্থনা করে বলেন, শেষদিনে যেন তোমার চরণে স্নান পাই। পূর্ণ হয় রাজার প্রার্থনা। সেই থেকে এখানকার নাম হয় শ্বেতগঙ্গা।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘মহামুনি অষ্টাবক্র ও সংহিতা’ বই-এর মাধ্যমে অষ্টাবক্রমুনির সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। পূর্বাশ্রমে মুনির নাম ছিল ‘সুব্রত ঋষি’। তিনি ছিলেন রাজাপুত্র, তাঁকে দেখতেও ছিল খুব সুন্দর। প্রবাদ আছে, সূর্যবংশের কোনও রাজার দুই মহিষী কেশীনি ও সুমতির অভিশাপে পরজন্মে অটাপ্সবক্র হয়েছিলেন (সুব্রত ঋষিই)। কোশল রাজ্যের অবস্থান ছিল তমসা নদী ও সরয় নদীর ব্যবধানে। সরয় নদীর তীরে ছিল সুব্রত ঋষির আশ্রম। দুই রাজ মহিষী প্রতিদিন সকালে সরয় নদীর তীরে স্নান করতে আসতেন। এবং ঋষি আশ্রমের কাছে নদীর তীরে শিবলিঙ্গে শিবপুজো করে রাজবাড়িতে ফিরে আসতেন। সুব্রত ঋষি ও স্নান ও তর্পণ করতেন সরয় নদীতে। একদিন ওই দুই রানী যখন নদীতে স্নান করছিলেন এমনসময় ঋষি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর ওপর ভ্রুদ্ধ হয়ে দুই রানী অভিশাপ দিয়ে বললেন, তোমার সুন্দর দেহ যেন বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। তাঁদের সেই অভিশাপ আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেন ঋষি। পরবর্তী সময়ে ওই রাজ্যের রাজা হন কৌশল বা কুশল। তাঁরই নাম অনুসারে

রাজ্যের নাম হয় কোশল। বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আড়াই হাজার বছর আগে এই জায়গাটি খুবই 'সমৃদ্ধ' অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল।

অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, বাবার অভিশাপে ছেলে হয়ে যান অষ্টব্রক্ষ। বেদের সঙ্গে এই ঘটনার সংযোগ আছে। মাতৃগর্ভে থাকার সময়ে সন্তান তার বাবার বেদ তত্ত্বের ভুল ধরেন। বাবা সে কথা শুনে কোনও কিছু না দেখে অভিশাপ দিয়ে বলেন, তোমার রূপ সৌষ্ঠুভ অলংকারাদি সকলই বিকল হউক। এই ঘটনায় মা কৌশির কাঁদতে কাঁদতে সুতিকাগারে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করেন। একসময় তিনি শুনলেন আকাশবাণী 'তোমার পুত্রে আমার সকল আশীর্বাদ বর্তাবে'

শিশু ক্রমশ বড় হতে থাকে। যখন তাঁর পাঁচ বছর বয়স তখন তাঁকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেন জামদগ্ন ঝৰি। শিশু যাই শুনত তাই তাঁর মনে গেঁথে যেত। একদিন গুরুদেব তাঁকে অক্ষশাস্ত্র সম্পর্কে শেখানোর জন্য ডাকলেন তখন তিনি বললেন, 'গুরুদেব আমার অক্ষশাস্ত্র মোটেই ভালো লাগে না। আমার পূর্ব হইতেই যোগ আছে বিয়োগ নাই।'

শিশুর গর্ত ধরে আট বছর বয়সে জামদগ্ন ঝৰি তাঁর উপনয়ন এবং ব্রহ্মদীক্ষা দিলেন। রাজপুত্র হয়েও তাঁর কিন্তু রাজকীয় জীবন ভালো লাগত না। তাই তাঁর কাছে একমাত্র পথ খোলা ছিল, তা হল 'ব্রহ্মচর্য'। সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার সাধনপথ হল, অষ্টমার্গ। অষ্টমার্গ পথগুলি হল, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি। এই সাধনার জন্য কিশোরের প্রয়োজন ছিল একজন সৎ গুরুর। একসময় গুরু হল সেই অঙ্গেমণ। অবশ্যে তিনি সন্ধান পেলেন সাধনপথের গুরুর, বিভাগুক ঝৰির পুত্র ঝৰ্যশৃঙ্গা মুনিকে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাব্রক্ষ মুনি কর্মযোগের মাধ্যমে উপাসনার পথ খুঁজে পান। এই সময়ে হয়ত তাঁর আগে থেকেই মুনিকে মানসিকভাবে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন 'সুপ্রভা' নামে দীর্ঘতমা জনৈকা ঝৰিকন্যা। অনেক রাজা-মহারাজা তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেও তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হননি।

দেবতারা যুক্তি করে তাঁর স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। নারদ মুনি ব্রাহ্মণের বেশ ধরে সেখানে আসেন, সঙ্গে নিয়ে যান অষ্টাব্রক্ষ মুনিকেও। সকলকে অবাক করে দিয়ে ঝৰিকন্যা অষ্টাব্রক্ষ মুনিকেই পতিত্বে বরণ করেন। যোগেই যার জন্ম, তাঁর কি কেউ কোনোদিন বিয়োগ ঘটাতে পারে। তাই সংসার করার বাসনা তাঁকে পীড়িত করতে থাকে। অন্যদিকে গুরুর কৃপায় তিনি জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারেন। দর্শন করেন পরমেশ্বরকে। তিনি আরও বুঝতে পারেন, কর্ম ও জ্ঞান একে অপরের পরিপূরক এবং অঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত। প্রকৃতি ও পুরুষ, গুণগ্রায়ের তফাত, ক্ষর-অক্ষর, পুরুষোন্তম দৈব ও অসুর এবং শ্রাদ্ধাত্ম্যের পার্থক্য। তাঁর গুরুদেব, সর্ব নদীর তীরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেন এবং তিনি সেই আদেশ পালন করেন।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, মহাযোগী অষ্টাব্রক্ষ মুনি কেন বীরভূমে এসেছিলেন? গুরুদেব

তাঁকে যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছিলেন, তার মূল কারণ হল তাঁর অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া। বৃদ্ধ বয়সে মহাযোগী বক্রেশ্বরে আসেন তখন সেখানে আবির্ভূতা হন দেবী মহিয়াসুরমদিনী। ভজ্ঞের কাতর প্রার্থনায় স্বয়ং দেবাদিদেব সেখানে ‘বক্রনাথ’ রূপে অবস্থান করতে সক্ষম হলেন। সাধনতত্ত্বের চূড়ান্ত পর্বে পৌছানোর পর ‘তারকব্রহ্ম’ নাম করতে করতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দে অষ্টাবক্র মুনির মহাপ্রয়াণ হয়।

মহাযোগী অষ্টাবক্র যখন সরযু নদীর তীরে থাকতেন তখন জনক রাজা তাঁর কাছে দীক্ষা নেন।

এখন বক্রেশ্বরে অষ্টাবক্র মন্দির হয়েছে। চতুরের পশ্চিমে ক্ষেত্রপাল বটুকটৈরের এবং বক্রনাথ শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করে আছেন চারটি শিবলিঙ্গ। কুবেরেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, জ্যোতি লিঙ্গেশ্বর, রূপেশ্বর—এগুলি আলাদা আলাদা মন্দিরে রয়েছে। বক্রেশ্বরকে চারভাগে ভাগ করা যায়—

(১) শৈবতীর্থ বক্রেশ্বর (২) শক্তিতীর্থ বক্রেশ্বর (৩) বৈষ্ণবতীর্থ বক্রেশ্বর (৪) যোগতীর্থ বক্রেশ্বর।

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা ‘মহামুনি অষ্টাবক্র ও সংহিতা’ বইতে এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে, শৈবতীর্থ বক্রেশ্বরে মনশ্চক্রে ভূমধ্যের মনস্ত্বিত অর্থাৎ এক লক্ষ্যবস্তুতে ধরার জন্য মনকে স্থির করার প্রকৃষ্ট স্থান। কারণ, সতী’র মন মতান্তরে ভূমধ্য, বক্রেশ্বরেই পড়েছে। তৈরব এখানে বক্রনাথ হিসাবে অবস্থান করছেন।

বক্রেশ্বরকে শৈবতীর্থ ও শক্তিতীর্থ দু’ভাবেই অভিহিত করা হয়। মহামুনি অষ্টাবক্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন মিথিলার রাজা ‘জনক’। অষ্টাবক্র মুনি শিষ্য জনককে বৈরাগ্যের বিষয়ে শিক্ষা দেন এবং সংসারে থেকেও যোগমার্গে বিচরণ করে কীভাবে মোক্ষলাভ করা যায়, সে-বিষয়েও নমীন উপদেশ দেন। ‘জনক’ রাজা বক্রেশ্বরে বেশ কিছুদিন সাধনার উচ্চমার্গের বিচরণ করে মিথিলায় ফিরে যান।

কেউ কেউ বক্রেশ্বরকে যোগতীর্থ হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। কারণ, এখানে বিয়োগের কোনও অস্তিত্ব নেই। এখানে যোগীদের শক্তি একত্রিত হয়ে ‘বিষ্ণু সম’ হয়।

অনেকের বিশ্বাস, বক্রেশ্বরকে অবশ্যই বৈষ্ণবতীর্থ বলেও অভিহিত করা উচিত। একই সঙ্গে তাদের মতে, এই স্থানটিকে শক্তিতীর্থ বলা যায়। দেবী দুর্গাকে জগন্মাতা রূপে যুগে যুগে সাধনা করেছেন সাধক—সাধিকরা। এজন্যই ওই মহান সাধক সাধিকার দেবী দুর্গার মধ্যে একেধারে মহাশক্তির আবেশ এবং অন্যদিকে বৈষ্ণবীর সমস্ত লক্ষণ দেখেছেন।

বীরভূমের অনেক জায়গা খুঁড়ে আদিমযুগের ব্যবহার করা জিনিস ও পাথরের মূর্তির সম্মত্যান পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলে রামকবি বিষ্ণুপাল রচিত পুঁথিতে লেখা আছে—

খুড়িয়া উভয় কর বন্দে প্রভু বক্রেশ্বর।

বন্দ অষ্টাচক্র মহামুনি ।
 জাবদ্ধ্যান তেজবান সর্বতীর্থ মহীতলে
 গঙ্গা যাইলা বহিএগ উজানে ।
 শ্বেতগঙ্গা ধরিনাম এক আসে অগ্নিধাম
 তার মধ্য স্থানে যমদ্বার
 তাহাতে হইলে পার নাহি যমের অধিকার
 যাইতে সাহসী হয় জীব
 শিবের নিকট দিয়া যোগবতী যায় বইয়া
 অগ্নিকুণ্ডে হয় অগ্নিলাভ ॥

অষ্টাবক্রমুনি বলেছেন, আত্মাকে চেন। একমাত্র আত্মাই অবিনশ্বর। দেহরূপ খাঁচার
 পতন হয় কেননা তাঁর বৃদ্ধি আছে, তেমনই ক্ষয় আছে। সংহিতায় আরও বলা হয়েছে,
 বিষয় বিষকে সব সময় চিহ্নিত করে নিজেকে অনুভব করতে হবে। আমি'র কোনও
 আকৃতি নেই বা তার কোনও প্রাণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই আমি সমুদ্রমাবিষ্দ। তাই যিনি
 পরমাত্মা ও পরমেশ্বরকে অভেদ কল্পনা করে সবসময় তাঁর পূজায় মগ্ন থাকেন, তাঁর
 ভজনা করেন এবং তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকেন কোনো কিছুতেই তার আশঙ্কা দেখা দিতে
 পারে না। যখন 'আমি' ভিন্নজ্ঞানে পরিপূর্ণ, তখন আত্মাভিমুনে পূর্ণ হলেই সৃষ্টি হয়
 'বন্ধন'। কিন্তু আত্মাভিমানশূন্য হলেই 'মোক্ষ' লাভসম্ভব হয় অর্থাৎ নিরহঙ্কার ও পঞ্চবিধ
 গুণ থেকে আসত্ত্বহীন হতে পারলেই জীব সুখ অনুভব করে। অষ্টাবক্র সংহিতায় বলা
 হয়েছে, প্রশংসায় যার আনন্দ হয় না, নিন্দায় যার রাগ হয় না, মরণে যার উদ্বেগ সৃষ্টি
 হয় না, পাণ্ডিত্য আছে অথচ যিনি নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করেন না, তিনিই প্রকৃত
 সুখী মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন।

রাজা জনক এক সময় মহামুনি অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রভু কীভাবে জ্ঞান
 লাভ এবং মোক্ষলাভ করা যায় এবং আর কীভাবে মোক্ষলাভ করা সম্ভব, কোন উপায়ে
 হৃদয়ে বৈরাগ্যের সংশ্লাপ হয়?

মহামুনি প্রত্যুক্তে বলেছিলেন, যদি মুক্তির বাসনা হয় তাহলে বিষয়বাসনা
 ত্যাগ করে ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্যকে অমৃত হিসাবে বিবেচনা কর। আত্মা
 পৃথিবী নয়, জল নয়, আগুন নয়, বায়ু নয়, আকাশ নয় আর আমাদের এই দেহও আত্মা
 নয়। আত্মা সব সময়েই সাক্ষীস্বরূপ, বিভু (সর্বব্যাপী), পূর্ণ (সর্বৈশ্বর্য্য যুক্ত),
 এক(অবিতীয়)মুক্ত (নির্লিপ্ত), চিত্স্বরূপ, অক্রিয়, অসঙ্গ স্পৃহাশূন্য ও শাস্ত। যেখানে
 যেখানে (তোমার) বাসনার প্রকাশ হবে অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে স্পৃহা জাগবে, তখনই
 (তুমি) সংসারী হিসাবে গণ্য হবে। কারণ, সংসারের মূল সূত্র হল কামনা। এই কামনা
 তথা ভোগের ইচ্ছা হল বন্ধন আর তার বিনাশ হলেই মুক্তিলাভ সম্ভব। যিনি সংসারী
 মানুষের মতো ব্যবহার করেও সব বিষয় থেকে নিবৃত্ত রাখেন, তিনিই মহা

হৃদের ন্যায় ক্ষোভশূন্য এবং ক্লেশহীন অবস্থায় বর্তমান থাকেন।

অষ্টাবক্রমুনির পরে অনেকেই বক্রেশ্বরে এসে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অঘোরীবাবা। তাঁর শরীর ছিল যথেষ্ট লম্বা চওড়া। অনেক তীর্থ ঘুরে তিনি বক্রেশ্বরে আসেন। সেই সময় বক্রেশ্বর মহাশূশান ছিল এখনকার মেয়েদের স্নানের ঘাটের পাশে। সেখানে খুব বড় একটি অশ্বথগাছ ছিল। ওই গাছের তলায় তিনি আশ্রম গড়ে তোলেন। চারদিকে পড়ে থাকত মড়ার খুলি। অঘোরীবাবা সবাইকে ভালোবাসতেন কিন্তু সহজে ধরা দিতেন না। তাঁর আহার ছিল শাশানে অর্ধদন্ধ নরমাংস আর মদ। শোনা যায়, একদিন কলকাতার কয়েকজন যুবক মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে অঘোরীবাবাকে খেতে দেয়। বাবা ওই যুবকদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বলেন, ‘আমি মদ খাই না, মায়ের নামে সুধা পান করি, বুঝলি এবং তাদের দেওয়া খাবার খেয়ে নেন। এরপর একটি পোড়া কাঠ নিয়ে তিনি ওই যুবকদের মারতে যান। তখন তারা পালিয়ে যান। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়। ভক্তের ওই আশ্রমেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করেন।

বক্রেশ্বরে সিদ্ধ হওয়া খাঁকিবাবা ছিলেন শিরের সাধক। তাঁর শরীর ছিল দীর্ঘ। তিনি ঢিলা পোশাক ব্যবহার করতেন। কোনও ভক্ত তাঁর কাছে গেলেই তিনি রেঁকিয়ে উঠতেন। তাই ক্রমে তিনি রেঁকিবাবা থেকে খাঁকিবাবা নামে পরিচিত হন। খাঁকিবাবার উদ্যোগে সেবায়তেরা সতীর দেহখণ্ডের শিলা যেখানে পড়েছিল তার ওপর ধাতুর মহিয়াসুরমন্দিনী মূর্তি স্থাপন করেন।

উচ্চস্তরের সাধক ছিলেন এই মহাযোগী, ~~কৃষ্ণন্দ~~ সখনও সখনও তাঁকে শ্বেতগঙ্গার জলে যোগাসনে বসে থাকতে দেখা যেত। একসময় কিছু মানুষ তাঁকে হত্যার চক্রান্ত করে। একদিন রাতে তারা বাবা'র গুহায় হত্যার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে দেখে তাঁর দেহ তিনখণ্ড হয়ে তিন জায়গায় পড়ে~~আছে~~। পরের দিন সকালে আবার তাঁকে সশরীরে দেখা যায়। এরপর এই দুষ্টীরা খাঁকিবাবার পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বাবাও তাদের ক্ষমা করে দেন। এরপর কিছুদিন বক্রেশ্বরে থাকার পর তিনি বৈদ্যনাথ ধামে দেহত্যাগ করেন। ভক্তেরা তাঁর দেহ সেখান থেকে নিয়ে এসে বক্রেশ্বরে শ্বেতগঙ্গার উত্তরদিকে সমাধিস্থ করেন। পরবর্তী সময়ে সেখানে সমাধিমন্দির তৈরি হয়। ১৩২০ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ তাঁর জীবনাবসান হয়।

কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটের হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় খাঁকিবাবার ভক্ত ছিলেন। বাবার ইচ্ছানুসারে শ্রী মুখোপাধ্যায় একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩১ আশাঢ় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়।

শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভু একসময় বক্রেশ্বরে এসেছিলেন। হাড়াই পণ্ডিত এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতী বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে বসবাস করতেন। তাদের সাতটি ছেলে হয়। তারা হলেন, নিত্যানন্দ, কৃষ্ণনন্দ, সর্বানন্দ, ব্ৰহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্ৰেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। নিত্যানন্দ ছেটবেলা থেকে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আজন্ম প্ৰেম

লক্ষ্য করে অভিভূত হন গ্রামের মানুষজন। বাংলা ৮৮০ সালে এবং ১৩৯৫ শকাব্দে মাঘ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। নিত্যানন্দের উপনয়নের পর এক সন্ন্যাসী তাদের বাড়িতে আসেন, এবং তাঁকে দীক্ষা দেন। সন্ন্যাসীর নাম শ্রীপদ টিশুরপুরী। কিছুদিন পরে তিনি নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বের হন। বৃন্দাবনে থাকার সময় কৃষ্ণ দর্শনের জন্য নিত্যানন্দের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দকে নির্দেশ দেন বিয়ে করে সংসারধর্ম পালন করার।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ কালনার সূর্য দাস পশ্চিতের দুই মেয়ে বসুধা ও জাহবীকে বিয়ে করে খড়দহে বসবাস করতে শুরু করেন। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়। ছেলের নাম বীরচন্দ্র এবং মেয়ের নাম গঙ্গা। বক্রেশ্বরে নিত্যানন্দ প্রভু'র বক্রেশ্বরে আগমনকে উপলক্ষ করে ভক্তেরা খ্রেতগঙ্গার উত্তরদিকে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ বুধবার সকালে সিউড়ির ভবানীশঙ্কর দাসের বাড়ি (জগদীশ ভবন) থেকে কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে বক্রেশ্বরে এসেছিলেন শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওক্তার মাথ। সেবায়েত ভোলানাথ চক্রবর্তী তাঁকে মন্দির দর্শন করান।

প্রাথমিক পাণ্ডুলিপিতে এই পীঠের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরে উল্লিখিত হয়েছে। শিবচরিতে বক্রেশ্বরের নাম করেই পীঠবর্ণনা করা হয়েছে। পীঠ নির্ণয়ের মতে, এখানে দেবী সতীর মন পড়েছিল। কিন্তু অনেকের মতে, এখানে সতীর ভূ-মধ্য পড়েছে। মন্দিরে যে অষ্টাধাতুর দেবীমূর্তি আছে সে ছাড়াও ডিছি বক্রেশ্বর গ্রামে পাণ্ডার বাড়িতে আর একটি মূর্তি আছে। এই দুটি মূর্তি তৈরির পিছনে রয়েছে এক বিচ্ছি ঘটনা। গৌড়ে সুলতানের সেনাপতি কালাপাহাড় একবার রাজনগরের পথে পশ্চিমদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কালাপাহাড়ের ভয়ে পূজারিয়া অষ্টাদশভূজা মহিষাসুরমন্দিনী মূর্তিটি একটি পুকুরে ঢুবিয়ে রেখে পালিয়ে আন। পরবর্তী সময়ে পুকুর সংস্কারের সময়ে মূর্তিটি পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে বক্রেশ্বরের মন্দিরে আর একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। তখন জনেক পূজারি পাথরের প্রাচীন মূর্তিটিকে ডিহি বক্রেশ্বর গ্রামে তাদের বাড়িতে রেখে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : রেলপথে বোলপুর, সিউড়ি বা দুবরাজপুর হয়ে বাসে অথবা গাড়িতে বক্রেশ্বরে যাওয়া যায়।

সৃষ্টিতীর্থ কামাখ্যা

১৯৮২ সাল। প্রথমবার পা রাখলাম অসমের মাটিতে। একটি বিশেষ কাজে দু'দিন সেখানে থাকার কথা। সঙ্গে ছিলেন আরও দু'জন। সংখ্যাধিক্যের জয় সর্বত্র। এক্ষেত্রেও তাই হল। দু'জনে সিঙ্গাস্তে তৃতীয়জনও সঙ্গী হলেন গুয়াহাটির কামাক্ষা মন্দিরে। সময় বিকেল তিনটে। পা চালাতে হল তাড়াতাড়ি। কারণ, সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। পাহাড়ের নীচে অবধি যাওয়ার জন্য যানবাহনের অভাব নেই। আজকাল পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের চাতালের কাছে বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড় কেটে তৈরি করা রাস্তা বেশিদিনের নয়। অতীতে হেঁটে উঠতে হত। এখনও কোনও কোনও পুণ্যার্থী বেশ পুণ্য অর্জনের তাগিদে হাঁটা পথ দিয়ে নীলাচল পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত মন্দিরে এসে পৌছান।

এক সময় এসে পৌছালাম মন্দিরের ভিতরে, অনেকটা নীচে। পাণ্ডুদের হাঙ্গামা নেই। বাড়তি তাগাদা নেই পুজো করিয়ে দেওয়ার জন্য। চারদিকে অর্থাৎ মন্দিরের চাতালে অবাধে, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অগুণতি পায়রা। জানা গেল, এদের দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হয়েছে। তাদের আর কেউ নিপীড়ন করতে পারবে না।

সতীর অঙ্গ এখানে পড়ায় জায়গাটি মহাপীঠে পরিগত হয়েছে। এখানে পড়েছে তাঁর যোনিমণ্ডল, তাই এই জায়গাকে বলা হয় ‘সৃষ্টিতীর্থ’। দেবী কামাখ্যা। যোনিমণ্ডলের দৈর্ঘ্য একবাহু, প্রস্ত্রে দ্বাদশ আঙুলি, যোনি মধ্যে আপাতাল জল। পুরোহিতের নির্দেশে সেই জল স্পর্শ করে মাথায় দেওয়ার সময় নামে ভেসে এল এক বিচ্বরি গন্ধ, যা সন্তুষ্ট বিবাহিতরাই অনুভব করতে পারবেন। বুঝতে অনুবিধা হয়নি, এখানে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন দেবী কামাক্ষা। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম সোনার টোপর দিয়ে ঢাকা আছে যোনিমণ্ডল।

কামরূপের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানান পৌরাণিক কাহিনী। এখানকার যে সবচেয়ে প্রাচীন রাজার কথা জানা যায়, তার নাম মহিরঙ্গ দানব। একই বংশে ছিলেন, হউক অসুর, সম্বর অসুর ও রত্ন অসুর। ঐতিহাসিকদের অনুমান, যেখানে তাদের নামে ‘অসুর’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই তারা ছিলেন অনার্য।

যেনিমণ্ডল কামরূপে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের রং হয়ে যায় নীল এবং তার ভার সহ্য করতে না পেরে ক্রমশই তা পাতালে চলে যেতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে বন্দু, বিষুও ও মহেশ্বর তাদের শক্তি দিয়ে পাহাড়ের পতনরোধ করতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু তাতেও কাজের কাজ কিছু হল না। তখন ভার বহনের দায়িত্ব স্বয়ং মা কামাক্ষা। একসময় এই পাহাড়ের উচ্চতা ছিল একশো মোজন। এখন মাত্র এক ক্রেশ উচ্চতায়, বিরাজ করছে। তিনি ভাগে বিভক্ত এই পাহাড়। পূর্বদিকে বঙ্গা পাহাড়, মধ্যখানে শির পাহাড় বা নীল পাহাড় আর পশ্চিমদিকে বিষ্ণু বা বরাহ পাহাড়। সমগ্র নীল পাহাড়কে অনেকে কামাখ্য পাহাড় বলে থাকেন।

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দং মহাগিরৌ।
কামাখ্য প্রোচ্যতে দেবী নীলকুট রহোগতা ॥
কামদা কামিনী কামা কাস্তা কামাঙ্গদায়নী।
কামাঙ্গানাশিনী যস্মাং
কামাখ্যাতেন চোচ্যতে ॥

অর্থাৎ ‘এই মহাদেবী অভিলাষ পূরণের জন্য আমার সঙ্গে নীলকুটে আসায় নাম লাভ করেছে কামাখ্য। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কাস্তা, কামাঙ্গদায়নী আবার কামাঙ্গানাশিনী। এজন্যই দেবীকে বলা হয়, কামাখ্য। পাহাড়ের যেখানে যোনিমণ্ডল পড়েছিল তার নাম কুজিকা। বলাবাহ্ল্য, সেখানে পড়ামাত্রই তা পাথরে পরিণত হয়ে যায়। স্থানীয় মানুষজনের বিশ্বাস, এই যোনিমণ্ডলের ওপরে লোহা রাখা হলে মুহূর্তে তা ছাই হয়ে যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যোনিমণ্ডলের পরিমাণ হল, দৈর্ঘ্যে ২১ আঙুল, বিস্তৃতি প্রস্থে $\frac{1}{2}$ (আধ) হাত। মা কামাখ্য প্রতিদিন পূজিত হন, পঞ্চ কামিনীরপে। তাঁকে বলা হয় কামাখ্য, ত্রিপুরী, কামেশ্বরী, সারদা এবং মহোৎসাহা। মায়ের চারদিকে আছেন আটজন যোগিনী—বিঞ্চ্যাবাসিনী; পুষ্টা, দীর্ঘেশ্বরী, কটিশ্বরী, গুপ্তকামা, শ্রীকামা ও পাদদুর্গা। যোনি ঢাকা থাকে লালশালুকে। কারও কারও ধারণা, প্রতিমাসে কামাখ্য মা এখানে রজস্বলা হন। অনন্দামঙ্গলে বলা হয়েছে,

মহামুদ্রা কামরূপে রঞ্জযোগ যায়।

রামানন্দ তৈরব কামাখ্য দেবী তায় ॥

সতীর দেহ শরীর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মহাদেব ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু ধ্যান ভাঙ্গার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। তখন দেবতারা সেই ধ্যান ভাঙ্গানোর জন্য কামদেবকে পাঠালেন। কিন্তু মহাদেবের তেজে তিনি ভস্মীভূত হয়ে গেলেন। তখন তাঁর স্ত্রী দেবাদিদেবের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। প্রাণ ফিরে পেলেও আগের আকৃতি ফিরে না পাওয়ায় স্বামী স্ত্রী যৌথভাবে মহাদেবের আরাধনা শুরু করেন। দেবাদিদেব তখন কামদেবকে বললেন, তুমি নীলপর্বতে যোনিমঙ্গলের পাথরের মন্দির তৈরি করে দাও। মন্দির তৈরির কাজ যেদিন শেষ হবে, সেদিনই তুমি তোমার আগের চেহারা ফিরে পাবে। কামদেব শিবের আদেশে নীলপর্বতে সেই মন্দির তৈরির পর তাঁর আগের রূপ পেয়েছিলেন।

ওই মন্দিরের গায়ে চৌষট্টি যোগিনী ও অষ্টাদশ ভৈরবের মূর্তি খোদাই করা ছিল। কালে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। মন্দিরের কোনও চিহ্নই প্রত্যক্ষ করা যেত না। জ্যোতি ক্রমেই বিশাল জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়। সেখানে তখন বসবাস করত কোচ মেষজাতীয় অনার্য মানুষেরা। কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহের পরাক্রম নিয়ে কারও মধ্যে কোনও সন্দেহ ছিল না। অসমের অনেক ছেট ছেট রাজা তাঁর অধীনস্থ ছিলেন। একসময় তারাই একত্রিত হয়ে বিশ্বসিংহের বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত করে তাঁকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা করেন। বিশ্বসিংহ ও তাঁর ভাই শিবসিংহ বিদ্রোহী রাজাদের দমন করার জন্য পুবদিকে রওয়ানা হন। একসময় পথ হারিয়ে তারা নীলপর্বতের নীচে এসে উপস্থিত হন। তৃষ্ণার্গ হয়ে তাঁরা দু'ভাই কাছের মেষ বস্ত্রিতে গিয়ে বটগাছের তলায় এক বৃন্দাকে দেখতে পেলেন। তাঁর পরামর্শে রাজা ও তাঁর ভাই কাছের একটি টিবি ও ছেট ঝরনার জল খেয়ে তৃষ্ণ নিবারণ করলেন। তারপর ওই বৃন্দাটিকি ও ঝরনার জল দেখিয়ে বললেন, সামনেই আমাদের আরাধ্য দেবতা আছেন। আপনারা তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করবেন তিনি তাই মঞ্চুর করবেন। রাজা প্রণাম করে সহচরদের সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার অনুচরেরা সেখানে এসে উপস্থিত। দেবতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে রাজা ও তাঁর ভাই বৃন্দার কাছে পুজো দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বৃন্দাবললেন, পুজোর জন্য গঞ্জ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বলির জন্য ছাগ, সিঁদুর ও মেয়েদের পরিধেয় রঞ্জবন্ত ও অলংকার দিতে হবে। রাজা তখনই দেবীর কাছে প্রার্থনা করে বললেন, যদি তিনি যুক্তে জয়ী হন তাহলে সোনার মন্দির তৈরি করিয়ে দেবেন। কথিত আছে, স্বয়ং মা কামাখ্যা বৃন্দার ছদ্মবেশে সেদিন রাজাকে উপদেশ দেন। যুক্তে জয়ী হবার পর রাজা পণ্ডিতদের আহুন করে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। পণ্ডিতরা বললেন, নিশ্চয়ই ওই জ্যোতি একটি মহাপীঠ, যা এখন প্রকটিত হয়নি। তাঁর শাস্ত্র অনুসন্ধান করে জানালেন, ওই জ্যোতি মা কামাখ্যার অবস্থান। দেবাদিদেব যখন সতীর দেহ ছিন বিচ্ছিন্ন করে খণ্ডিত অংশগুলি বিভিন্ন জ্যোতি ফেলেছিলেন তখন মায়ের ‘যোনি’ সেখানে এসে পড়েছিল।

পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে,

“যত্র চ ভৈরবী দেবী যত্র নক্ষত্র দেবতা॥

প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র, মাতঙ্গী ত্রিপুরাস্ত্রিকা।

বগলা, কমলে তত্ত্ববনেশী সধুনিমী (সুধামিনী)।

এতানি নবপীঠানি শংসন্তি নবভৈরবাঃ।

এবং তু দেবতা সর্বা এবং তুদশ ভৈরবাঃ॥”

অস্ত্রচূড়ামণিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে শুধু কামাখ্যা নন, আরও আছেন ন'জন দেবী—শ্রীভৈরব, নক্ষত্রদেবতা, প্রচণ্ডচণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাস্ত্রিকা, বগলা, কমলা, ভূবনেশী ও সধুমিনী। সব মিলিয়ে এখানে ভৈরবও আছেন দশজন। তবে মা কামাখ্যার ভৈরব

হিসাবে যাঁকে চিহ্নিত করা হয় তাঁকে সবাই উমানন্দ নামে ডাকেন। ব্রহ্মপুত্রের মাঝে পাহাড়ের মধ্যে তাঁর অবস্থান। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে শিবানন্দ, রামানন্দ বা রাবণানন্দ নামেও অভিহিত করে থাকেন।

রাজা বিশ্বসিংহের নির্দেশে তাঁরই লোকজন ওই বটগাছটি কেটে মাটির টিবি ও ঝরনার সন্ধান করতে শুরু করেন। বৃক্ষারও অনেক খোঁজ করা হল। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। কিছুদিন খনন কাজ চালানোর পর যোনিমুদ্রাসহ মহাপীঠের সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রতিদিন দিনের বেলায় যে ইট গাঁথা হয়, রাত্রিবেলা তা খনে পড়ে।

একদিন রাতে রাজা স্বপ্ন দেখলেন, একজন কুমারী তাঁকে বললেন, তুমি যে সোনার মন্দির তৈরি করে দেবে বলেছিলে তার কী হল? রাজা বললেন, মা, এত সোনা তো আমার ভাণ্ডারে নেই। তাই কি করব? প্রত্যন্তে কুমারী বললেন, তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য প্রতিটি ইটের সঙ্গে এক রতি করে সোনা দিও।

পরের দিন দেবীর আদেশ অনুযায়ী ওইভাবেই মন্দির তৈরির ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর রাজা হলেন নরনারায়ণ। তিনি মা কামাখ্যার পুজো দিয়ে যুদ্ধ করতে বেরোতেন। একবার নরনারায়ণের ভাই শুক্রধ্বজ গৌড়ের রাজা সুলেমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দি হয়ে যান। সেবার তাঁরা মায়ের পুজো দেননি। ইতিমধ্যে ‘কালাপাহাড়’ কামাখ্যা মায়ের মন্দির ধ্বংস করে দেন।

মায়ের অপার যদিম নিয়ে শোনা যায় অনেক অলৌকিক কাহিনী। বন্দিশালায় শুক্রধ্বজ নিজের ভুল বুবতে পেরে মা কামাখ্যার চরণ ধ্যান করতে শুরু করেন। মা তাঁর স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দিয়ে বললেন, কালই তোমার মৃত্যির ব্যবস্থা করব। কাল রাজার মাকে সাপে কার্যান্বয়ে অনেক চিকিৎসা করিয়েই কোনও ফল হবে না। তখন তুমি রাজমাতাকে ভালো করে দিতে পারবে এবং সেইজন্য তোমার এব্যাপারে সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানাবে। তুমি ক্ষতস্থান শৰ্শ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজমাতা সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং তোমার মৃত্যি হবে। পরের দিন হ্রবছ সেই ঘটনা ঘটল। রাজার মা সুস্থ হয়ে শুক্রধ্বজ ও নিজের ছেলের হাত একত্র করে বললেন, আজ থেকে সব বগড়া ভুলে গিয়ে তোমার সহাদর ভায়ের মতো বসবাস করবে। তারপর নিজের ছেলেকে আদেশ দিয়ে বললেন, মণিমাণিক্য ও সৈন্য দিয়ে শুক্রধ্বজকে নিজের দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা কর। কিন্তু শুক্রধ্বজ একটি সোনার ডম্বুর নিয়ে বললেন, আমার আর কোনও মণিরহের প্রয়োজন নেই। সবই আমাদের আছে। শুক্রধ্বজ রাজা নরনারায়ণকে সব কথা জানালেন। রাজার আদেশে আবার মন্দিরের পুনঃনির্মাণ শুরু হল। দেব-দেবীর পুজো করার জন্য গোড়, কাশী, কান্যকুজ্জ, মিথিলা ও নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণদের আনামো হল। তাঁদেরই বংশধরেরা এখন পাণ্ডি হিসেবে পরিচিত। সহজায়ন গ্রহ চতুর্পীঠতত্ত্বে চার ধরনের পীঠ, আঘাতপীঠ, পরপীঠ, যোগপীঠ এবং গুহ্যপীঠের কথা বলা হয়েছে। বজ্রসন্ত বিভিন্ন ধরনের

যোগিনীদের সঙ্গে, উদাহরণস্বরূপ প্রজ্ঞাপারমিতা সঙ্গম করেছিলেন। এই সঙ্গমকে ঝঁঝিরা অধ্যাত্ম সঙ্গম বলে চিহ্নিত করে থাকেন। প্রজ্ঞাপারমিতাকে আদিবুদ্ধের এক ধরনের শুণের প্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তাই যোগিনীদের এই শুণের বুদ্ধের সঙ্গমের ওপর নির্ভর করে আধ্যাত্মিক শুণ্যতত্ত্বের বিষয়টি সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। বৌদ্ধ তত্ত্বে আজ্ঞাপীঠ ও পরপীঠের বর্ণনা আছে। অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদেব হেবজ্জতত্ত্বে এ-দেশের চারটি জায়গাকে পীঠস্থান বলা হয়েছে। সেগুলি হল, (১) জালন্দর (২) পূর্ণগিরি (৩) কামরূপ (৪) ওড়ডিয়ান। কালিকাপুরাণেও বর্ণিত আছে চারটি পীঠের কথা। সেগুলি হল, (১) ওড্রা (২) পূর্ণ শৈল (৩) কামরূপ (৪) জালশৈল। তাদের মতে, পশ্চিমদিকে ওড্রা হল কাত্যায়নী ও জগন্নাথদেবের পীঠস্থান। অর্থাৎ হেবজ্জতত্ত্বের ওড়ডিয়ান হল ওড়িশায়। দক্ষিণের পূর্ণশৈল পূর্ণগিরিতে দেবী পূর্ণশ্বরী ও ভগবান মহানাথের পীঠস্থান। (৩) কামরূপে দেবী কামেশ্বরী ও ভগবান উমানন্দের পীঠস্থান এবং জালশৈল অর্থাৎ জলন্ধরে দেবী চণ্ণী ও দেবাদিদেবের পীঠস্থান। বৌদ্ধ গ্রন্থ সাধনামালাতেও চারটি পীঠের উল্লেখ আছে। তবে সেখানে একটিতে বাদ দিয়ে নতুন একটি পীঠকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে যে চারটি পীঠের উল্লেখ আছে, সেগুলি হল, (১) শ্রীহট্ট বা শিরিহট্ট (২) কামরূপ (৩) পূর্ণগিরি (৪) ওড়ডিয়ান। জলন্ধরের পরিবর্তে এখানে শ্রীহট্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে সময় চারতত্ত্বে পীঠ বর্ণনায় বলা হয়েছে,

অথেদানিং প্রবশ্যামি জপার্থং ~~পীঠমুণ্ডম~~।

পূর্ণগিরিশ প্রথমুড়াজ্জ্যানিং দ্বিতীয়কম ॥

জালন্ধরং তৃতীয়শ্চ কামরূপং চতুর্থকম ।

মোগল সন্ন্যাট আকবরের দরবারের নবরত্নের অন্যতম আবুল ফজলের লেখায় পাওয়া যায়, তখন চারটি জায়গা সতীপীঠ হিসাবে চিহ্নিত হত। তাদের অবস্থান ছিল, (১) কামরূপে কামাখ্যা (২) তুলজা ভবানী বর্তমান মুম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণভাগে (৩) জালন্ধরী পাঞ্জাবে নাগরকোটের কাছে এবং (৪) বর্তমান উত্তর কাশ্মীরের শারদা তথা শার্দু।

কামাখ্যা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, সেখানে বলা হয়েছে একশো চল্লিশ জন মানুষের মাথা তাষ্পাত্রে রেখে দেবীকে পূজো করা হয়। কথিত আছে, ভোগী নামে একদল মানুষ একসময় বাস করতেন কামরূপে। ‘আই’ নামে জনৈক দেবীর উদ্দেশে তারা স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। গুহায় বাস করতেন সেই ‘আই’ নামের দেবী। শোনা যায়, তারা নাকি শুনতে পেতেন দেবী’র ডাক। তাই আশা করা যায়, অনেকের মতো কামরূপের দেবীও আদিম অধিবাসী তথা অনার্যদের ঈশ্বর ছিলেন। বিজ্ঞনের ধারণা, অঙ্গীক শব্দ ‘কামোই’-এর অর্থ হল দৈত্য; ‘কামোইত’ শব্দের অর্থ শয়তান। কারও কারও ধারণা, সাঁওতালদের দেবতা ‘কমরু’ থেকে কামাখ্যা শব্দের

উৎপত্তি হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, অধিকাংশ অস্ত্রশাস্ত্রে থাকলেও, মহাভারতে কামরূপ কামাখ্যার উল্লেখ নেই। চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এলাহাবাদে সমুদ্রগুপ্তের শৈক্ষণের গায়ে কামরূপের বর্ণনা করা হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্গের লিখিত বর্ণনায় জানা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে তিনি কিছুদিনের জন্য কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের (৬০০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দ) দরবারে ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঐতিহাসিকদের মতে, হর্ষবর্ধনের বন্ধু হিসাবে রাজা ভাস্কর বর্মণ কামরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার প্রভাবে কামাখ্যা মায়ের মাহাত্ম্য সাময়িকভাবেই চাপা পড়ে যায়। অনেকের ধারণা, একাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত হয়েছিল ‘কুন্দ্রযামল’ তত্ত্ব। এখানে দশটি পীঠের বর্ণনা করা হয়েছে :

মূলাধারে কামরূপং হৃদি জালন্ধরং তথা ।

লনাটে পূণগির্যাখ্যম ওড়ডিয়ানং তদুর্ক্ষকে ॥

বারাণসীং ভূবোর্মধ্যে জ্বলন্তীং লোচনত্রয়ে ।

মায়াবতীং মুখদ্বন্দ্বে কঠে মধুপুরীং ততঃ ॥

অযোধ্যাং নাভিদেশে চ কঙ্গাং কাঞ্চীং বিনির্দেশেবত্ ॥

দশেতানি প্রধানানি পীঠানি ক্রমতো বিদ্যঃ ।

ত্রু স্বদীর্ঘস্বরে বর্গের্গ ভ্যোন্তেঃ ক্রমতো ন্যস্তে ॥

আবার রাজা নরনারায়ণের কাহিনীতে ফিরে আসি। একদিন তিনি শুনলেন, সন্ধ্যাবেলা পুজোর সময় পুরোহিতকে মা কামাখ্যা দর্শন দেন। তিনি কামরূপের নীলপাহাড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণকে দেবীদর্শন করানোর জন্য কারুত্ব মিনতি করতে লাগলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সেই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। রাজার বারংবার অনুরোধে পুরোহিত বললেন, রাজামশাই, সন্ধ্যার সময় যখন মন্দিরের ভেতর থেকে ঘটাধ্বনি শুনতে পাবেন, তখন মা কামাখ্যার ভোগ-মূর্তির উত্তরে যে গুরাক্ষ আছে সেখান থেকে দেবীকে দর্শন করতে পারবেন। সন্ধ্যাবেলা পুরোহিত শুরু করলেন দেবীপূজা। রাজাও নির্দিষ্ট গবাক্ষে চোখ রাখলেন। হঠাতে দিব্য জ্যোতিতে ঘর প্রচণ্ড আলোয় ভরে গেল। বলসে গেল রাজার চোখ। ব্রাহ্মণের মুণ্ড টেনে ছিড়ে নিলেন দেবী আর রাজাকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, আজ থেকে তুমি বা তোমার বংশধর কেউ যদি এই পীঠস্থান দর্শন করা তো অনেক দূরের কথা, নীলপর্বতে উঠলেই তোমাদের বংশ লোপ পাবে। সেই থেকে কোচবিহারের রাজপরিবারের কেউ এই মহাপীঠে আসেন না। কামাখ্যা মায়ের কোনও প্রাকৃত দেবী মূর্তি এই পীঠে নেই। দেবীমূর্তিকে যিনি যেভাবে সেইভাবে কল্পনা করে মায়ের চরণবন্দনা করেন। তাঁর প্রণাম মন্ত্র হল,

কামাখ্যে বরদে দেবী নীলপর্বতবাসিনী ।

তৎ দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নমোহস্ততে ॥

এই ব্রহ্মরূপণী প্রকৃতি শক্তির প্রতীক হলেন কুমারী। কুমারী হল ঘোলো রকমের।

একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্থতী।
 ত্রিবর্ষা চ ত্রিধাতুমূর্তিশ তুবর্ষাতু কালিকা।
 সুভগ্নাপঞ্চবর্ষাতু ষড়বর্ষা চ উমা ভবেৎ।
 সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাদষ্ঠবর্ষা চ কুজিকা।
 নবভিঃ কালসন্দর্ভা দশভিশ্চা-পরাজিতা।
 একাদশে চ রূদ্রাণী দ্বাদশাদে তু ভৈরবী।
 অযোদশে মহালক্ষ্মী দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
 ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশাভিঃ- ঘোড়শে চান্দিকা স্মৃতা।
 এবং ক্রমেণ সম্পূজ্যা যাবৎ পুষ্পং ন বিদ্যতে॥

কথিত আছে, এই ত্রিভুবন সৃষ্টির আগে ব্রহ্মা নিজেই নিজেকে পুরুষ ও প্রকৃতি দু'টি
 ভাগে ভাগ করে দেন। হয়তো সেই সুবাদেই শিবলিঙ্গ ও যোনিমণ্ডলের পুজো হয়ে
 থাকে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ‘অহমেদ স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং, দেবে ভিকৃত মানুষেভিঃ।
 যৎ কাময়ে তৎ তবমুগ্রং কৃণোমি, তৎ সুমেধাম্।’ অর্থাৎ দেবী মা সমগ্র জগতের ঈশ্বর
 এবং তিনিই পরমব্রহ্ম। তিনিই সেরা। প্রাপক হিসাবে তিনি নানাভাবে অবস্থান করেন।
 দেবতা ও মানুষজনকে তিনি ব্রহ্মতত্ত্বের গৃঢ় রহস্য জানান। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি সেইভাবে
 সকলকে তৈরি করেন। এই অদ্য কুমারী হিসাবে চিহ্নিত হন।

সৃষ্টির শুরুতে সধবা হিসাবে পুজো করাৰ যৌবস্থা ছিল, যা আজও বিদ্যমান। একই
 সঙ্গে ভিন্ন নামে কুমারী রূপে তাঁৰ পুজো করার রীতিৰ প্রচলন হয়। কামরূপে
 মা কামাখ্যার যোনিমণ্ডল পড়ায় সাধকদেৱ মতে, সবচেয়ে শক্তি রয়েছে এই মহাপীঠে।
 কারণ, সৃষ্টির শুরু এখানেই একই মত অনেকে ব্যক্ত করেছেন একটু অন্যভাবে। তত্ত্বাস্ত্রে
 এই তথ্যের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা আছে মানবদেহেৰ মূলধাৰে আছে আত্মশক্তি
 কুণ্ডলিনী, যা সাড়ে তিনি পাক পেঁচিয়ে সবসময় ঘূমন্ত অবস্থায় বিৱাজ করেন। পদ্মেৰ
 কুঁড়িৰ মতো তাৰ আকৃতি। তিনিই আদি জননী। প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় এৱ সঠিক অবস্থান?
 বলা হয়, গুহ্যদেশ থেকে উঁচুতে আবাৰ লিঙ্গ মূল থেকে নীচে সুমুদ্রা এৱ অবস্থান।
 এই পদ্মেৰ কৰ্ণিকাৰ মধ্যে বজ্রনাড়িৰ মুখে আছে ‘ত্রৈপুর’ নামে একইৱেকম দেখতে
 ত্রিকোণ। এখানেই রয়েছে লাল জীবধাৰক কন্দৰ্প বাযু। শ্রীক্রমমতে এই ত্রিকোণ হল,
 কামাখ্যা যোনি এবং কন্দৰ্প অপানবাযু। রজস্তলা নারীৰ মধ্যে বিকশিত হয় নারী শক্তি।
 তত্ত্বাস্ত্রে শক্তিকে বলা হয়েছে ষোড়শী। সেই অর্থে মা কামাখ্যাও নিত্য ষোড়শী। বেদে
 অনুমতি ও রাকা পূর্ণিমার উল্লেখ আছে। এই রাকা পূর্ণিমাই হলেন নিত্যা ষোড়শী।
 রজঃপ্রবৃত্তিৰ দিন থেকে প্রতিদিন এক এক কলা করে সৌম্য আনন্দেৰ সৃষ্টি হয়। তাকেই
 তত্ত্বে বলা হয়েছে, কামকলা। ষোলোদিনেৰ দিন নারী হয় ষোড়শী, ব্ৰহ্মানন্দস্বৰপিনী,
 রাজৱারাজেশ্বৰী। উপনিষদে বলা হয়েছে, আনন্দো ব্ৰহ্মযোনিঃ। অম্বুবাচীতে কামরূপেৰ

কামাখ্যা পীঠে অনেক মানুষের সংমাগম হয়। ‘অস্মু’ শব্দের অর্থ জল। সেই থেকে সৃষ্টি হয়েছে অস্মুবাচী। অস্মুবাচীর সময় সূর্য আদ্রা নক্ষত্রের প্রথমপাদে থাকে। সূর্যের মৃগশিরা নক্ষত্রে তিন দিন কুড়ি দণ্ড হল অস্মুবাচীর সময়। অনেকের মতে, স্বয়ং পৃথিবী এই সময় রজস্বলা হয়। রাজ মর্ত্তণে উল্লেখ করা হয়েছে,

‘মৃগশিরসি নিবস্তে রৌদ্রপাদে অস্মুবাচী।

ঝাতুমতী খলু পৃথিবী।

ঝাতুমতী হৃস্বত্তমার্যম্॥’

রুদ্র্যামলে আছে,

‘প্রাবৃটকালে সমায়াতে রৌদ্রঝক্ষনাতে রবো।

নারীবেধ সমায়োগে জলযোগং বদাম্যহম্॥’

অর্থাৎ রবি বা সূর্য আদ্রা নক্ষত্রে উপস্থিত হলে বর্ষা আসবে। সেই সময়ে নাড়ীবেধ হলে আমি তোমাকে বর্ষাকালের যোগ বলব। অনেক রাজ্যের কুষকেরা এই সময় জমির ‘আল’ বেঁধে রাখে। কারণ, ভালো বৃষ্টি হলে কৃষিকাজে সুবিধা হয়। অস্মুবাচীর সময় পৃথিবী ঝাতুমতী হন বলে ওই সময় মাটি খোঁড়া হয় না।

অমিয় কুমার মজুমদার তাঁর ‘সতীপীঠ পরিক্রমা’ বইতে লিখেছেন, অথর্ববেদে ১২।১।১২ সূক্তে পৃথিবীকে মাতা বলা হয়েছে। ঋকবেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তে এবং প্রথম মণ্ডলের ১৮৪ সূক্তে দ্যাবা পৃথিবীর স্তুতি আছে। এখানে পৃথিবীকে মাতা এবং দেবী দুই-ই বলা হয়েছে। সৃষ্টির মূলধার হলেন ‘কাল’। কালেই সমগ্র বিশ্ব প্রাপকের সৃষ্টি-স্থিতিলয় হয়। তাই কালের অমোঘ নিয়মে প্রতি বছর যিথুনরাশিতে আষাঢ় মাসে সূর্য আদ্রা নক্ষত্রে এলে অস্মুবাচী হয়ে থাকে। কালিপুরাণে আছে—

‘নীলকুটে য়া সার্কুলী দেবী রহস্যী সংস্থিতা।

সত্যাস্ত পতিতৎ তত্ত্ব বিশীণং যোনিমণ্ডলম্॥

শিলাত্মগমৎ শৈলে কামাখ্যা তত্ত্ব সংস্থিতা।

সংস্পৃশ্য তাঁ শিলাঁ মর্ত্যোহ্যমর্ত্যত্ব মবাপ্যুৎ।

অমর্ত্যো ব্রহ্মসদনং তত্ত্বস্ত্রো মোক্ষমাপ্যুৎ।

তস্যাঃ শিলায়া মাহাত্ম্যৎ যত্র কামেশ্বরী স্থিতা॥

গরুড়পুরাণে কামরূপের কামাখ্যা মহাতীর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ‘কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্ত্ব তিষ্ঠতি।’ যোগিনীতন্ত্রে বলা হয়েছে, এই জায়গাটি আক্ষরিক অর্থে দেবী ক্ষেত্র। রাধাতন্ত্রে কামরূপকে ‘ব্রহ্মার মুখ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টির পর ব্রহ্মা এখান থেকে নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন বলে এই জায়গাটির নাম হয়েছে প্রাগ জ্যোতিষপুর। কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে, কামদেব মহাদেবের ক্রোধে ভগ্নীভূত হবার পর এখানে তপস্যা করে দেবাদিদেবের কৃপালাভ করেন বলে, এই জায়গার নাম হয়েছে কামরূপ। কামরূপের উত্তর সীমায় রয়েছে কঙ্গগিরি, পশ্চিমদিকে করতোয়া নদী, পূবদিকে দিক্ষুনদী

এবং দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰনদত্ত লাক্ষ্মানদীৰ সঙ্গমস্থল। সমগ্ৰ কামৰূপ অঞ্চলটি ত্ৰিকোণাকৃতি। চওড়ায় একশো যোজন, লম্বায় ত্ৰিশ যোজন।

প্ৰতিবছৰ অস্বুৰাচী শুৰু হওয়াৰ মুহূৰ্ত থেকে ছেড়ে যাওয়া পৰ্যন্ত কামাখ্যা মায়েৰ মন্দিৱ বন্ধ থাকে। এই তিনদিন মন্দিৱেৰ বাইৱে পুজো ও ভোগেৰ আয়োজন কৰা হয়। অস্বুৰাচী শুৰু হওয়াৰ আগে নতুন চেলিকাপড় দিয়ে দেবীপীঠ আচ্ছাদিত কৰা হয়। চতুর্থদিনে দৰজা খোলাৰ পৰ দেখা যায়, ওই আবৱণ্টি রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে। বলাবাহল্য, এসবকিছুই নিৰ্ভৰ কৰে মানুষেৰ বিশ্বাসেৰ ওপৰ।

ভগবান কৃষ্ণ তাঁৰ উৱৰ মধু ও কৈটে নামে মহাপুৱাক্রমশালী দুই অসুৱকে রেখে তাদেৰ মাথা কেটে ফেলেছিলেন। সেই উৱচিহ্নই পাণুনাথ নামে এখানে রয়েছে। শোনা যায়, পাণুবদেৱ অজ্ঞাতবাস শ্ৰেষ্ঠ হওয়াৰ পৰ তাঁৰা রাজ্য ফিৰে পাবাৰ জন্য ব্ৰহ্মপুত্ৰেৰ জলে স্নান কৰে মা কামাখ্যাৰ কাছে রাজ্য ফিৰে পাবাৰ জন্য প্ৰার্থনা কৰেছিলেন। এখানে পূৰ্ব দিক দিয়ে উঠলে ধনলাভ হয়, উত্তৰদিক দিয়ে উঠলে মুক্তি, পশ্চিমদিক দিয়ে উঠলে রাজ্য লাভ এবং দক্ষিণ দিক দিয়ে উঠলে রাজত্ব চলে যায় ও মৃত্যু হয়।

মায়েৰ উদ্দেশ্যে পাণুবদেৱ দ্বাৰা উচ্চারিত মন্ত্ৰ হল,

নমস্তে পাণুবে মহাভৈৱৰ রূপিণে।

অনুজ্ঞাং দেহি মে নাথ কামাখ্যা দৰ্শনং প্ৰাপ্তি।

পাণু নাথেৰ উদ্দেশ্যে পাণুবেৱো প্ৰার্থনা কৰে বলেছিলেন,

পাণুনাথ নমস্তে হস্ত নমস্তে মোক্ষকাৰকঃ

আহি মাং সৰ্বলোকেশ বিশুদ্ধনূপ নমোহস্ততে॥

মা কামাখ্যাৰ মন্দিৱে কুমাৰী পুজোৰ প্ৰচলন অনেকদিন থেকে আছে। এদেৱ বয়স হতে হবে, পাঁচ থেকে বাঁৰো বছৰেৱ মধ্যে। কামাখ্যায় দেবী কুমাৰী রূপে বিৱাজ কৱেন একথা আগেই উল্লেখ কৱা হয়েছে।

প্ৰণাম মন্ত্ৰ হল,

ওঁ জগৎপুজ্য জগদ্বন্দ্যে সৰ্বশক্তি স্বৱন্দিপিনি।

পুজাং গৃহণ কৌমাৰি জগন্মাতৰ্ণ মোহস্ততে॥

যানি যানিহ পাপানি জন্মান্তৰকৃতানিচ ! তানি তানি বিনশ্যতি প্ৰদক্ষিণ পদে পদে— এই মন্ত্ৰপাঠ কৰে ভদ্ৰেৱা মন্দিৱ প্ৰদক্ষিণ কৱেন। এখানে দশমহাবিদ্যাৰ মন্দিৱ ছাড়া কামেশ্বৰ শিব, আশ্রাতকেশৰ শিব, সিদ্ধোশ্বৰ শিব ও কমলোশ্বৰ বিষুণ—এই চারটি মন্দিৱ আছে। ব্ৰহ্মপাহাড়ে আছে ভুবনেশ্বৰী মন্দিৱ।

কামাখ্যা মায়েৰ মন্ত্ৰ হল,

কামাখ্যাং কামসম্পন্নং কামেশ্বৰীং হরিপ্ৰিয়াম

কামানাং দেহি মে নিত্যং কামেশ্বৰী নমোহস্ততে॥

প্ৰণাম মন্ত্ৰ :

কামাখ্যে বরদে দেবী নীলপর্বতবাসিনী।

তৎ দেবী জগতাং মাতৰ্যোনিমুদ্রে নমোহস্ততে ॥

সৃষ্টিতীর্থ কামাখ্যা'র সম্পর্কে নানান তথ্য পরিবেশনের ফাঁকে অসমের কিছু বিষয় এখানে গৃহিত হল। অসমের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাকি অংশের সংযোগ ঘটে ব্রিটিশ আমলে। তবে এখানকার কথা বর্ণিত আছে রামায়ণে। সীতাকে রাবণ চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পরে সুগ্রীব যুথপতিকে বলেছিলেন, তুমি সহস্র বানরকে সঙ্গে নিয়ে পূবদিকে সীতা ও রাবণের সঞ্চান করো।

এ প্রসঙ্গে কবি কৃত্তিবাস বলেছেন,

ব্ৰহ্মপুত্ৰ তৱি রঙ্গে কৱিহ প্ৰবেশ।

মন্দৰ পৰ্বতে যাইও কিৱাতেৰ দেশ ॥

শুধু রামায়ণ নয়, মহাভারতেও প্রাগজ্যে তিষ্পুর, অর্থাৎ বর্তমান অসমের উল্লেখ আছে। শোনা যায়, মহাভারতের যুগে অসম, অসুর বংশের রাজাদের শাসনাধীন ছিল। রাজার নাম ছিল নরকাসুর। মহাভারতে কৌরব পক্ষের ভগদন্তের কথা উল্লেখ আছে দ্রোণাপৰ্বের ২৯ অধ্যায়ে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে অর্জুন সুশৰ্মা'র ভাইদের বধ করেন। তখন প্রাগজ্যাতিষ্পুরের মহাবীর ভগদন্ত অর্জুনকে আক্রমণ করেন হাতির পিঠে চড়ে। শুরু হল দুই মহাবীরের সম্মুখ সমর। একসময় ভগদন্ত অর্জুনের বুকে লক্ষ্য করে বৈষ্ণব-অঙ্গুশ অস্ত্র নিষ্কেপ করেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতে এই অস্ত্রের দাপট সহ্য করার ক্ষমতা পার্থ'র নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার স্থানকে আড়াল করতে তা নিজের বুকে গ্রহণ করেন। সেই বৈষ্ণবশাস্ত্র স্বয়ং নারায়ণের বুকে আঘাত করে পরিণত হল বৈজয়স্তীমালায়। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে ভগদন্তের চেলে বজ্রদন্তের কথা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। শোনা যায়, বর্তমানে অরুণাচলের সদিয়ার কাছে একটি রাজত্ব ছিল, যার নাম হল বিদর্ভ। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন রুক্ষিনীর বাবা ভীম্যক। রুক্ষিনীকে শ্রীকৃষ্ণ হরণ করে দ্বারকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আধুনিক অসমের ইতিহাস জানা যায় খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় (৪৩০-৬৬৩ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এখান রাজত্ব করেছেন বর্মন বংশীয় রাজারা। ৬৬৪ থেকে ৭৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলটি স্তুত বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। পাল বংশীয় রাজারা অসমে রাজত্ব করেন ১০০০ থেকে ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তার পরে শাসন করেন দেব বংশীয় রাজারা। এরপর শাসনভার গ্রহণ করেন আহোমরা। নেতৃত্বে ছিলেন সুকাফা। ইতিহাসবিদদের মতে, আহোমরা 'তাই' এবং 'শান' উপজাতীয়দের বংশধর। তারা নিজেদের 'তাই' অর্থাৎ দেবতার বংশধর বলে চিহ্নিত করতেন।

এ-সম্পর্কে একটি কাহিনীও শোনা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পঙ্গ-এর (সেখানকার আদি অধিবাসী ছিলেন আহোমরা) রাজত্ব নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সেই

সময় সুকাফা সুবিধা করতে না পেরে ন'হাজার বিভিন্ন বয়সের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ইরাবতী উপত্যকা ও পাটকৌ পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ঘূরে বেড়াতেন। একসময় সুকাফা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পাটকৌ পাহাড় পার হয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকায় চলে আসেন। তখন স্থানীয় অধিকাংশ উপজাতীয়রা তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নেন। ১২৬৮ সালে সুকাফা প্রয়াত হন। সিংহাসনে বসেন তাঁর ছেলে সুতোফা। এইভাবে আহোমরা এখানে রাজত্ব করেন ১২২৮ থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ। ১৮২৪ সাল থেকে অসমে ব্ৰিটিশদের রাজত্ব শুরু হয়। তবে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানকার শেষ রাজা পুৱনৰ সিংহ ব্ৰিটিশদের আগ্রিত হিসাবে আপার-অসমে রাজত্ব করেছেন।

আহোমরা প্রথমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকার নাম রাখেন সুনখান অৰ্থাৎ সোনালি বাগানে ভৱা দেশ। অনেকের মতে, যেহেতু এই রাজ্যের জমি অসমান তাই জায়গাটির নাম হয় 'অসম'। পৰবৰ্তী সময়ে মোগল আমলের লেখকেরা আহোমদের রাজ্যকে 'আসাম' বলে সম্মোধন করেন।

এ প্ৰসঙ্গে ডক্টুৱ বি. কাকতি বলেছেন, Assam might have come from asama which in its turn was the Sanskritisation of achom meaning undefeated or unconquered.'

ডক্টুৱ সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'The word Aham... is just an indian modification of Burmese, Rham.'

মহাকবি কালিদাসের কাব্যে প্রাগজ্যোতিষ পুৱ ও কামৱন্প দু'টি নামেৱই উল্লেখ আছে। কালিকাপুৱাণেও একই তথ্য পাওয়া যায়। সন্তুষ্ম শতাব্দীতে পরিব্ৰাজক যুয়ান চোয়াঙ অসমের সম্পর্কে লিখেছেন, "The climate is soft and temperate. The manners of the people are simple and honest. The men are of small stature and their complexion a dark yellow. Their language differs a little from that of mid-India. Their nature is very impetuous, their memories are retentive and they earnest in study... The king is fond of learning and the people are so like-wise in imitation of him. Men of his talent from distant regions, seeking after office, visit his dominion."

পৰ্যটক আল বিৰুনি বলেছেন, 'Thence we come to mountains of Kamru which streteh away as far as the sea.'

তেজপুৱের কাছে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি থেকে জানা গেছে, কেবল গুণ্ঠ স্থাপত্য কলা নয়, নবম শতাব্দী থেকে অসমে গুণ্ঠাদেৱ প্ৰচলন হয়েছিল। এছাড়াও জানা গেছে, রাজা সুকাফা শিবসাগৱের কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূৰ্বদিকে সৱাইদেও নামে একটি জায়গায় প্রথম রাজধানী স্থাপন কৱেন। তাৱপৰ রাজধানী হয় গড়গাঁও, রংপুৱ, শিবসাগৱ এবং শেষকালে জোড়হাট।

* * *

সমতল থেকে কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার জন্য যে গাড়ির রাস্তাটি আছে তা তৈরি হয় ১৯৫৮ সালে। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তখনকার কেন্দ্রীয় গৃহসন্তুষ্টি গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এই রাস্তার উদ্বোধন করেন। তবে অতীতে এখানে যে পায়ে হাঁটা রাস্তা ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ আছে, ‘The path is steep and the rocks have worn to a slippery smoothness by the feet of pilgrims... huge people and rubber trees cast their shadows over the path. At either end it passes through an archway of fine masonry, and here and there the rocks along the side have been hewn into the semblance of quaint Hindu gods.’

বর্তমানে কামাখ্যা একটি শহর হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর উচ্চতা ৯৬১ ফুট। অবস্থান ২৬°১০ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৯১°৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমায়। আয়তন ২.৫৯ বর্গকিলোমিটার।

কামরূপের আগের নাম ছিল মর্ধারণ্য। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন তন্ত্র ও পুরাণে কামরূপের নামের উল্লেখ আছে। কালিদাসের ‘রঘুবংশম’-এ কামরূপ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যোগীনিতন্ত্রের মতে, পুরাকালে কামরূপ—কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও সৌমারপীঠে বিভক্ত ছিল।

কামাখ্যা মাঘের মন্দিরের সামনে একটি কুণ্ড আছে যাকে বলা হয় সৌভাগ্যকুণ্ড। এটি দেবতাদের ক্রীড়াপুস্তরিণী হিসাবে পরিচিত। কথিত আছে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা এই কুণ্ডটি খনন করেন। কুণ্ডের মাঝে একটি পাঁচিল আছে। পাঁচিলের একপাশের জল দেবীর স্থান, ভোগ ও পুজোর জন্য ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে প্রাচীরটি ভেঙে যায়। পরে দ্বারভাঙার মহারাজা সেতি আবার তৈরি করিয়ে দেন।

কামাখ্যার উল্লেখযোগ্য উৎসব হল, দুর্গাপূজা, পৌষবিয়া, বাসন্তী ও অসুৰবাচী। পৌষবিয়া হল, কামাখ্যা দেবীর সঙ্গে কামেশ্বর শিবের বিবাহোৎসব। তবে আষাঢ় মাসে অসুৰবাচীতে সবচেয়ে বড় উৎসব হয়। হিন্দু দেবতা মা কামাখ্যা অনেকের মতে, প্রাক-আর্য যুগের দেবী। এ প্রসঙ্গে হেম বরঞ্জা লিখেছেন, distinctly tribal in its traits and ideal...it is relic of the pre-Aryan sex worship that was a part of the ancient social organisation of the tribal people.

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ কামাখ্যা দর্শনে এসেছিলেন। মা'কে দর্শনের পর অসুস্থতার জন্য তিনি সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করেছিলেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও স্বামীজী গুয়াহাটিতে তিনটি বড়তা দিয়েছিলেন। সেখানে থেকে তিনি শিলং-এ যান এবং খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসমের সেইসময়ের চিফ কমিশনার স্যার হেনরি কটন স্বামীজীর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেন।

উমানন্দ মা কামাখ্যার সদাজাগ্রত তৈরব। ব্ৰহ্মপুত্ৰের মাঝে একটি দীপে পাহাড়ের ওপর অবস্থান করেন উমানন্দ। দ্বিপাটি দেখতে অবিকল ময়ুরের মতো। ইংৰেজৰা এই

জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন ‘Peacock Island’। ওই পাহাড়ে উর্বশীকুণ নামে একটি জলাশয় আছে। কামাখ্যা মায়ের জন্য উর্বশী, স্বর্গ থেকে এখানে অমৃত নিয়ে এসেছিলেন। যোগিনীতত্ত্বে বলা আছে, মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ওই কুণ্ডে স্নান করলে অশ্রমেধ্যজ্ঞের ফল হয়। আহোমরাজ গদাধর সিংহের নির্দেশে গঙ্গা সন্নিকটে বরফুকণ ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির তৈরি করান।

অসমের ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচশ মাইল। এর মধ্যে নাব্য প্রায় সাতড়ে চারশো মাইল। এখনাকার সব নদী যথা দিবং, লুহিত, দিয়ো, ডিহিং, ঝাঁজি, ধনঙ্গী, দিশং, কুলসী, সুবনগিৰি, ভৱলু, মাস, সক্ষোস ও ধৱল ব্ৰহ্মপুত্ৰে এসে মিশেছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰের অধিকারে আছে তিনিক্ষ একষটি হাজার বর্গমাইল। অসমের ইতিহাস তথা সংস্কৃতি সবকিছুতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰের সঙ্গে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কামাখ্যা মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ। এক এক জায়গায় প্রশস্ত প্রায় ছ'মাইল। যোগিনীতত্ত্বে বলা হয়েছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰের জলে একবাৰ স্নান কৰলেই সমস্ত পাপ ধূয়ে যায়। তাই ব্ৰহ্মপুত্ৰকে অনেকে তীর্থৰাজ বলেও সম্মোধন কৰেন।

* * *

বৰাহ অবতারে নারায়ণের ঔরসে ধৱিত্রীর গর্ভে নৱকাসুরের জন্ম হয়। মা ধৱিত্রী, দেবতাদের কাছে ছেলেকে নিয়ে গেলে তিনি তিরস্ত হন। তখন ধৱিত্রী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রাগে-দুঃখে ছেলেকে যথাযথভাবে গঠন কৰে কামৰূপে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত কৰেন। মা ধৱিত্রী ছেলেকে দেবতাদের অসম্মানের কথা মনে কৰিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার পরামৰ্শ দেন। তবে ধৱিত্রী বলেছিলেন, ‘বৎস স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও অত্যাচার কৰবে না। যদি কৰ তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। তা না হলে নারায়ণের বৰে তুমি অমুর। কেউ তোমার ক্ষেপণ স্পৰ্শ কৰতে পারবে না।’ মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নৱক দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ কৰে তাঁদের বন্দি কৰে ধৱিত্রীদের কাছে এনে হাজিৰ কৰেন। দেবতারা তখন পিতামহ ব্ৰহ্মার শৰণাপন্ন হলেন। পিতামহ তাঁদের কামাখ্যা মায়ের শৰণাপন্ন হওয়ার পরামৰ্শ দিলেন। দেবতারা ধ্যান শুরু কৰলেন মায়ের। এদিকে যতদিন যায়, নৱকও আৱে অত্যাচাৰী হয়ে উঠল। তবে তিনিও কামাখ্যা মায়ের পৱন ভক্ত ছিলেন, তবে তাঁৰ পুজো কৰত আসুৱিক পদ্ধতিতে।

দেবতাদের বাঁচাতে এবং নৱকাসুরের আয়ু শেষ হয়ে আসছে দেখে মা কামাখ্যা ছলনার উদ্দেশ্যে অপূৰ্ব সুন্দৱীৰ রূপ ধৰে তাৰ সামনে উপস্থিত হলেন। দেবীৰ অপৱৰ্প সৌন্দৰ্য মোহিত হয়ে নৱকাসুৰ তাঁকে পত্নীৰূপে কামনা কৰলেন। দেবী ছলনা কৰে বললেন, এক রাতেৰ মধ্যে যদি আমাৰ এই পাহাড়েৰ চারদিকে চারটি পথ ও পাথৱেৰ তৈৰি একটি বিশ্রামাগার তৈৰি কৰে দিতে পাৰ তাহলে আমি তোমাৰ শৰ্ত পূৱণ কৰিব। রাতেৰ মধ্যেই চারটি পথ তৈৰি হয়ে গেল। বিশ্রামাগারেৰ কাজ শুরু হল। এসব দেখে দেবী চিন্তিত হয়ে গেলেন। তখন মায়াৰ সাহায্যে একটি কুকুট (মোৱগ) তৈৰি কৰালেন।

হঠাৎ-ই সেই কুকুট ডেকে উঠল। দেবী নরকাসূরকে বললেন, অসুর, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারো নি। অসুর সঙ্গে সঙ্গে সেই মোরগটিকে মেরে ফেলল। তখন কামাখ্যা মায়ের আদেশে ভগবান বিষ্ণু নরকাসূরকে মেরে ফেললেন। আগেই বলা হয়েছে, দেবী এখানে কুমারীরূপে বিরাজ করছেন। কুমারীর ধ্যানমন্ত্রিটি হল,

ওঁ বালকপাঞ্চ ত্রেলোক্যসুন্দরীঁ বরবণিম্।

নানালক্ষারনস্তাঙ্গীঁ ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্॥

চারু হাস্যাং মহানন্দ হৃদয়াৎ চিন্তয়েৎ শুভাম্॥

কুমারীরূপে কল্পনা করে আরও বলতে হয়,

ওঁ মন্ত্রাক্ষরময়ীঁ দেবীঁ মার্ত্তণাং রূপধারিণীম্।

নবদুর্গাপ্রিকাং সাক্ষাৎ কন্যামাবহয়াম্যহম্॥

উপনিষদে মাতৃগর্ভ এবং উৎপত্তিস্থান অর্থে যোনি'র ব্যবহার করা হয়েছে। কেনো উপনিষদ (২।১২।৭), শ্রেতাশ্রতের উপনিষদ (১।১।৩, ৪।১।১) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১।৪।১৬) শ্লোকে এ-বিষয়ের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে যজ্ঞবেদিকেও ‘যোনি’ বলা হয়েছে। নিরক্ষুতস্ত্রে বলা হয়েছে। ‘যোনিশ জনিকা মাতা লিঙ্গশ জনকঃ পিতা। মাতৃভাবং পিতৃভাবমুভয়োরপি চিন্তরেৎ’। অর্থাৎ জগতের জনিকা মাতা যোনি, জনক পিতা লিঙ্গ। যোনিকে পীঠ বলা হয়েছে। এই পীঠই হল কামরূপ। তন্ত্রমতে পূর্ণগিরি, উড়ীয়ান, জালঙ্কর এবং কামরূপ—এই চারটি পীঠে দেবী পূর্ণরূপে বিরাজমানা। বিজ্ঞজনের মতে, শক্তির সমস্ত দেহ হল পূর্ণগিরি পীঠ, মস্তক উড়ীয়ান, স্তনদুটি হল জালঙ্কর এবং যোনি হল কামরূপ পীঠ। বৌদ্ধ ‘হেবজ্জ’ তন্ত্রে চারটি পীঠের উল্লেখ করা হয়েছে, জালঙ্কর, ওড়িয়ান (উড়ীয়ান), পূর্ণগিরি ও কামরূপ। মধ্যযুগে লেখা বজ্জ্যানমতের বৌদ্ধ গ্রন্থ ‘সাধনমালা’-তে চারটি পীঠের নাম পাওয়া যায়— ওড়িয়ান, পূর্ণগিরি, কামরূপ ও সিরিহট্ট (শ্রীহট্ট)।

বাংলার তন্ত্র সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরি ও তাঁর শিষ্য পূর্ণানন্দ গিরির নামের কামরূপ পীঠের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। এঁদের আবির্ভাব কাল ষোড়শ শতাব্দীতে। ব্রহ্মানন্দগিরির গুরুর নাম ত্রিপুরানন্দ। শোনা যায়, নিজের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে মদমত হয়ে ব্রহ্মানন্দ গুরুকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন। তখন গুরু তাকে অভিসম্পাত দেন। পরে গুরুর কাছে ক্ষমা চেয়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করলে তিনি প্রসন্ন হয়ে বলেন, তুমি যদি উপযুক্ত উত্তর সাধক নিয়ে কামাখ্যা মহাপীঠে সাধনা করতে পার তাহলে সিদ্ধিলাভ করবে।

ব্রহ্মানন্দগিরি উত্তর সাধকের সন্ধানে একসময় এসে উপস্থিত হন মৈমনসিংহ জেলার কাটিহালি গ্রামে। সেখানে পিতৃমাতৃহারা বালক জগদানন্দের মধ্যে গুরু নির্দিষ্ট সব লক্ষণ দেখতে পেলেন। উত্তরকালে তিনিই পূর্ণানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হন। একসময় গুরু ও শিষ্য একসঙ্গে তন্ত্র আলোচনা করে কামাখ্যা মহাপীঠের স্থান চিহ্নিত করেন এবং

তার উদ্ধারে ব্রতী হন। পূর্ণানন্দ, শুরুর আদেশে শুরুর আগেই সিদ্ধিলাভ করেন। কামাখ্যাতস্ত্রে আছে, কামাখ্যা দেবী যোনিরূপণী মহাবিদ্যা। তিনি আনন্দপ্রদা, বরদায়িনী, নিত্য এবং মহাসম্পদ বৃদ্ধি করিণী। তিনি জননী আবার তিনি রমণী ও ত্রাণকর্ত্রী। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও মঙ্গলময়ী। দেবী কামাখ্যা রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, বরদানে উদ্যতা, নিষ্কলঙ্ঘ। তাঁর মুখমণ্ডল সুধাময় ও অলকদামের দ্বারা পরিবেষ্টিত। দেবীর দেহে আছে স্বর্গমাণিক্য খচিত গহনা। রজ্ঞাখচিত সিংহাসনে তিনি উপবিষ্ট। দেবী সর্বদা হাস্যরতা। পদ্মরাগ মণির মতো তাঁর অনুপম কাস্তি। সন্তানের জন্য তিনি পয়োধরা। কৃষ্ণবর্ণ, চোখ আকণ্বিস্তৃতা। কামাখ্যা তন্ত্রের তৃতীয় পটলে আছে, কামাখ্যা দেবীর ধ্যান করলে দারিদ্র্য নাশ হয়। মা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পূজ্য। তিনি বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির স্বরূপ। তিনিই আবার কামদাত্রী কামিনী। জগন্মাতাকে সবসময় ঘিরে রাখেন কামিনীরা। তিনি ত্রিয়ননা, হাতে পুষ্পধনু ও বাণ। তিনি অশোষ গুণসম্পন্না এবং মঙ্গলদায়িনী। ডাকিনী, যোগিনী ও বিদ্যাধরী তাঁকে ঘিরে থাকেন। বলাবাহল্য, অনেক বিদ্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন তিনি।

তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে, কামরূপে শুধু মা কামাখ্যাই নন, আছেন আরও ন'জন দেব-দেবী— শ্রীভৈরব, নক্ষত্রদেবতা, প্রচণ্ড চণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরাস্ত্রিকা বগলা, কমলা, ভুবনেশ্বী ও সুমুনি। আর আছেন দশজন ভৈরব।

দেবীর বাহন শ্বেত-প্রেত, রক্তপদ্ম ও সিংহ। তিনিই প্রকৃতি আবার তিনিই উৎপত্তি। দেবীকে ধরে আছেন ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও মহাদেব। ব্রহ্মা হলেন রক্তবর্ণ পদ্ম, বিষ্ণু হলেন সিংহ এবং শিব হলেন শ্বেতবর্ণ প্রেত। সিংহের ওপরে রক্তপদ্ম, তার ওপরে শব, শবের ওপরে অবস্থান করছেন মা কামাখ্যা। যিনি দেবী দুর্গা-মহামায়া, তিনিই মা কামাখ্যা। তাই ঋষিরা তাঁর ধ্যানের মেঘ স্থৃতি করেছেন তা হল নিম্নরূপ:

ওঁ কামেশ্বরি জগন্মাতাঃ সচিদানন্দবিগ্রহে।

গৃহাণার্চাস্ত্রিম্বাঃ প্রীত্যা প্রসীদ পরমেশ্বরী॥

এর অর্থ হল, মা কামাখ্যা, তুমি আমার প্রার্থনা তথা পুজো গ্রহণ করো। হে পরমেশ্বরী, তুমি প্রসন্না হও।

কালিকাপুরাণে ত্রিপুরাদেবীর বর্ণনা আছে। সিঁদুরের মতো লাল, তিনটি চোখ, চারটি হাত, বাঁদিকের ওপরের হাতে পুষ্পধনু ও নীচের হাতে বই, ডানদিকের ওপরের হাতে পাঁচটি বাণ, নীচের হাতে অক্ষমালা। চারটি শবের ওপরে একটি শব রেখে, তার পিঠে দাঁড়িয়ে জটাজুট হয়ে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে সমানভাবে রাখা কেশ, নগ্না, অপূর্বসন্দরী, সর্ব সুলক্ষণা।

দ্বিতীয় ত্রিপুরা মূর্তি রক্তবর্ণা, জটাজুট সমন্বিতা, সর্বলক্ষণ যুক্তা, ভূষিতা রয়েছেন নানান অলক্ষণে। দেবী যোনিমুদ্রার প্রতি ঈষৎ হাস্যযুক্ত নবযৌবনসম্পন্না। তাঁর মৃণালের মতো ভুজ চারটিতে গ্রস্ত, অক্ষমালা, অভয় ও বরমুদ্রা। তিনি শ্রব্দরজা সূর্যের আভা সমন্বিতা এবং মুগুমালাধারিণী। তিনি কল্পদ্রুমাবলম্বনে সংস্থিতা, কদম্ব উপবনে স্থিতা, শুভদায়িনী

এবং কামাহলাদকরণ।

মা কামাখ্যার তৃতীয় মূর্তি হলেন দেবী কামেশ্বরী। চুলের রং নীল। স্নিফ শান্ত আকৃতি। তাঁর দুটি মুখ, বারো হাত, আঠারোটি চোখ, দুটি মাথা রয়েছে। প্রতিটি মাথার ওপর রয়েছে অর্ধেক চাঁদ। মায়ের ডানদিকে দুটি হাতে বই, সিঙ্কসুত্র, পঞ্চবাণ, খড়গ, শত্রিঃ, শূল থাকে। বাঁদিকের হাতগুলিতে থাকে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, অভয়মুদ্রা, চর্ম, পিণাক ও কোদণ্ড। দেবী কামেশ্বরীর ইশান কোণ, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম উত্তর ও মাঝখানের মাথার বর্ণ যথাক্রমে সাদা, লাল, পীত, হরিৎ, কালো এবং নানান বর্ণ বিশিষ্ট। সাদা মুখ মহেশ্বরীর, লাল কামাখ্যায়, পীত-ত্রিপুরা, হরিৎ শারদা, কৃষ্ণবদন কামেশ্বরী এবং বিচ্ছিন্নবর্ণের মুখ হল দেবী চৌমু।

সিংহের ওপর শ্বেতবর্ণের একটি প্রেত, তার ওপর লাল রঙের পদ্ম। এই পদ্মের ওপরে দেবী কামেশ্বরী হাসিমুখে বসে আছেন। পরগে বামের ছাল। কালিকাপুরাণে সিদ্ধি কামেশ্বরী ও সর্বকামেশ্বরী দেবীর ধ্যানমন্ত্রও আছে।

দেবী কামাখ্যার চতুর্থ মূর্তি হল শারদা দেবী সিংহবাহিনী দুর্গা। পূজিতা হন শরৎকালে।

মায়ের পঞ্চম মূর্তি হলেন মহোংসাহা বা দেবী মহামায়া। বৈষ্ণবী তন্ত্রের মন্ত্র দিয়ে পুজো করা হয়। তাঁর স্বর্ণকমলের ন্যায় মণ্ডল সপ্তপাতালে প্রবেশ করেছে। পদ্মটি বিস্তৃত রয়েছে ব্রহ্মলোক থেকে পৃথিবী পর্যন্ত। এর চুলের রঙ কাঞ্জিনবর্ণ। এই স্বর্ণ কমলের ওপর মহামায়ার অধিষ্ঠান। মাথায় সোনার ও নামান রংত্বঘচিত মুকুট আছে। ত্রিনেত্র তিনি রঙের। সাদা, কালো ও লাল।

কালিকাপুরাণে মা কামাখ্যার মূর্তিভূন বহস্যের বর্ণনা করা হয়েছে :

‘একৈবে তু মহামায়া কার্য্যার্থং ভিন্নতা গতা।

কামাখ্যা^(তৃতীয়) মহামায়া মূলমূর্তিঃ প্রগীয়তে।

পীঠে ভিন্নত্বয় সা তু মহামায়া প্রগীয়তেঃ॥

এক এব যথা বিশুণ নিত্যত্বাদি সন্নাতনঃ।

জনা নার্মদনাং সো হপি জনার্দন তি শ্রতঃ॥

তৈথেব সা মহামায়া কামার্থাং সঙ্গতা গিরো।

কামাখ্যাতি সদা দেবৈর্গদ্যতে সততং নরেঃ॥

যাতায়াতের ব্যবস্থা : গুয়াহাটি শহর থেকে কামাখ্যা ৮ কিলোমিটার পথ। শহর থেকে মূলমন্দির অবধি গাড়ি ও বাস যায়। রাস্তা থেকে ৩২০টি সিঁড়ি ভেঙে পায়ে হেঁটে মন্দিরে পৌছানো যায়। শিলিগুড়ি থেকে গুয়াহাটির দূরত্ব প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার। বিমানে কলকাতা থেকে গুয়াহাটিতে যেতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টা।

থাকার ব্যবস্থা : কামাখ্যা পাহাড়ে মন্দিরের পাশে পাঞ্জাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। গুয়াহাটিতে অনেক ভালো ও বিভিন্ন দামের ভালো হোটেল ও লজ আছে।

কেতুগ্রামের বহলা মা

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহলা। পীঠ নির্ঘয়ের দ্বাদশ পীঠ হিসাবে এই স্থানটির বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনায় আছে,

বহলায়ং বামবাহৰহলাখ্যং চ দেবতা।

ভীরকো দেবতাস্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥

কেতুগ্রাম বাসস্টপে নেমে মিনিট আট-দশ ইঁটলেই গ্রামের মধ্যে দেবীর মন্দিরে পৌছে যাওয়া যাবে। এখানে ভৈরব হচ্ছেন ভীরুক। এ সম্বন্ধে কবি ভারতচন্দ্র রায় লিখেছেন,

বাহলায় বামবাহৰ ফেলিলা কেশব।

বাহলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥

অন্নদামঙ্গলে বহলা-র স্থানে বাহলা লেখা হয়েছে এবং পীঠদেবীর নাম বলা হয়েছে বাহলা চণ্ডিকা। গ্রামে মধ্যে খুব পুরনো দেবীর যে মন্দির আছে, সেটির নতুন বললে অতুল্যিক্ত করা হবে না। সমতল ছাদ। ছেট মন্দির। দেবীর মূর্তি স্থাপন করা আছে একটি কালো পাথরের ওপর। মন্দিরের পূজারি নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানালেন, আমি বারো বছর যাবৎ এই মন্দিরের পুজো করছি। মন্দিরটি বৃত্তমানে একটি ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালনাধীন। তারাই আমায় মায়ের পুজো কর্তৃর জন্য মনোনীত করেছেন। এটি একান্ন পীঠের একটি পীঠ। এখানে মায়ের বামবাহৰ পড়েছে। সেইজন্য দেবীর নাম বাহলক্ষ্মী। মায়ের প্রণাম মন্ত্রে বলা আছে,

বহলায়ং চতুর্ভুজং পতিপুত্রসমন্বিতাম

নমস্তে ভীরুকপত্না সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী॥

অর্থাৎ ভুক্তের যে কোনও মনোবাঙ্গ তিনি পূর্ণ করেন। মায়ের পাশে রয়েছে অষ্টভুজ গণেশ। তিনি সর্বসিদ্ধিদাতা। পশ্চিমবঙ্গে এ-ধরনের একটি গণেশেরই সন্ধান পাওয়া যায়। শোনা যায়, অন্যান্য তিনিটি রাজ্যে নাকি এ-ধরনের গণেশ আছে। শ্রীচট্টোপাধ্যায় আরও বলেছে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের উত্তর পুরুষদের কাছে একই মূর্তি বর্ণনা করেছেন। অতীত ঐতিহ্য অনুযায়ী মহানবমী তিথিতে এখনও মোৰ বলি দেওয়া হয়। পাশাপাশি ছাগল বলিও দেওয়া হয়। দোলের সময় পাঁচ-সাতদিন ধরে উৎসব চলে। সেই সময় এখানে অনেক ভক্তসমাগমও হয়ে থাকে। এখানে মায়ের মন্দিরে যে পুকুর আছে সেখানে

স্নান করলে যে কোনও রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে অনেকের বিশ্বাস। মায়ের স্বপ্নপ্রদত্ত ঔষধ পাওয়া যায়। সেটি ধারণ করে অনেকে দুরারোগ্য অসুখ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বিনাপয়সায় এই স্বপ্নীৰ্বাধ মন্দির থেকেই দেওয়া হয়। মহানবমীর যে মোষবলি দেওয়া হয় তার বাঁট বা কান কেটে তা থেকে মায়ের স্বপ্নীৰ্বাধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অহ্মলশূল, মহিলাদের সূতিকা ইত্যাদি অসুখও এই বিশেষ ঔষধে নিরাময় হয়ে যায়। এখানে মায়ের নিত্য পুজো হয়। সকাল ছটায় সময় মন্দির খোলা হয়। তারপর মন্দির পরিষ্কার হলে বেলা দশটার সময় মায়ের পুজো শুরু হয়। দুপুর বারেটার সময় অন্নভোগ দেওয়া হয়। তারপর সন্ধ্যার সময় আরতি করা হয় মা'কে। এখানে ভৈরব মায়ের মধ্যেই আছে। যে প্রণাম মন্ত্রের কথা বলা হয়েছে, সেখানে উল্লেখ দেবী পতিপুত্র সমস্তিতাম অর্থাং পতি ও পুত্র সহযোগে তিনি এখানে বিরাজ করছেন। অন্নদামঙ্গ লে এই স্থানের উল্লেখ আছে। তাছাড়া ‘তত্ত্বাভিলাষী সাধুসঙ্গ’ নামক বইতে এই সতীপীঠ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। দেবীর বাঁদিকে আছেন মা লক্ষ্মী। মায়ের মূর্তির ডানদিকের একটি হাত ভাঙ। মুখ ছাড়া সর্বাঙ্গ শাড়ি দিয়ে ঢাকা থাকে। অনেকদিন আগে রাও পদবিধারী জমিদারেরা বহুল দেবীর প্রতিষ্ঠাতা। এখনকার ‘রায়’ পদবিধারী সেবাইতরা তাদের বৎসর।

বহুলা দেবীর উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিনি হাত। দেবীর ধ্যান মন্ত্র হল,

ধ্যায়েচ্ছু বহুলাং নগেন্দ্রতনয়াঃ

পদ্মাসনস্থাঃ শুভ্রাৎ।

দোভিঃ কম্ফতিকাঃ বরাভুঃ মুক্তাঃ

(ত্রিময়নাং) বামে স্বপুত্রান্তিতাম্॥

গৌরঙ্গীঃ মাণহারকঠ নমিতাঃ

চিন্ত্যাং সুখাং কামদাম্॥

অর্থাং হিমালয়সুতা পদ্মাসনাস্থিতা মঙ্গলা শ্রীবহুলাকে ধ্যান করবে। তাঁর চার হাতের মধ্যে এক হাতে কাঁকুই, অন্য দুই হাতে বর ও অভয়, বামপাশে নিজের ছেলে।

প্রাচীনত্বের হিসাবে কেতুগ্রামের বয়স অনেক। শোনা যায়, এই গ্রামে একসময় ভূপাল নামের তিলিবৎশজাত এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক ছেলের নাম হল চন্দ্রকেতু। সেই চন্দ্রকেতুর নামেই জায়গাটির নাম হয় কেতুগ্রাম। অনেকে মনে করেন, কেতুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নানুরের বিশালাক্ষী-বাশুলীদেবীর উপাসক চণ্ডীদাস। সেখানেই ছিল তাঁদের আদি বাসস্থান। কেতুগ্রামের উত্তরদিকের একটি জায়গাকে আজও স্থানীয় মানুষজন চণ্ডীভিটা বলে সম্মোধন করেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু'র মতে, শিবচরিতে যে জায়গাটিকে রণখণ্ড নামে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি মরাঘাট নামে পরিচিত। অনেকের ধারণা, এখানেই বহুলা মা'র বামবাহু পড়েছিল। এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী 'কাঁদর' আছে। ব্রহ্মখণ্ডে এই ছেট শ্রোতসিনী নদীকেই 'বকুলা'

বা বহুলা বলা হয়েছে। এই ব্যবহার স্থানীয় প্রাঞ্জ মানুষ দক্ষিণাপদ চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে ধরাধর চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আমার বাবার দাদু এই মরাঘাট-মহাতীর্থ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর নাম কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি সেখানে অনেকদিন থেকে সাধনা করেন। যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন তখন মহামায়ার নামে আমাদের কিছু সম্পত্তি দিয়ে যান। সেই থেকে মহামায়া দুর্গার নামেই সেখানে পুজো হয়। তবে কার্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে সম্পত্তি দিয়ে যান তা দিয়ে পুজোর খরচ নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। আমাদের পরিবারের সবাই মিলে বাকি খরচের জোগান দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোর সময় সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন সেখানে বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। নবমীর দিন বলি হয়। অনেকে বলেন, ওই জায়গাটি নাকি কোনও একসময় শুশান ছিল। তবে এর স্বপক্ষে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। শোনা যায়, অনেক সময় ছোট ছোট শিশুরা মারা গেলে নদীর ধারে পুঁতে দেওয়া হত। আমরাও শুনেছি, সুন্দূর অতীতে সেখানে মৃতদেহ দাহ করা হত। তবে তা কতদিন আগে হত তা বলা সম্ভব নয়। এখন আর এ-ধরনের কোনো কাজ সেখানে হয় না। শিবরাত্রির দিনে সেখানে এক বিশেষ উৎসব হয়। আমাদের পারিবারিক উদ্যোগেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। মরাঘাট মহাতীর্থে অনেক সিদ্ধপুরুষ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। অনেকে আবার সেখানে দেহত্যাগও করেছেন। ন্যূনতম একজন সাধু সেখানে সর্বদাই থাকেন। শুনেছি, মহামায়ার কাছে মানসিক করে অনেকে শারীরিকভাবে আরোগ্য লাভ করেছেন। ওখানে ঘটে পুজো করা হয়। সেখানে গেলেই বোৰা যাবে, ওই জায়গাটি মৃত্তি বেঁচে পুজো করার পক্ষে আদর্শ স্থান নয়। মহাপীঠ হতে হলে তার কাছাকাছি উত্তরবাহিনী নদী থাকা প্রয়োজন। এই মরাঘাটের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী ঈশানী নদী। আমার এক দাদার নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি একধৰি~~সে~~ সেখানে সাধনা করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। শোনা যায়, সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। কিন্তু তার সঠিক অবস্থান আজও জানা যায়নি। দাদা গদাধর সেখানে গিয়ে জপ-ধ্যান করার সময় হঠাৎই অঙ্গন হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে পাবার পর তিন-চারদিন তিনি প্রায় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন। সেখানে কী ঘটনা ঘটেছিল এ-কথার কোনও সন্দৰ্ভে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। আর একজন তান্ত্রিক সাধু অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, তিনিও অনেকদিন সেখান সাধনা করেছেন। তাঁর কাছেই শুনেছি, সেখানে কোনও কোনও সময় সমগ্র জঙ্গল আলোয় ভরতি হয়ে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে তা মিলিয়ে যায়।

মরাঘাটে স্বামী ওক্ষারানন্দ জানিয়েছেন, এখানে মা বহুলা, মা জয়দুর্গা ও মা দুর্গার নামেও পুজো হয়। কমপক্ষে একশো বছর আগে স্থানীয় পণ্ডিত গিরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই ধ্যান রচনা করেন। স্থানীয় মানুষেরা ভৈরবকে ডাকেন ভূতনাথ নামে, শাস্ত্রীয় নাম ভৌরূক। শাস্ত্রে বলা আছে,

নমস্তে ভৌরূকায় ভূতনাথ নাম ধারিনে।

বহুলাক্ষ্মী তৈরিবায় সদা শ্রীখণ্ডবাসিনে ॥

শুন্দশিব স্বরূপায় আনন্দঘন মৃত্যে ।

লোকাপাবন কারণায় নমস্ত্বজ্যম পুনঃপুনঃ ॥

মহাপীঠ হওয়ায় শাস্ত্রীয় শর্ত অনুসারে এই মরাঘাটের পাশ দিয়ে যেমন বয়ে চলেছে উত্তরবাহিনী ঈশানী নদী, তেমনই এক যোজনের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ম্ভু শিব ভীরুক।

প্রায় আড়াই দশক আগে জনৈক সন্ন্যাসী এই জায়গাটি সংস্কার করেন। এখানে যে মন্ত্রে পুজো হয় তা হলঃ

বহুলায়ঃ বামবাহ বহুলাক্ষা চতুর্ভূজা

ভীরুক তৈরবস্তোত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী ॥

ছবিবশ-সাতাশ বছর আগেও এখানে শিবাভোগ হত। এখানে একটি ঘণ্টা ছিল। ঘণ্টাধ্বনি শোনার সঙ্গে এখানকার প্রতিটি পাথি কিচকিচ করে ডেকে উঠত। তাদের প্রত্যেককে মায়ের ভোগ দেওয়া হত। এখানে মায়ের কোনও মূর্তি নেই তবে মা দুর্গার রূপ আঁকা আছে। আমাদের গুরুদেবের ধারণা, এই মরাঘাট মহাপীঠে দেবীর দেহের খণ্ডিত অংশ পড়েছিল। তিনি বলেছেন, এই জায়গাটিই যে মহাপীঠ তার সব লক্ষণই এখানে বর্তমান। তাঁর কাছেই শুনি এক অভূতপূর্ব ঘটনা। একদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন ধরে। কাঁদরের জল এপার থেকে ওপারে উপছে পড়ছে। একই সঙ্গে মুহর্মুহ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সন্ধ্যা হওয়ার সময় গুরুদেব মায়ের মন্দিরে দীপ দেখানোর জন্য একটি ছোট লণ্ঠন হাতে নিয়ে মন্দিরের কাছে আসার পর বিদ্যুৎ চমকানো আলোয় দেখতে পেলেন, সামান্য দূরত্বে জনৈকা দিগন্বরী নারী দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করামাত্র ‘বাঁচাও-বাঁচাও’ শব্দের বিকট চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এই রাতের বেলায় কী করে কোনও নারী এখানে উপস্থিত হতে পারেন? তিনি যদি বিপন্নই হবেন তাহলে আমি যখন লণ্ঠন হাতে এলাম তখনই তো বলতে পারতেন। তিনি ঘরের থেকে বের হলেন না। মনে মনে ঠিক করলেন, যদি কারও প্রয়োজন হয় তাহলে সে এখানেই আসবে। তারপর আর কোনও শব্দ শোনা যায়নি, কেউ আসেও নি। আর একদিনের ঘটনা গুরুদেবের কাছে শুনেছি। একদিন এখানে একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষ এসে দরজা ভেঙে সবকিছু তচ্ছচ করে শিবের ত্রিশূল নিয়ে চলে যায়। গুরুদেব সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পরের দিন সব শুনে তিনি বললেন, আর কেউ নন, মায়ের তৈরব এসেছিলেন মন্দিরে।

মরাঘাট মন্দিরের ডানদিকে পৃথক ঘরে লিঙ্গরূপ মহাদেব বর্তমান। কিন্তু কেতুগ্রামের পীঠস্থানে দেবীর তৈরব ভীরুক নেই। কারও কারও মতে, তিনি আছেন শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডে কেতুগ্রাম থেকে খুব দূরে নয়। এখানেই জন্মগ্রহণ করেন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্শ্বন নরহরি সরকার ও আরও কয়েকজন বৈষ্ণব সাধক। সম্ভবত এই জন্যই এখানে বৈষ্ণব ভক্তদের

প্রভাব যথেষ্ট। শ্রীখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শ্রীশ্রীখণ্ডেশ্বরী। তাঁর থান রয়েছে খণ্ডেশ্বরী তলায়। গ্রামের উত্তরপ্রান্তে রয়েছে অনাদি লিঙ্গ ভূতনাথ। এই মন্দিরটি আপাতভাবে নতুন দেখালেও দেওয়ালে লাগানো পাথরের ফলকে রাজা রাজবঞ্চির নাম আছে। পুরোনো মন্দিরেও ফলকটি ছিল। কালো পাথরের অমসৃণ ভূতনাথ শিবলিঙ্গের পাশেই রয়েছে বটুক ভৈরব ও দুর্ধুরাম নামে দুটি শিবলিঙ্গ। এখানে প্রতিবছর গাজনের উৎসবে মেতে ওঠেন অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ। স্থানীয় মানুষেরা প্রাণতোষিণী তন্ত্রকে উল্লেখ করে বলেন, এই ভূতনাথ শিব-ই হলেন কেতুগ্রামের দেবী বছলার ভৈরব ভীরুক। আগেই বলা হয়েছে, প্রাণতোষিণী মন্ত্রে আছে—

নমস্তে ভীরুকায় ভূতনাথ নাম ধারিণে,
বছলাক্ষ্মী ভৈরবায় সদা শ্রীখণ্ড বাসিনে।

তবে মরাঘাটে এলে মনটা যে অন্যরকম হয়ে যাবে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে তাই প্রায়শই ঘটে চলে নানান অলৌকিক ঘটনা। রাত দুটো। পুজোর পরে চোখে পড়ল শিবলিঙ্গের পাশে রয়েছে বড় একটি সাপ। আর একদিন সন্ধ্যারতি করার সময় সাধুবাবার চোখে পড়ল শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করে আছে একটি সাপ। আরতি শেষ করে শঙ্খধ্বনি করার পর আর তাকে দেখা গেল না। ওই জায়গায় রয়েছে অনেক বিষাক্ত সাপ। কিন্তু তারা কোনোদিন মন্দিরের সেবাইত বা সন্ধ্যাসীদের অনিষ্ট করেছে বলে শোনা যায়নি। স্থানীয় মানুষজন ওই এলাকা থেকে কাউকে সাঞ্চ ধরতেও দেন না। দেখেশুনে মনে হয়, সাপেরাও জানে এই তাদের নিরাপদ অঞ্চল। এক সময় শিবাভোগ হত এখানে। এখানে এলে চোখে পড়বে তার বিশেষ চিহ্ন। একসময় এই মরাঘাটে পাকা মন্দির বলে কিছু-ই ছিল না। ক্রমে ক্রমে ভঙ্গদের উদ্যোগে স্থায়ী মন্দির গড়ে উঠেছে। তবে দেখলে বোঝা যাবে, সে-ও অনেকদিন আগের কথা।

মরাঘাটের মন্দির প্রাঙ্গণে কোনও ঘড়ি ছিল না। কিন্তু সেবায়েত তথ্য সাধু বাবাদের প্রতি নির্দেশ ছিল সূর্য ওঠার আগে স্থান সেরে পুজোয় বসতে হবে। এজন্য কোনও কোনও দিন তারা ভুল করে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে পড়তেন। স্বামী শিবানন্দ বললেন, এক সময় ‘বড় বাবা’ বললেন, রাত চারটে থেকে চারটে পনেরোর সময় একটি ঘুঘু ডেকে ওঠে। একথা শোনার পর সাধুবাবারা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সেই ডাক শুনতে পেয়েছেন। আর ছিল একটি বাদুড়। সেও ঘড়ির কাজ করত সঠিক সময়ে। জানা গেছে, এই অলৌকিক পরিবেশে অনেক মহাপূরুষই বিচরণ করেছেন। অনেকেই পরবর্তী সময়ে শুনতে পেয়েছেন খড়ম পায়ে চলার আওয়াজ। তাই সাধুজনের মতে, এটি একটি জাগ্রত পীঠস্থান।

মরাঘাটের সাধুবাবার কাছে ৫১ পীঠের এক বিচ্চির ব্যাখ্যা জানা গিয়েছে। তিনি বললেন, ৫১ কোনও আলাদা বিষয় বা স্থান নয়, এক অল্প থেকে ৫১-র উৎপত্তি। এক ব্যক্তি যেমন বিভিন্ন নামে অভিহিত হন, তেমনই মায়ের পীঠ বা আসনের ব্যাপ্তি

এক অথবা বহু। কোথাও হিংলাজ আবার কোথাও কেতুগ্রাম। অর্থাৎ তিনি রয়েছেন বিশ্বব্যাপী। সর্বত্রই তাঁর বিচরণ। তিনি মায়ারূপে বহু রূপ ধারণ করেছেন। আসলে তিনি এক, ভিন্ন রূপে ৫। তাঁর বাইরে আমাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। সেজন্য সব পীঠস্থানই জাগ্রত। আলাদাভাবে বিশেষণে ভূবিত করে সেগুলিকে ক্ষুদ্র করা অনুচিত। কারও মানত থাকলে তারা এখানে এসে পশুবলি দেন। তবে নিয়মিত এখানে বলি হয় না। স্থানীয় ভাষায় হাঁড়িকাঠকে বলা হয় ‘ফসলা’। অনেকের মতে, বহুলা দেবী গ্রামের মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাঁর সেবার জন্যই বহুলাপুর জায়গাটি নির্দিষ্ট ছিল। তন্ত্রচূড়ামণি ও শিবচরিত মতে, ওই জায়গাটির নাম ‘বহুলা’ এবং সেখানে সতীর বামবাহু পড়ায় একে মহাপীঠ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাচ্যতন্ত্রবিদ নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বর্ধমানের ইতিকথা (১৩২১) বইতে লিখেছেন, ‘দেবী এবং তাঁহার বর্তমান মন্দিরের পার্শ্বস্থ পুষ্পরিণীর ঘাটে যে সকল পুরাতন কাটা পাথর পড়িয়া আছে, তাহা দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।’ কারও কারও মতে, বহুলাক্ষী ও অট্টহাসের (বর্ধমান) ফুলের এই দুটিকে নিয়ে যুগ্মপীঠ। নরেন্দ্রনাথ বসু কিন্তু এই মতকে সমর্থন করেননি। তিনি বলেছেন, ‘যাঁহাকে তাঁহারা এখন বহুলাক্ষী বলিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত নাম বহুলা। বহুলা ও বহুলাক্ষী দুই ভিন্ন মূর্তি।’

শিবচরিতের মতে, যেখানে সতীর ডান কনুই পড়েছিল ~~সেখানকার~~ নাম রণঘণ। শক্তি তথা তৈরবীর নাম বহুলাক্ষী, তৈরবের নাম মহাকাল। আর বামবাহু যেখানে পড়েছিল সেই জায়গার নাম বহুলা। তৈরবী যা শক্তির নামও বহুলা এবং তৈরবের নাম ভীরুক। বহুলা দেবীর মন্দিরের এক স্থানের মধ্যে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্তির কোনও সঙ্গান পাওয়া যায় না। তবে তৈরব মহাকাল এখন নতুন একটি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

মা বহুলার ধ্যানমন্ত্র হল,

ওঁ ধ্যায়েছ্বী বহুলাঃ তনয়াঃ

পদ্ম সনস্থাঃ শুভম।

দোভি কক্ষতিকাঃ বরাভয় জুঙ্গঃ

দাশনিহাম শোভিতাঃ নিদ্রাবেশ

বসান চিত্তাঃ ত্রিনয়তাঃ

বাগযুক্ত পুত্রাষ্টিতাঃ গৌরাঙ্গীঃ

মনিহার কষ্ট নমিতাঃ।।

চিন্ত্যাঃ সুখঃ কামোদাঃ

ওঁ হৃীঃ বহুলাক্ষী ভগবৎ দুর্গা দেব্যাত্র হীঃ নমঃ।।

মা বহুলার প্রণাম মন্ত্রঃ :

ওঁ নম বহুলায়াঃ চতুর্ভুজাঃ পতিপুত্র সমর্পিতাঃ

নমস্তে ভীরুকঃত্যা
সবসিদ্ধি প্রদায়িনী ॥

মরাঘাটে বিশেষ পুজো হয় বোধ নবমী ও শিবরাত্রির দিনে। এখানে দুর্গাপুজোর তিনদিন সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিনও দুর্গার ধ্যানে বিশেষ পুজো হয়। মা যেহেতু এখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে তাই এখানে কোনও দশমী নেই। যার আবাহন আছে তার বিসর্জন আছে। সেজন্য এই জায়গাটিকে বলা হয় ‘অচল’। কারণ, এখানে কোনও আহানও নেই আবার বিসর্জনও নেই।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : কাটোয়া, আহমেদপুর রেলপথে দশ মাইল দূরে নিরোল স্টেশনে নেমে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম। কাটোয়া থেকে কেতুগ্রামের দূরত্ব মাত্র সতেরো কিলোমিটার। কেতুগ্রামে বাস থেকে নেমে হেঁটে বা সাইকেল রিকশায় পৌঁঠস্থানে যাওয়া যায়। এখান থেকে সব চেয়ে কাছের রেলস্টেশন, কাটোয়া-আহমেদপুর শাখার অস্বলগ্রাম।

থাকার ব্যবস্থা : কেতুগ্রামে যাত্রীনিবাস আছে। তবে কাটোয়ায় থাকার ভালো হোটেল আছে।



ମୁର୍ଶିଦାବାଦେ କିରୀଟେଷ୍ଵରୀ

ତ୍ରିଭୁବନେ ଅନ୍ୟତମ ଏ'ଭାରତ ଭୂମି ।
 ଦେବଦେବୀ କୃପାଧନ୍ୟ ବଞ୍ଚମାତା ତୁମି ॥
 ପୁରାଣେ ରଯେଛେ ଗାଁଥା କତ ନା କାହିନୀ ।
 ପୁଣ୍ୟସାକ୍ଷୀ ଭାଗୀରଥୀ; ପଞ୍ଚମବାହିନୀ—
 ସୁଜଳା-ସୁଫଳା ତୀରେ ଶାମ ‘କିରୀଟକଣ’ ।
 ‘କିରୀଟେଷ୍ଵରୀ’ ନାମେ ରଯେଛେ ବର୍ଣନା ॥
 ମୁର୍ଶିଦ-ଆବାଦ ଜେଲା; ନବଘାମ ଥାନା;
 ବିଶ୍ଵମାତାର ପୀଠ ଏ'ପୁଣ୍ୟ ଠିକାନା ॥

ଯବେ.....

ଶ୍ଵାମୀର ନିନ୍ଦାୟ ‘ସତୀ’ ଦେହତ୍ୟାଗ କରେ,
 ଶିବିର ଭୈରବ ନୃତ୍ୟ ଦକ୍ଷ୍ୟଜ୍ଞାଗାନ୍ୟ ॥
 ସୁଦର୍ଶନେ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ପୁଣ୍ୟ ସତୀଦେହ ।
 ଏକାନ୍ତଟି ଅଖ୍ୟାତ ହଙ୍ଗେ ପତିତ ସେ ଗେହୋ ॥
 ମର୍ତ୍ତଭୂମି ବୁକେ ଧରେ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ଯତା
 ଏକାନ୍ତ ପୀଠେର ଜନ୍ମ ହୟ ସେଇମତ ॥
 ତନ୍ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ୟତମ ‘କିରୀଟେଷ୍ଵରୀ’ ଧାମ ।
 ଶକ୍ତିରପୀ ମା ବିମଳା; ଲହୋ ହେ ପ୍ରଣାମ ।

ଏଇ ମହାପୀଠେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ନାମ ବିମଳା ଏବଂ ଭୈରବ ହଲେନ ସଂବର୍ତ୍ତ । ଯୋଡ଼ଶ
 ଶତାବ୍ଦୀତେ ରଚିତ ‘ତନ୍ତ୍ରଚଢ଼ାମଣି’ ଗ୍ରହେ ଏଇ ମହାପୀଠେର ଉତ୍ସେଖ ଆଛେ । ‘ପୀଠ ନିର୍ଣ୍ୟ’ ଗ୍ରହେ
 ବଲା ହେଯେଛେ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱୀ ସିଦ୍ଧି ରୂପା
 କିରୀଟସହ କିରୀଟତଃ ।
 ଦେବତା ମିଳା ନାମୀ
 ସଂବର୍ତ୍ତୋ ଭୈବରିସ୍ତ୍ରଥା ॥

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যস্থলে উল্লেখ আছে,

কিরীটিকণায় পড়ে কিরীটস্বরূপ

ভুবনেশ্বী দেবতা ভৈরব সিদ্ধিরূপ ॥

ভারতচন্দ্রের মতে জায়গাটির নাম কিরীটকোণ। দেবীর নাম ভুবনেশ্বী, ভৈরবের নাম সিদ্ধিরূপ। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, জায়গাটি অবস্থিত মুর্শিদাবাদে। হাজারদুয়ারীর উলটোদিকে নদী পার হয়ে এলে পড়বে ডাহা পাড়। সেখান থেকে আধক্ষেত্র দূরে কিরীটকোণ (মতান্তরে কিরীটকণ)। গ্রামের নাম বটনগর। এই একবিংশ শতাব্দীতেও গ্রামের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। অর্থনৈতিক ভাবে বিধ্বস্থ। মন্দিরটি অবস্থিত কাঁচারাস্তায়। বিজলি বাতির চিহ্ন দেখা যায় না। ইদানীং মন্দির চতুরকে ঘিরে কয়েকটি স্থায়ী তথা পাকা দোকান ঘর হয়েছে। কিরীটেশ্বরী প্রাঙ্গণে রয়েছে দেবীর নতুন ও পুরোনো মন্দির। পৌরাণিক ও তাত্ত্বিক মতে, বিষ্ণুক্রে কর্তৃত হয়ে সতীর মাথায় থাকা কিরীট (মুকুট) এই কিরীটকণ বা কিরীটদেশে পড়েছিল। তাত্ত্বিক মতে এটি একান্ন পীঠের অন্যতম।

মহানীলতন্ত্রে কিরীটটীর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই তন্ত্রের পঞ্চম পটলে বলা হয়েছে,

‘কালীঘাটে, গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী ॥

কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গবাহিনী ॥

দেবী ভাগবতের অন্তর্গত দেবীগীতায় মুকুটেশ্বরী নামটি উল্লেখ করা আছে এবং জায়গাটির নাম বলা হয়েছে ‘মাকোট’। অনেকের ধারণা, মুকুট থেকে মাকোট শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। এখানে দেবীর কোনও অঙ্গ না পড়ায় ‘শিবচরিত’ গ্রন্থে এক উপপীঠ বলা হয়েছে। শিবচরিত মতে, দেবীর নাম ভুবনেশ্বী, ভৈরবের নাম কিরীটী, মতান্তরে সিদ্ধিরূপ বা সিদ্ধরূপ।

মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দিলীপ ভট্টাচার্য জানালেন, মুর্শিদাবাদের সবচেয়ে প্রাচীন স্থান হল এই কিরীটেশ্বরী মন্দির। যে সময় দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল সেই সময় কিরীটেশ্বরীতে দেবীর ‘কিরীট’ পড়েছিল। অনেকে ভাবেন, কিরীট হচ্ছে মাথার মুকুট। কিন্তু আসলে কিরীট হল ‘কপালের ওপরে শিরের নীচের সংযোগস্থল’। এই অংশটিই এখানে শিলালঘৃণে রক্ষিত আছে। প্রাচীনকালে এই শিলা বর্তমান মন্দিরের পাশে পুরোনো মন্দিরে রাখা ছিল। সেই মন্দির কালের গতিতে ধ্বংস হয়ে যায়। এই শিলা তখন অবহেলিত অবস্থায় পূজিত হচ্ছিল। বর্তমান মন্দিরটি তখন ছিল জঙ্গলে ভরা। এখানে রানী ভবানীর দণ্ডক পুত্র রাজা রামকৃষ্ণ রায় পাঁচটি নরমুণ্ড এনে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করে সাধনা করতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মায়ের দর্শন লাভ। সাধনা শেষ হয়ে যাবার পরে গভীর রাতে মাকে দেখা দেবার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করে বলেন, আমি পরিচ্ছন্ন ভাবে সব ক্রিয়া করেছি। কিন্তু সময় না হওয়ায় তিনি দেবীর দর্শন লাভে বাধিত হচ্ছিলেন।’

একসময় রাজা রামকৃষ্ণ দৃঃখে, অভিমানে, ক্ষেত্রে উন্মত্ত হয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করবলেন। তখন দেবীর দৈববাণী হল, তোমার সময়, কাল, স্থান ঠিক হয়নি। সময় কাল হলেই তুমি আমার দর্শন পাবে, বাবা। ‘বাবা’ ডাকে সম্মোধিত হলে তিনি শাস্ত হলেন। কিন্তু তখনও তিনি জানেন না, কবে, কোথায় তিনি মায়ের দর্শন পাবেন। সেই দৈববাণীর পর তিনি বাংলাদেশের নাটোরে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনপক্ষ (মতান্তরে তিন মাস) করতোয়া নদীর ধারে যে পীঠস্থান আছে, সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করেন। সেখানেই তাঁর মাতৃরূপ দর্শন হয়। কিন্তু রাজার পরিছন্ন ক্রিয়ার সুবাদে রানী ভবানীকে মা স্বপ্নে দেখা দেন। মা তাঁকে বলেন, তুমি এখানে মন্দির তৈরি কর। রানীমা কিরীটেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দেখলেন, মন্দির প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ধন্দে পড়ে গেলেন রানীমা। তিনি ভাবলেন, মা আমায় আদেশ দিয়েছেন মন্দির তৈরি করার জন্য অথচ তা প্রায় ধ্বংসের মুখে পড়ে আছে। আমি কী করে মায়ের আদেশ ছাড়া ভিটে ছেড়ে শিলা নিয়ে যাব। মনে মনে আরও ভাবলেন, এই শিলাকে বাঁচাতেই হবে, নাহলে পরবর্তী সময়ে তাকে কেউ চিনতেও পারবে না। তখন তিনি ধ্বংসের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে পঞ্চমুণ্ডির আসন থেকে এক ইঞ্চি ওপরে স্থাপন করেন। শিলা ধোওয়া জল থাকত পঞ্চমুণ্ডির কুণ্ডে। গর্ভ তৈরি করে তিনি তার ভেতরে শিলাকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। সেখানে সৃষ্টি করিয়ে দিলেন মাতৃরূপ। রানী ভবানী মায়ের একটি মৃত্তি মৃত্তি দিয়ে গেছেন। সেটি ওঁর সময়ে না তাঁর আগে তৈরি হয়, তা জানা যায় না। সেই মৃত্তি অষ্টধাতুর, সোনার মুরুট দিয়ে তৈরি। পৌষ মাসের চারটি ঘন্টাবার দুপুর একটার পর এই মৃত্তির অধিষ্ঠান হয়। সেটি একটি গোপন জামগায় সারাবছর রাখা থাকে।

শোনা যায়, নবাব মীরজাফুর মখমত কুষ্ঠ রোগে আক্রমিত হন, তখন মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে মা কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন।

শক্রাচার্যের ‘মঠান্মায়’ গ্রন্থে তাঁর সভাপতি মঠ চতুর্ষয়ে তন্ত্রে পীঠমালায় বর্ণিত দেবদেবীদের কথা বলা হয়েছে। কোনও কোনও বিদ্ধি গবেষকদের মতে, শ্রীস্ট পূর্ব ৪৬৯ অন্দে ভগবান শক্রের জন্ম হয়। এজন্য আনুমান করা যেতে পারে, শ্রীস্ট জন্মের ৪৫০ বছর আগেই পীঠগুলির মাহাত্ম্য প্রকাশ হতে শুরু করে। ৪০০ অন্দে গুপ্ত বংশীয়েরা ভারতের রাজা হন। তাদের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। এই রাজত্ব অনেকদূর অবধি ছড়িয়ে ছিল। রাজ্যদেশ, বঙ্গভূমি ও তাদের অধিকারে ছিল। এক সময় রাজ্যদেশের কর্ণ-সুবর্ণেও ওরা রাজধানী স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটি ও কর্ণ-সুবর্ণ একই স্থান। এই গুপ্ত বংশীয় রাজারা শক্রিন উপাসক ছিলেন। সেই সময়কার মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার সূত্রে এ-তথ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের রাজত্বের সময় থেকেই দেবী কিরীটেশ্বরীর প্রচার প্রাধান্য পায়। এই রাজারা শ্রীস্ট পূর্ব ৪০০ থেকে শ্রীস্ট পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে রাজত্ব করেন। শূর বংশ, পাল বংশ, সেন বংশের সময়েও দেবীর অস্তিত্ব লোপ পায়নি।

মুসলমান রাজাদের আমলেও এই জায়গাটি তীর্থস্থান হিসাবে পরিচিত ছিল। গৌড়ের পাঠান রাজাদের আমলেও দেবীর গৌরব অটুট ছিল। জানা গিয়েছে তৈন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল বৈষ্ণব ও তাঁর পূর্বপুরুষেরা দেবী কিরীটেশ্বরীর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। মঙ্গল বৈষ্ণবের জীবিতকালে সন্নাটের আসনে আসীন ছিলেন হোসেন শাহ।

তৈরব মন্দিরের সামনে যে শিবমন্দির আছে সেখানে একটি পাথরের ফলকে লেখা আছে, ১৬৮৭ শকাব্দে সভারামের ছেলে রঘুনাথ এই শুভ মঠ স্থাপন করেন। ১৬৮৭ শকাব্দে বা ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের বছর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক দূর দেশ থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা এখানে এসে সাধনা করতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবেরাও দেবী কিরীটেশ্বরীকে বিশেষ সম্মান করতেন। সৈয়র মুতরীক্ষণে লেখা আছে, নবাব মীরজাফর তাঁর পিয় দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে জীবনের শেষ সময়ে দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রিয়াজ-উস্স সালতিনে কিরীটকণাকে ‘তিরুণ-কণা’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চাননের কায়স্ত চারিকায় লেখা আছে,

তিহি কিরীটেশ্বরী মধ্যে কিরীটেশ্বরী গ্রাম।

মহাপীঠ হয় সেই মহামায়ার ধাম।

বঙ্গাধিকারীদের পূর্বপুরুষ ভগবান রায় ‘কানুনগো’ পদ্মলভ করে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে যে জায়গীর পেয়েছিলেন তার সনদে কিরীটেশ্বরীকে বলা হয়েছে ভবানী স্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেবীর সেবারে ছিলেন জনৈক বৈষ্ণব। তাঁর নাম ছিল মঙ্গল। জানা গিয়েছে, তিনি তৈন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

রাজা রাজবল্লভ এখানে দুটি শিবমন্দির তৈরি করান। কথিত আছে, রাজা রাজবল্লভকে নবাব মীরকাশিম যেদিন গঙ্গায় ডুবিয়ে মারেন সেদিন একটি শিবলিঙ্গ ফেটে যায়। আরও শোনা গেছে, রাজা রাজবল্লভের ছেলেকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলে একটি বড় শিবলিঙ্গ আপনা-আপনিই ফেটে যায়। দেবী কিরীটেশ্বরীর তৈরব হিসাবে যে মূর্তির পুজো করা হয় সেটি আসলে একটি বুদ্ধমূর্তি। গ্রামের মধ্যেই রয়েছে ‘গুপ্তমঠ’ নামে আর একটি মন্দির।

রাজা রামকৃষ্ণ রায় প্রত্যেক দিন রাতে মুর্শিদাবাদে তাঁর রাজধানী বড়নগর থেকে দেবী কিরীটেশ্বরী মন্দিরে যাওয়ার জন্য একটি খাল কাটিয়েছিলেন। রানী ভবানীর মেয়ে তারাদেবীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরের পিছনে একটি শুকনো বেলগাছের তলায় তাঁর পঞ্চমুণ্ডীর আসন রাখা আছে। জনশ্রুতি হল, যে শবের ওপর বসে রাজা রামকৃষ্ণ শবসাধনা করতেন সেটি বড়নগরে একটি খেজুর গাছের গোড়ায় পোঁতা আছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে তৈরব হিসাবে যাঁকে পুজো করা হয় সেটি আসলে একটি বুদ্ধমূর্তি। এই মূর্তিটি ‘ধ্যান বুদ্ধমূর্তি’ নামে পরিচিত। অন্যান্য তৈরব মূর্তির সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। পাল বংশীয়রা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। অনুমান

করা হয়, তাদের আমলে এই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছে। ‘বঙ্গাধিকারী’ নামে চিহ্নিত উত্তর রাজ্যীয় কায়স্ত ভগবান রায় ও তাঁর বংশধরেরা বাংলা, বিহার, ওড়িশাৰ কানুনগোপনে আসীন হন। ভগবান রায়, রাজা তোড়ৱমণ্ডেৰ রাজস্ব বন্দোবস্তেৰ সময় প্ৰধান কানুনগোপনে আসেন হন। ভগবান রায় ও সন্মাট আকবৱ তাঁকে ‘বঙ্গাধিকারী’ উপাধি দেন। তিনি বাদশাহেৰ কাছ থেকে যে সমস্ত দেবোন্তৰ লাখেৱাজ সম্পত্তি জায়গিৰ হিসাবে পেয়েছিলেন তাৰ মধ্যে কিৰীটেশ্বৰীও ছিল। সনদে কিৰীটেশ্বৰীকে ‘ভবানী যান’ নামে বৰ্ণনা কৱা হয়েছে। এই বংশেৰ দৰ্পনারায়ণ রায় সন্মাট আৱঙ্গজেৰেৱ সময় প্ৰধান কানুনগোপনে অধিষ্ঠিত হয়ে ঢাকায় আসেন। তখন বাংলার আওৱঙ্গজেৰেৱ পৌত্ৰ আজিম-উশুশান বাংলার সুবাদাৰ ছিলেন। অন্যদিকে ১৭০১ খ্ৰিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে ঢাকায় আসেন মুৰ্শিদকুলি খাঁ। কিছুদিনেৰ মধ্যে দেওয়ান ও সুবাদাৰেৰ মধ্যে মনোমালিন্য শুৱ হয়। এই অবস্থায় দেওয়ান মুৰ্শিদকুলি খাঁ রাজাৰ বিভাগেৰ কৰ্মচাৰীদেৱ নিয়ে ১৭০৪ খ্ৰিস্টাব্দে মুখসুদাবাদে (পৱৰত্তী সময়ে মুৰ্শিদাবাদ) তাঁৰ দপ্তৱ স্থানান্তৰিত কৱেন। বলা বাহল্য, একইসময়ে কৰ্মসূত্ৰে মুৰ্শিদাবাদে ভাগীৱৰ্থীৰ পশ্চিমদিকে ডাহাপাড়া গ্রামে বাসভবন তৈৰি কৱান দৰ্পনারায়ণ রায়। সেখান থেকে আধক্ষেশ দূৱে দেবী কিৰীটেশ্বৰীৰ পীঠস্থান। ওই সময় পুৱো জায়গাটি জঙ্গলে ভৱতি ছিল। দৰ্পনারায়ণেৰ তত্ত্বাবধানে বনজঙ্গল পৱিষ্ঠাকাৰ কৱে মন্দিৱেৰ চৌহদ্দিৰ মধ্যে অবস্থিত ‘গুপ্তমঠ’ নামে প্ৰাচীন মন্দিৱেৰ সংস্কাৰ কৱান। মন্দিৱটি দক্ষিণাদীৰী। তাঁৰ উদ্যোগে সেখানে পশ্চিমদ্বাৰী মন্দিৱ; কয়েকটি শিবমন্দিৱ ও ভৈৱেৰ মন্দিৱ স্থাপিত হয়। তাঁৰ উদ্যোগেই মন্দিৱেৰ কাছে ‘কালীসাগৰ’ নামে একটি বড় দীঘি কাটিয়ে ঘাট বাঁধানো হয়েছিল। তিনিই কিৰীটেশ্বৰী মেলাৰ প্ৰৱৰ্তন কৱেন। সেই মেলা আজ পৌষমাসেৰ প্ৰতি মঙ্গলবাৰে মন্দিৱ প্ৰাঙ্গণে বসে।

দৰ্পনারায়ণেৰ ছেলো শিবনারায়ণ যাতায়াতেৰ সুবিধাৰ জন্য কিৰীটেশ্বৰী মন্দিৱে যাওয়াৰ পথে বড় সেতু তৈৰি কৱান। আজও তাৰ চিহ্ন বৰ্তমান। দেবী মন্দিৱ থেকে একটু দূৱে, দক্ষিণ-পূৰ্ব কোণে পুৰুৱ পাড়ে একটি ভাঙা মন্দিৱ আছে। তাৰ নাম ‘বাঁকা ভবানীৰ মন্দিৱ’। এখানে একসময় মহিষমদিনীৰ মূৰ্তি ছিল। বৰ্তমানে তা স্থানান্তৰিত হয়েছে। ব্ৰহ্মানন্দ গিৱি ও আৱও কয়েকজন সন্ন্যাসী এখানে সাধনা কৱে সিদ্ধি লাভ কৱেছেন। মন্দিৱেৰ পূৰ্বদিকে বেলতলা। গুপ্ত মন্দিৱে দেবীৰ বাৰ্ষিক উৎসব হয় দুৰ্গাষ্টৰ্মীৰ দিনে। ওই সময়ে দেবীৰ শিলাৰ কাপড় বদলানো হয়।

মন্দিৱেৰ পুৱোহিত জানালেন, প্ৰতি অমাৰস্যাৰ দিন বেশি রাতে মায়েৰ পুজো কৱি। অমাৰস্যাৰ আগেৰ দিন শহৱে গিয়ে সামান্য কিছু চেৱিফল, কলা, আঝুৱ মায়েৰ পুজোৱ জন্য নিয়ে আসি। একদিন অমাৰস্যাৰ আগে তাই কৱেছি। কিন্তু কাঁচা মিষ্টি আনতে ভুলে গিয়েছিলাম। যখন আৱণে এল, তখন আমাৰ কাছে পয়সা ছিল না। ভাবলাম দোকানদাৰেৰ কাছ থেকে বাকিতে নেব। পৱিষ্ঠানেই ভাবছি বাকিতে নিতে গেলে হয়তো এমনিতেই দিয়ে দেবে। এৱকম দিধাগত্ত অবস্থায় মিষ্টি না কিনে বাড়িতে ফিৱে যাই।

ফিরে আসায় ভাবলাম, সারাদিন তো অমাবস্যা থাকবে। কাউকে না কাউকে দিয়ে সেটা আনিয়ে নেব। কিন্তু এধরনের ভাবনার কথাও আর মনে নেই। মাকে ঘি মাখিয়ে স্নান করিয়ে আহিংক করতে বসেছি। এমন অবস্থায় দেখলাম কয়েকজন ভক্ত প্রায় এক কেজি ওজনের মিষ্টির বাঞ্চ এনে বলছেন, ঠাকুরমশাই, আপনি এটা দিয়ে পুজো দিয়ে দিন। মিষ্টির প্যাকেটটা নিয়ে ভাবলাম, রাতের পুজোর জন্য কিছুটা মিষ্টি সরিয়ে রাখব। কিন্তু কী জানি কেন সবটাই মাকে নিবেদন করে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ওই ভদ্রলোকদের একজন মন্দিরে ফিরে এসে বললেন, একটা মিষ্টির প্যাকেট গাড়িতে থেকে গিয়েছিল এটা আপনি অন্য কোনও সময় পুজোয় দিয়ে দেবেন। বুঝলাম, মা অন্তর্যামীনী। তিনি নিজের জিনিস নিজেই আনিয়ে নিলেন।

একবার অশুবাচীর^১ মধ্যেই অমাবস্যা পড়েছিল। ঘরে বৃদ্ধা মা। তাঁকে এব্যাপারে ভিজ্জেস করায় তিনি বললেন, অশুবাচীর মধ্যে অন্নভোগ দেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু ভক্তদের তো অন্ন ভোগ দেব বলে কথা দিয়েছি। তাই মনে মনে স্থির করলাম, ভক্তদের জন্য সামান্য ভোগ তৈরি করে নিয়ে যাব। আর বাকিটা তো ওরা মন্দিরের বাইরে রান্না করে নেবেন। ওই সামান্য ভোগটা মাকে নিবেদন না করে মন্দিরের এক কোণায় রেখে দেবে আর সেটাই প্রসাদ বলে দিয়ে দেব। ভাবনা মতো সেখানে অন্ন ভোগ রেখে দিলাম। অঙ্গুত মায়ের লীলা। ভক্তদের একজন বললেন, ঠাকুরমশাই ওই ভোগ আমাদের একজনের পায়ে ঠেকে গেছে, ওতে ভোগ আর দেবেন না।

এই ভাবেই আমার, মায়ের সম্পর্কে অনুভূতি হয়েছে। এখানে দক্ষিণ কালী ধ্যানেই মায়ের পুজো হয়। মহাকালের ধ্যানেও শুধুর ভোগ নিবেদন করা হয়। তারপর ডাকিনী-যোগিনীর ধ্যানে ফুল বেলপাতাসহ নিবেদ্য নিবেদন করার পর আদ্যাস্তব পাঠ করি ও কিঞ্চিৎ চঙ্গীপাঠ করি।

‘খগেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য’(বর্তমান পুরোহিতের বাবা) তাঁর ঘোলো বছর থেকে ছিয়াশি বছর পর্যন্ত পুজো করেছেন। একই সময়ে তিনি একশ'র বেশি বলি দিয়েছেন। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি, দৈহিক নয়, বাবার এই মানসিক শক্তি কে ধরে রেখেছিল? এখানকার নিয়ম হল, আমরা পুজো করব, আমরাই বলি দেব। এখানে প্রতিদিন বলি হয় না। যখন ভক্তরা বলির জন্য নিয়ে আসে, তখন তা উৎসর্গ করা হয়। এখানকার রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, রাস্তার সংস্কার হলে ভক্ত সমাগম বৃদ্ধি পাবে আর এখানে যদি ভক্তদের থাকার জন্য একটি আবাসের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ উপকৃত হবেন।

যাতায়াতের ব্যবস্থা :শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে মুর্শিদাবাদ ১৯৭ কিলোমিটার। মুর্শিদাবাদ শহর থেকে সাহা নগরের খেয়া পার হয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটাপথে বা রিকশায় ৫ কিলোমিটার। বারহারোয়া লাইনে হাওড়া থেকে ২১৩ কিলোমিটার দূরে ডাহাপাড়াধাম।

সেখান থেকে হেঁটে বা ভ্যান রিকশায় (যদি পাওয়া যায়) কিরীটেশ্বরী মন্দিরে যাওয়া যায়। হাওড়া থেকে আজিমগঞ্জ (২১২ কিলোমিটার) জংশনে নেমে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সময় ভ্যানরিকশায়। তবে অবশ্যই যাতায়াতের জন্য নির্দিষ্ট ভ্যানরিকশা ভাড়া করে যাওয়া উচিত।

মন্দির প্রাঙ্গণে বা কাছে পীঠে থাকার কোনও ব্যবস্থা নেই। রাত্রিবাস করতে হলে বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ বা আজিমগঞ্জ শহরে থাকতে হবে।



মুসলমান-শিখ-হিন্দু নির্বিশেষে সকলের মা দেবীবর্গভীমা

তাষলিপ্তে তখন রাজত্ব করতেন ময়ূরবংশীয় রাজারা। তৃতীয় পাঞ্চব অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরা। অন্য মতে, অশ্বমেদের ঘোড়া আটকানোর জন্য যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তাষলিপ্তে। তাষলিপ্তের সেই রাজার নাম তাষধ্বজ। আদ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত। তাই মদনমোহনের মধ্যস্থতায় অশ্বমেধের ঘোড়াকে আটকে রাখেননি তাষধ্বজ। তাই মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি হয়ে যায় সেদিনই। সেই প্রবলপরাক্রান্ত রাজার হ্রকুম মাছ চাই। জেলেনি তাই রোজ মাছ দিয়ে যান রাজবাড়িতে। একদিন বনের মধ্যে দিয়ে মাথায় মাছের ঝুঁড়ি নিয়ে আসার সময় তিনি জলে ভরা গর্ত দেখতে পান। জল দেখেই আঁচলা ভরা জল ছিটিয়ে দেন মাছগুলির গায়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সেই জলের ছেঁয়ায় মুহূর্তের মধ্যে মাছগুলি জ্যান্ত হয়ে ওঠে। শুধু জ্যান্ত হয়ে ওঠে তাই নয়, এমনভাবে তারা লাফাতে থাকে যে সেগুলিকে ঝুঁড়ির মধ্যে রাখাই দায় হয়ে ওঠে। একসময় রাজাও এই অলৌকিক কাণ্ডের কথা শোনেন। ডেকে পাঠান জেলেনিকে। বলেন, কোথায় কোন জলে মাছ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে দেখাতে পারবে? জেলেনি *Patna* *new* রঞ্জেন, পারব মহারাজ। তিনি রাজা তাষধ্বজকে নিয়ে যান সেখানে।

রাজা অবাক হয়ে দেখলেন, সেই জলে ভরা গর্তের জায়গায় রয়েছে একটি বেদি আর তার ওপরেই রয়েছে দেবীমূর্তি। মূর্তি দেখার পর সেখানেই পুজোর ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে সেখানেই গড়ে ওঠে মন্দির। সেই দেবীই আজও পূজিতা হন দেবী বর্গভীমা রূপে।

এই কিংবদন্তি নিয়ে আরেকটি কাহিনী শোনা যায়। ময়ূরবংশের চতুর্থ রাজা গরুড়ধ্বজ প্রত্যেকদিন শোল মাছ খেতেন। জনেক জেলে প্রতিদিন তাঁকে সেই মাছ দিতেন। একদিন কোণও কারণে তিনি রাজাকে শোল মাছ এনে দিতে পারেননি। তাই শুনে ক্ষুরু রাজা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। রাজাদেশ শুনে ওই জেলে কোনোক্রমে জঙ্গলে পালিয়ে যায় সেখানে তিনি দেবী বর্গভীমার দর্শন পান। দেবী তাঁকে শোল মাছ জোগাড় করে শুকিয়ে রাখার এবং শুকনো মাছ প্রত্যেকদিন রাজবাড়িতে নিয়ে র্যাবার সময় একটি নির্দিষ্ট কুয়ো থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। একসময় জেলে আবার রাজবাড়িতে জ্যান্ত মাছ সরবরাহ করতে শুরু করে। বলাবাহল্য, রাজবাড়িতে জ্যান্ত শোল মাছ সরবরাহ

করার ক্ষেত্রে আর কোনও বাধা রইল না। একসময় এই ঘটনায় রাজার সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। রাজার পীড়াপীড়িতে জেলে তাঁকে সেই অলৌকিক কুয়োর সন্ধান দেন। জেলের এই কাজে শুধু দেবী একটি পাথরের মূর্তি হয়ে কুয়োর মুখে অবস্থান করতে থাকেন। সেই দেবীই হলেন বর্গভীমা। রাজা সেখানেই তৈরি করিয়ে দেন মন্দির।

আর একটি কিংবদন্তি হল, স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি বর্তমান দেবী বর্গভীমার মন্দিরটি তৈরি করান। মন্দিরটির গঠনশৈলী দেখে অনেক বিশেষজ্ঞের ধারণা, কোনও বৌদ্ধ স্মৃতিকে এই মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কারও কারও মতে, সপ্তম শতকের প্রথম দিকে চীনা পরিবারজক হিউয়েন সাঙ তাষলিপ্তে মহারাজ ড়শাকের যে প্রসিদ্ধ স্তুতি দেখেছিলেন এটি তারই ওপর তৈরি।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত শিবহীন যজ্ঞের আয়োজক ছিলেন দক্ষ। ত্রিভুবনের সবাইকে নিমিত্তণ করলেও আমন্ত্রণ জানানো হল না জামাই মহাদেবকে। এমনকী নিমিত্তণ হল না সতীরও। তবু যজ্ঞের খবর পেয়ে বিনা আমন্ত্রণে বাপের বাড়ির এসে উপস্থিত হলেন দেবী সতী। তাঁকে দেখামাত্রই মহাদেবের নিদায় মুখর হয়ে উঠলেন যক্ষ। একসময় স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করলেন সতী। স্তুর মৃত্যুতে শোকে অধীর মহাদেব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে দক্ষের মুণ্ডটা ছিঁড়ে একটা ছাগলের মাথায় বসিয়ে দেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপ লেগে রইল মহাদেবের সঙ্গে। তাঁর হাতেই লেগে রইল প্রজাপতি দক্ষের সেই ছিন্মুণ্ড। এক তীর্থ আরেক তীর্থে, কত জায়গায় ঘূরলেন দেবাদিদেব। কী করবেন— তাই ভেবে ভেবে মহাদেব শুয়েছিলেন এক পাহুচ্ছের গুহায়। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন নারায়ণ স্বয়ং। তিনি বনস্পতি, তুষি যাও তাষলিপ্তি তীর্থে। সেখানে^১ পাপহারী সরোবরে স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আমায় আর বর্গভীমা দেবীকে পুজো দাও। তবেই খণ্ড হবে ব্রহ্মহত্যার পাপ। নারায়ণের কথামত দেবাদিদেব এলেন তাষলিপ্তিতে। সরোবরে স্নান করে পুজো দিলেন দেবী বর্গভীমাকে। হাত থেকে খসে পড়ল দক্ষরাজার কাটা মাথা। সেই থেকেই এই সরোবরের নাম হয় শাপমোচন। একসময় দেবী মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যেত রূপনারায়ণ নদী। তারই গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সেই সরোবর।

স্মরণাগত কাল থেকে দেবী বর্গভীমা তাষলিপ্তি নগরে বিরাজিত। একসময় তাষলিপ্তির বন্দরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ থেকে দেশান্তরে। পুরাণের কথায় জানা যায়, পৃতপবিত্র একান্ন পীঠের অন্যতম তমলুকের বিভাসক। শোনা যায়, দেবীর ‘বাম গুলফ’ অর্থাৎ বাম পায়ের গোড়ালি পড়েছে এখানে। অনন্দামঙ্গলে বলা হয়েছে,

বিভাসকে বামা গুলফ ফেলিল কেশব।

ভীমারূপা দেবী তাহে কপালী তৈরব॥

ঝগ্নেদ দেবীসূক্ত-রাত্রিসূক্ত দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আছে। মহাভারত, হরিবংশে উচ্চারিত হয়েছে স্ব-বন্দনা। তিনি দশ মহাবিদ্যার ‘তারা’, দেবী বর্গভীমার প্রতিচ্ছয়া। তিনি ভক্তদের যুক্তক্ষেত্রে, অগ্নিদাহে, নদীতীরে, কাণ্ডারে, প্রবাসে, রাজরাজে-তস্ক্র ও

শক্তসংজ্ঞাত ভয়ে সুরক্ষা প্রদান করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে, ‘দুর্গ-ভবসাগর-নৌ রসঙ্গা’, অসঙ্গ মাগো, দুর্গম ভবসাগরে তরণীস্বরূপ তুমি। শিলালিখে ফুটে উঠেছে, শক্তিমন্দির ছিল ডাকিনী-যোগিনী পরিপূর্ণ, তাদের উচ্চগ্রাম ভয়াল কলরব আর কাপালিক শ্রেণীর আচারাদি উত্তাল করে তুলত সমগ্র অঞ্চলকে।

সুপ্রসিদ্ধ এই মন্দির এক উঁচু ভূখণ্ডে অবস্থিত। পশ্চিমমুখী মূল মন্দিরে পৌছাতে উঠতে হয় বাইশটি সিঁড়ি। দেউল ‘সপ্তরথ’ এবং সংলগ্ন জগমোহন ‘চারচালা’ রীতিতে তৈরি হয়েছে। সামনে রয়েছে নাটমন্দির। বড় দেউল ও জগমোহনের মাঝে ‘অন্তরাল’ ও ‘যোগমণ্ডপ’। চার দেওয়ালে লক্ষ্য করা যায় টেরাকোটার অলঙ্করণ। কিছুদিন অন্তর অন্তর মন্দির সংস্কারের কাজে উদ্যোগ নেওয়া হয়। বড় দেউলে ওড়িশার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবু ‘বেকি’ অংশ সামান্য বর্তুলাকারে উর্ধ্বরমুখী, ‘আমলক’ খুবই ছোট। মন্দিরের মাথায় রয়েছে কনক-কলস। গর্ভগৃহে পূর্বদিকের দেয়াল সংলগ্ন উঁচু বেদিতে রয়েছে দেবী বর্গভীমা। দেখলেন মনে পড়ে যায় পূরীর মন্দিরে জগন্মাথ-বলরাম-সুভদ্রার অবস্থান। দেবী এখানে ভীমারূপা। তিনি বর্গভীমা। তবে অভিজ্ঞদের মতে, যিনি চতুর্ভুজের ফলদাতা, তিনিই দেবী বর্গভীমা। ভৈরবের নাম কপালী বা সর্বানন্দ। তিনি চতুর্ভুজা, শবের ওপর অবস্থান করছেন। ডানদিকের উঁচু হাতে খড়া, নীচের হাতের ত্রিশূল। বাঁদিকের উঁচু হাতে খপর, নীচের হাতে নৃমণ্ডলীমূর্তির সঙ্গে আনন্দেশ্বর ভৈরব, সিদ্ধেশ্বর ভৈরব, নিয়তি এবং দশভুজা মহিষমন্দিনী। মহিষের ওপর চতুর্ভুজা নিয়তি। মন্দিরের পশ্চিমদিকে নীচে সিঁড়ি, পাশে ‘তৃতীনাথ’ শিবের দেউল। ১২৬০ সালে এই দেউলটি তৈরি করিয়ে দেন লাহোরের জয় পরগণার রামকোটের জনৈক মগলুরিয়া চৌধুরী। মন্দিরের সামনেই আছে একটি যজ্ঞ মন্দির। এটি তৈরি করিয়ে দেন এক পতিপুত্রাদীনা বৃন্দা। শোনা যায়, তিনি সুতো বিক্রির মাধ্যমে পাওয়া অর্থের মাধ্যমে এটি তৈরি করান।

দেবী বর্গভীমার মন্দিরের ইটগুলি এই বাংলায় ব্যবহৃত ইটের থেকে আলাদা। অনেক বড় বড় পাথর দিয়ে মন্দিরটি তৈরি করানো হয়। ছোট টুকরো পাথর এখানে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। তিরিশ ফুট উঁচু ভিত্তের ওপর এই অনন্য কারুকাজ করা মন্দিরটির উচ্চতা ষাট ফুট। এক টুকরো পাথরে তৈরি ছড়া ও চক্র ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ঝড়ে ভেঙে পড়ে যায়। তারপর উপযুক্ত পাথরের অভাবে ইট দিয়ে তৈরি করা হয়।

অনেকের মতে, এই মন্দিরটি আসলে কোনও বৌদ্ধ মন্দির। তাদের মতে, সপ্তম শতকের প্রথম দিকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাশলিপ্তের রাজা অশোকের যে প্রসিদ্ধ স্তুতি দেখেছিলেন এটি তারই ওপর তৈরি। ‘ত্রিমূলুক ইতিহাস’-এর প্রণেতা ঐলোক্যনাথ রঞ্জিত ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন, এই মন্দিরের অপূর্ব শিল্পৈপুণ্য দর্শন করিয়া সাধারণ লোকে এই মন্দিরকে ‘বিশ্বকর্মার নির্মিত’ বলিয়া জন্মনা করে। ইহার বাহিরের গঠনপ্রণালী উড়িষ্যাঞ্চলের মন্দিরের ন্যায় হইলেও ভেতরের গঠন বৌদ্ধ

বিহারের সদৃশ এবং অবিকল বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অনুরূপ। সমুখে প্রধান বা মূল বিহারের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র বিহার রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার অন্যান্য দিকেও ছিল, যাহাতে ভিক্ষুগণ একা একা নির্জনে উপাসনা করিতেন এবং সম্ভবত প্রধান বিহারের শিষ্যগণকে ভগবান বুদ্ধদেবের মুখপদ্ম বিনিঃস্ত (সর্ব-ধর্ম-সার) উপদেশ প্রদান করিতেন। পরে বৌদ্ধগণ কর্তৃক বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলে তাহাদের পরিত্যক্ত বিহার হিন্দুগণ অধিকার, করিয়া পূর্বদিকের প্রধান দ্বারসহ পার্শ্বের অন্যান্য ক্ষুদ্র বিহার ভগ্ন করিয়া মধ্যের মূল বিহার ও পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বিহারের উপর পশ্চিমদ্বারী করিয়া এক মন্দিররাপে নির্মাণ করিয়াছেন।

পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র, নন্দলাল দে'রাও বর্গভীমা মন্দিরটি যে আসলে বৌদ্ধ বিহার ছিল, সেই বিষয়ে একই মত পোষণ করেছেন।

কথিত আছে, চগুইমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সওদাগর একসময় রূপনারায়ণের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাম্রলিঙ্ঘ বন্দরে নামেন। ঘটনাচক্রে তিনি জানতে পারেন, নগরপান্তে একটি কুণ্ড ডোবালেই পিতলও সঙ্গে সঙ্গে সোনায় পরিণত হয়। একদিন দেখলেন, একজন লোক একটি সোনার কলসি নিয়ে যাচ্ছে। লোকটি বলে, জঙ্গলের মধ্যে একটি আশ্চর্য কুয়ো আছে। সেখানকার জলে পিতল ডোবালেই তা সোনা হয়ে যায়। ধনপতি সওদাগর তার কাছে জেনে নিলেন সেই আশ্চর্য কুয়োর সন্ধান। ধনপতি এই সুযোগ গ্রহণকরে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। যুবসা করে ফেরার পথে তিনি তমলুকে দেবী বর্গভীমার মন্দিরটি তৈরি করান। মন্দিরকে ক্রম্ভ করে আরও একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনা যায়। একবার প্রবল জলোচ্ছামে নদীগঙ্গার মন্দিরটি তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। *[ক্রিস্ট একসময় রূপনারায়ণের সেই তাঙ্গৰ মন্দিরের তলায় এসে থেমে যায়। আঙ্গে আঙ্গে শ্রোত দিক-পরিবর্তন করতে থাকে। ধীরে ধীরে সরে যায় অনেক দূরে। ডবলু ডবলু হান্টারের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, /Extract adopted from W. W. Hunter (A statistical Account of Bengal Vol. 3) 1876. J. D. Beglar (Revised list of Ancient Mounuments in Bengal) PWD. 1886 & L.S.S. O' malley (Bengal District Gazetteers, Midnapore) 1911.]*

It is known that at the dawn of history Tamralipta was a great sea port. In the Mahabharata epic the entity is admitted...famous city and kingdom of great antiquity...frequently mentioned in Jaina, Buddhist & Brahmanical Sanskrit Works. Emperor Ashoka (261 B.C.) erected a stupa here... Plotemy (150 A.D.) noticed it in his geography...several times referred to by mediaeval Chinese Pilgrims. Fa-Hian (405-411 A.D.) described it as being on the sea mouth, Hiuen Tsiang (629-643 A.D.) said that it lay near an inlet of the sea. I-tsing landed here at the close of the same century...other references in sanskrit the Dudhpari

rock inscription of Udaymana, which is not later than the 8th or 9th century A.D. Numbers Wealthy merchants and ship-owners resided here, and carried on an extensive over-sea trade...and almost forgotten name of the town, Ratnakar or Ratnabali, or the Mine of Gems, alone commemorates its former wealth.

The principle object of interest in the town is the temple of Barghabhima, who represents 'Tara' one form of Sakti...situated on the banks of the Rupnarayan river, in $22^{\circ}17'50''$ north latitude and $87^{\circ}57'30''$ east longitude. Some say that it was built by Biswakarma, the engineer of the gods. The temple is on a raised platform accessible by a flight of stairs consisting of 22 steps. The skill and ingenuity displayed in the construction of the temple still attract admiration. The idol is formed from a single block of stone with the hands and feet attached to it. The goddess is represented standing on the body of Siva, and has four hands. The temple is divided into four apartments; Inner Sanctuary. Hall of Audience, Hall of Sacrifice, and dancing Hall. There is a small raised covered passage, where Pandits meet to discuss religious subjects. The whole is covered with a dome-shaped roof. Stones of enormous size were used...and raise the spectator's wonder as to how they were lifted at a time when the aid of machinery was unknown. On the top of the temple, although dedicated to the wife of Siva, is the sacred disc. of Vishnu, surmounted by the form of a peacock. Outside the temple, but within its endosure, is a Kelikadamba tree, supposed to have the virtue of redeeming women from barrenness.

The Marhattas, when ravaging lower Bengal, and plundering every place that they came across, when they reached Tamluk, left it untouched, and made many valuable offerings to the temple, out of fear of the wrath of the goddess. Even the river Rupnarayan itself is believed to still its waters as if flows by the temple, while a short distance above or below the shrine the waves are turbulent. The river has on several occasions encroached near the temple, and once reached to within ten cubits of the walls; the stream was allowed no nearer approach. As often as it passed the line, the waters were forced back by the Divine will.

কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভূজাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম।
দক্ষিণে খড়গশূলঞ্চ তীক্ষ্ণ ধারো দুরাসদঃ॥
বামে খপরমুণ্ডঞ্চ লোলজিহা ত্রিলোচ নাম।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধানাং ভীমাদেবী শবাসনাম॥

এই হল দেবী বর্গভীমার ধ্যানমন্ত্র। ধ্বনির প্রকাশ অক্ষরে, আসলে অক্ষরই হল বীজ। মাতৃশক্তির যাবতীয় গৃঢ়তত্ত্ব লুকিয়ে আছে এই অক্ষরের মধ্যে। দেবী বর্গভীমা মন্দিরে কোনও বন্ধ দরজা নেই, সব দ্বারই খোলা। শুধু অক্ষরগুলি উচ্চারণ করলেই পৌছে যাওয়া যায় মায়ের চরণে।

১৫৬৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশা জয় করার অভিযানের উদ্দেশ্যে ‘কালাপাহাড়’ তমলুকে আসেন। সেইসময় তিনি দেবীদর্শন করার পরে আনন্দিত হয়ে একটি দলিল বা ‘বাদশাহী পঞ্জ’ দেন। কালাপাহাড়ের দেওয়া ওই পঞ্জা বর্তমানে আইনগত জটিলতার কারণে মহামান্য হাইকোর্টে জমা রাখা আছে। শোনা যায়, কালাপাহাড় যখন একের পর এক হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ওড়িশার দিকে, তখন তমলুকের বর্গভীমা মন্দির দর্শন করে ভয় পেয়ে সেখানে ষোড়শোপচারে পুজো এবং অনেক রত্নালঙ্ঘার দেবীর পায়ে সমর্পণ করেন।

জেলার থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা তমলুকের (১২৮০ সন) সম্পাদক ত্রেলোক্যনাথ রক্ষিত রচিত ‘তমলুক ইতিহাস’ (১৯০২ সাল) বইটির মাধ্যমে জানা যায় অজানা আরও কিছু তথ্য—

ধনপতি নামে এক সওদাগর একদা তাণ্ডলিপ্তের রূপনারায়ণ নদের মোহনায় তাহার বাণিজ্য জাহাজ (অর্গবপোত) নোঙর ও অবস্থানকালে এক ঝুতির হাতে সোনার জগ দেখিয়া প্রশ্নেত্তরে জানিতে পারেন ঐ ঝুতি অনুরূপ একটিগিরের (জলাধার) বারি সিঞ্চনে পিতলের মগকে সোনায় রূপান্তর করেছে। ধনপতি সওদাগর অবিলম্বে তার জাহাজে রক্ষিত সমস্ত পিতলের পণ্য বাসনাদি ঐ বারি সিঞ্চনে সোনায় রূপান্তরিত করে সেগুলির বিক্রয়লক্ষ অর্থে ঐ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়ে পারে, কে এই কালাপাহাড়, যিনি অজস্র হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করলেও অক্ষয় রেখেছিলেন দেবী বর্গভীমার মন্দির। আনুমানিক ১২৬০ সনে জালাল শাহের সময়ে তাঁর অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এঁদের উপাধি ছিল ‘ভাদুঁড়ী’। কৃতিবাসের লেখায় তাঁর পূর্বপুরুষ জগদানন্দ রায়ের নাম উল্লেখ আছে। কালাপাহাড়ের হিন্দু নাম ছিল, কালাঁদ রায়। তাঁর বাবার নাম নয়নঠাঁদ রায়। তিনি ছিলেন গৌড়ের বাদশাহের ফৌজদারি পদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কালাপাহাড়ের ছোটবেলার ডাক নাম ছিল ‘রাজু’। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি মামাবাড়িতে বড় হন। সবদিক থেকেই রূপে, গুণে, দৈহিক শক্তি সামর্থ্যে ব্যতিক্রমী পুরুষ হিসাবে তিনি চিহ্নিত হন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ কালাঁদ প্রতিদিন সকালে সোনার কোশাকুশি নিয়ে মহানন্দার জলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও স্নান করতে যেতেন। সেইসময় নবাবের সতরেো বছরের অপূর্বসুন্দরী রাজকুমারী দুলারী বিবি কালাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে যান। একদিন নবাব নন্দিনীর এই ভাবনার কথা মেয়ের বান্ধবীর মাধ্যমে নবাবের কানে এসে পৌছায়। এককাটিয়ার ভাদুঁড়ী বংশের ছেলে

কালাঁচাঁদ) অনেক ঝুঁকের সঙ্গে ইতিপূর্বে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। সেই স্ত্রি ধরেই নবাব রাজদরবারে ডেকে পাঠালেন কালাঁচাঁদকে। প্রস্তাব দিলেন দুলারী বিবিকে বিয়ে করার আগে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক। কিন্তু নবাবের মুখের ওপর কালাঁচাঁদ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কালাঁচাঁদের এ-হেন আচরণে তাঁকে সঙ্গে বন্দী করা হয়। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বধ্যভূমিতে। আদেশ দেওয়া হয়, তাঁকে শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলা হোক। এইসময় দুলারীবিবি কোনওভাবে সেখানে পৌছে ঘাতকের পায়ে ধরে বললেন, ওঁর প্রাণ নেওয়ার আগে আমাকে হত্যা করো—তারপর ওঁকে স্পর্শ করবে। দুলারীর আবেদনে জীবন ফিরে পেলেন কালাঁচাঁদ। প্রেমিকার এই আচরণে কালাঁচাঁদের মনের পরিবর্তন হল। তিনি দুলারীকে বিয়ে করলেন, যদিও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করেননি।

সমস্যা হল, সমাজ তাদের এই বিয়ে মেনে নিল না। অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও সমাজের কাছে থেকে তীব্র আঘাত পান। শেষে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দিরে গিয়ে প্রত্যাদেশের আশায় ধরনা দিয়ে সাতদিন পড়ে থাকলেন। কিন্তু পাওয়া গেল না কোনও স্বপ্নাদেশ। পক্ষান্তরে পাঞ্জারা নির্যাতন করে তাঁকে তাড়িয়ে দিল মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। ক্ষোভে, দুঃখে গৌড়ে ফিরে এসে কালাঁচাঁদ ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে ‘মোহম্মদ ফর্মুলা’ নাম গ্রহণ করে হিন্দুধর্ম ধৰংসে মেতে ওঠেন। তাঁর আক্রমণে ধৰংস হল শয়ে শয়ে হিন্দু বিগ্রহ ও মন্দির। তাঁর অমানুষিক অত্যাচারে তাঁকে সাধক...‘কালাপাহাড়’ নামে সম্মোধন করতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয়, সার্বিকভাবে হিন্দুবিদ্বেষী কালাপাহাড় ভয়ে অথবা ভক্তিতে মাথা লুটিয়ে দেন দেবী বর্গভীমার চরণে। স্তুতি পাঠান সৈন্যরা দেখলেন, সুলেমান কারনানির সেনাপতি কালাপাহাড় এই প্রথম একটি তথাকথিত হিন্দু মূর্তিকে ধৰংস না করে একটি পাঞ্জাটগাহার দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। আজও এ প্রশ্নের কোনও সদৃত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দেবী মা বর্গভীমা আদতে দেবী দুর্গারই আর এক রূপ। পুরাণে বলা হয়েছে, সত্যুগে মহিষাসুরের মতোই এক মহাশক্তিশালী অসুর দুর্গা, তপস্যা বলে অমিত শক্তির অধিকারী হয়। সেই শক্তিবলে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন দুর্গা। তাঁর অত্যাচার থেকে বাঁচতে বিতাড়িত দেবতারা দেবী দুর্গার আরাধনা করলে দেবী অসুর বধে যথাযথ ব্যবস্থা নেন। দুর্গ নামক অসুরকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। তেমনই দুর্গ-র অনুচর ভীমকে বধ করার জন্য তিনি খ্যাত হন ভীমা নামে। যদিও এ-প্রসঙ্গে অনেক ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন।

দেবী বর্গভীমার মন্দিরে প্রতিদিনই পুণ্যার্থীদের ভিড় থাকে। তবে চৈত্র এবং পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে দুর্টি মেলা বসে।

তত্ত্বমতে দেবীর পুজো করা হয়। দেবীর ভোগে দেওয়া হয় শোল মাছ। মন্দিরের গর্ভগৃহের আকার বর্গক্ষেত্রের মতো। ভেতরের ছাদ ‘লহয়া’ করা। জানা গেছে, পশ্চিমমুখী মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরটি আনুমানিক একশো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে তৈরি হয়।

মন্দিরটির বড় দেউলের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১৯ ফুট ৬ ইঞ্চি করে। জগমোহনের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি। উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। বড় দেউল ও জগমোহনের মাঝখানে রয়েছে ‘অন্তরাল’ ও ‘যোগমণ্ডল’। বড় দেউলের চার দেওয়ালে রয়েছে রামসীতা, ষড়ভূজ গৌরাঙ্গ, চতুর্মুখ ব্রহ্ম, মুধিক বাহন গণেশ, সিংহবাহিনী, কার্তিক, সরস্বতী, শিবদুর্গা, যুদ্ধরত রামচন্দ্র, নীলপদ্মহস্তা নায়িকা, বকাসুর বধ, গঙ্গানয়ন ইত্যাদি। এগুলির স্বরক্ষিত টেরাকোটার কাজ। কারুকাজ খুবই সুন্দর ও উচ্চমানের। অনেকের ধারণা, প্রথমে এ ধরনের কাজ বড় দেউলের গায়ে ছিল না। পরে অন্য কোথা থেকে এনে লাগানো হয়েছে। বর্গভীমা মন্দিরের বর্তমান পূজারি নকুল চন্দ্র পারিয়াল জানালেন, প্রায় কুড়ি বছর ধরে তিনি এই মন্দিরে পূজা করেছেন। এর আগে তাঁর বাবা এই মন্দিরে পূজা করতেন। বাবার দেহাবসানের পর তিনি এই দায়িত্ব পেয়েছেন। নকুলবাবু বললেন, দুপুরে এবং রাতে মায়ের ভোগে শোলমাছের অস্বল দেওয়া হয়। সকাল পাঁচটা থেকে রাত নটা-দশটা অবধি মন্দির খোলা থাকে। দুপুরবেলা মায়ের অন্নভোগের সময় বন্ধ থাকে। দিনে দু'বার মায়ের ভোগ হয়—দুপুরবেলা একটা ও রাতে নটাৰ সময়। বলি হয়। দুর্গাপুজোৰ সময় সপ্তমী ও মন্দিরের দিন বলিৰ সংখ্যা বেশি। কারও মানসিক থাকলে অন্যদিন বলি দেওয়া হয়। সকাল আটটার মধ্যে মায়ের নিত্যপূজো শেষ করা হয়। মায়ের মন্দিরের পাশে ষষ্ঠীতলার গাছে, কুণ্ডের জলে একডুবে যা হাতে পান সেটাই লাল সুতোয় বেঁধে দেন। বন্ধ্যা নারীরা। যাদের সন্তান হয়নি, তারা এইভাবে বিশ্বাস রেখে অনুসরণ কৰলে মাছতে পারেন। সন্তান হওয়ার পর যে কোনও একটা চিল খুলে দিতে হয়। নিশ্চয়ই অনেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, নাহলে সন্তান কামনায় এত মহিলারা গাছে চিল বাঁধে কেন?

কীভাবে মন্দির পরিচালনা করা হয়, এ-প্রশ্নে শিবাজী অধিকারী বললেন, সেবাইতদের নিয়ে একটা কমিটি আছে। নির্বাচনের মাধ্যমে ওই কমিটিতে কাজের মানুষদের নির্বাচিত করা হয়। প্রায় তিরিশ বছর ধরে আমি বর্গভীমা মন্দিরের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। বিভিন্ন ধরনের ভক্ত মন্দিরে প্রতিনিয়ত আসেন। কিছুদিন আগে আমার পরিচিত মেচোর এক যুবক মন্দিরে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইন্টারভিউ-এর তারিখ চলে গেছে। অথচ চিঠ্ঠিটা আমি আজকে পেয়েছি। ছেলেটি ‘কোয়াক ডাক্তারি’ করত। বললাম, মাকে জানান। তিনিই আপনার সহায় হবেন। সাতদিন পরে দেখলাম, একবার্কা মিষ্টি ও পুজোর নানান উপাচার নিয়ে তিনি মাকে পুজো দিতে এসেছেন। বললাম, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, আমার চাকরি হয়ে গেছে। কী করে চাকরি হল? বললেন, আমি গিয়ে দেখা করলাম নির্দিষ্ট অফিসে। বললাম, তমলুক থেকে এসেছি। অফিসাররা বললেন, বর্গভীমার প্রসাদ এনেছ? বললাম, না। পকেটে মায়ের বেলপাতা ছিল। তাঁদের প্রত্যেককে তা ভাগ করে দিলাম। শেষে চাকরিটা আমার হয়েই গেল। ছেলেটির কথা শুনে বুঝলাম, কী করে এমন হল তা ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। কোনও মহিলা হয়তো মায়ের কাছে সন্তান কামনা করেছেন। দু'বছর, তিনি বছর

পরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলছেন, দাদা, আমায় চিনতে পারছেন? কিছুক্ষণ পরে মনে পড়ল, ইনিই তো অমুক জায়গা থেকে এসে সন্তানের জন্য মানসিক করেছিলেন মা বর্গভীমার কাছে। মা তাঁর প্রার্থনা পূরণ করতে অক্ষণ হননি।

এরকম অনেক ঘটনাই চোখে পড়ে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মায়ের ভোগে শোল মাছ দেওয়া হয়। এখনও অবধি ঘটেনি যে শোলমাছ পাওয়া যায় নি। অতীতে দেখেছি, মাছের বাজার থেকে প্রতিদিন মায়ের ভোগের জন্য শোলমাছ দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা এখন আর চালু নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও শোলমাছের জোগাড় কোনোদিন বন্ধ হয়নি। শোলমাছ ছাড়া কেউ মায়ের কাছে মানসিক করেন না। ছেলে কথা বলতে পারছে না—মায়ের কাছে বলে, বোল ফুটলে ওল দেব—এসব তো আছেই। মায়ের কাছে অনেক কচুমুড়ো মানসিক করে। মনস্কামনা পূর্ণ হলে তাই মায়ের কাছে দিয়ে যায়।

মেদিনীপুর জেলায় সকলেই বর্গভীমাকে নিজের মা বলেই মনে করেন। তমলুক শহরের যে কোনও বাড়ির যে কোনও অনুষ্ঠান, যে কোনও মাঙ্গলিক ক্রিয়া কর্মে, যাই হোক না কেন, মায়ের কাছে আগে পুজো দিয়ে তবে কাজ শুরু করেন। প্রত্যেকের ধারণা, মা বর্গভীমার কাছে পুজো না দিলে কাজ সফল হবে না। তমলুকে অন্তত আড়াইশোটা কালীপুজো হয়। সকলেই বাজনা বাজিয়ে আগে মায়ের পুজো দিতে আসেন। একসময় কেউ কারও বাড়িতে শক্তিপুজো করতেন না। পঞ্চাশ পঞ্চাশ বছর আগে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তারপর আস্তে আস্তে ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠনে পুজোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু দেবী বর্গভীমাকে পুজো না দিয়ে কেউ তাদের পুজো শুরু করেন না। সেই প্রথা আজও চলে আসছে। মায়ের মন্দিরের পাশে যে কুণ্ড আছে তা কখনও পুরোপুরি শুকিয়ে যায় না। অনেকবার ওই কুণ্ডের জল পুরো তুলে ফেলার পর দেখা গেছে, কোনও এক জায়গা থেকে বুদ্বুদের আকারে জল বেরিয়ে আসছে। অথচ কাছাকাছি কোনও জলাশয় নেই। তবে এই কুণ্ডের জল খুবই অপরিস্কার। আমরাও সেইভাবে তার সংস্কার করতে পারছি না। আমিই দেখেছি কুণ্ডের জলে জোয়ারভাটা হত। সেইসময় ওই জলেই মায়ের স্নান, অন্নভোগের ব্যবস্থা হত। কিন্তু এখন সেই অবস্থা নেই। এখন পুরসভার জোগান দেওয়া জলে দেবীর ভোগ হয়।

তমলুকে সেভাবে কোনও যাত্রানিবাস গড়ে ওঠেনি। স্থানীয়ভাবে একটা ধর্মশালা (তাম্রলিঙ্গ ধর্মশালা) আছে। কিন্তু সেটাও যথাযথভাবে ব্যবহার হয় না। মন্দির সংলঙ্ঘ অঞ্চলে ধর্মশালা তৈরির মতো জায়গা নেই। তবে পেছন দিকে যে জায়গা আছে, সেখানে কিছু করতে হলে অনেক ভাবনাচিন্তা করতে হবে। ছোট জায়গা, সামনে গাড়ি রাখার খুবই অসুবিধা রয়েছে। সমগ্র তমলুকেই গাড়ি রাখার কোনও সুবিদ্ধোবস্ত নেই। তবে যদি রাতে একসঙ্গে অনেক যাত্রী পুজো দিতে আসেন, মন্দির প্রাঙ্গণে তাদের থাকতে দেওয়া হয়। একজন-দু'জনের জন্য সে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

দেবী বর্গভীমা তমলুকের হিন্দুদের কাছে যেমন ঘরের মা, মুসলমান-পাঞ্জাবিরাও তাঁকে

ମା ହିସାବେ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । ମାଯେର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣେ କ୍ଷେତ୍ରେ କୋନୋ ବିଧିନିଷେଧ ନେଇ । କତ ମୁସଲମାନ ଯେ ମାଯେର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରେନ, ତା ଗୁଣେ ଶେଷ କରା ଯାବେ ନା । ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ମେଯେରା, ଛୋଟ ଥେକେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଆଗେ ମାଯେର କାହେ ପାର୍ଥନା ଜାନିଯେ ପୁଜୋ ଦିଯେ ଯାଯ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅହରହ ଦେଖା ଯାଯ । ଏହିଭାବେଇ ମା ସକଳକେ ନିଯେ ରଯେଛେ ତମଲୁକେ ।

କିଛିଦିନ ଆଗେ ଏକଦିନ ଦେଖିଲାମ, ହିନ୍ଦୁବାଡ଼ିର ଏକଟା ଛୋଟ ଛେଲେ ନାଟମନ୍ଦିରେ ବସେ କାଁଦିଛେ । ଜାନା ଗେଲ, ବାବା ମା ତାକେ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଛେ । ସେହି ବାଚା ଛେଲେଟିକେ ନିଯେ କି କରବ ଭାବଛି ତଥନ ଆମାଦେରଇ ପରିଚିତ ରାଜୁ ନାମେ ମୁସଲମାନ ଛେଲେ ବଲଲ, ଛେଲେଟିକେ ଆମାୟ ଦେବେ, ଆମି ଏକେ ମାନୁଷ କରବ । ରାଜୁ କିନ୍ତୁ ଓହ ଛେଲେଟିକେ ନିଜେର ଛେଲେର ମତୋ କରେଇ ବଡ଼ କରଛେ । ତାରା କିନ୍ତୁ ଛେଲେଟି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସେକଥା ଭାବେନି । ମାଯେର କାହେ ଥେକେ ଛେଲେଟିକେ ପୋଯେଛେ, ଏଟାଇ ବଡ଼ କଥା । ଜେନେ ରାଖୁନ କୋନୋଦିନ ଯଦି ଦେଖା ଯାଯ ତମଲୁକେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦାଙ୍ଗା ହେଁବେ, ତାହଲେ ଦୁର୍ବାତେ ହେବେ ଭାରତବର୍ଷକେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଆଶ୍ରମ ଥେକେ ଆର ବୀଚାନୋ ସନ୍ତବ ହେବେ ନା ।

ବର୍ଗଭୀମାର ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କେ ନାନାନ ତଥ୍ୟ

ପଞ୍ଚ ମବଙ୍ଗେର ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରେର ଜେଲା ସଦର ତମଲୁକେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ । ମୌଜାର ନାମ ପାର୍ବତୀପୁର । ନ୍ୟାଶନାଲ ହାଇଓୟେ ୪୧-ଏର ନିମିତ୍ତୋଡ଼ି ଏବଂ ନ୍ୟାଶନାଲ ହାଇଓୟେ ସିଞ୍ଚ (୬) କୋଲାଘାଟ ଥେକେ ଦୂରତ୍ଵ ପାଁଚ କିମି । ରେଲଓୟେ ସେଟ୍ ଶନ : ତମଲୁକ ଏବଂ ଶହିଦ ମାତଙ୍ଗିନୀ । ସେଟ୍ ଶନ ଥେକେ ମନ୍ଦିର ଏକ କିମି । ହଲଦିଯା ଏବଂ ମେଚେଦୋ ଥେକେ ମନ୍ଦିରେର ଦୂରତ୍ଵ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୬ ଓ ୧୨୧ କିମି । କଲକାତା ଥେକେ ଗାଡ଼ିତେ ଆଶି କିମି । ମନ୍ଦିରେର ପାଶେ ରୂପନାରାୟଣ ନଦୀ । ହାଓଡ଼ା ଥେକେ ସୋଜା ତମଲୁକେ ଯାଓଯା ଯାଯ ।

ମନ୍ଦିରେର ଠିକାନା:

ମୌଜା : ପାର୍ବତୀପୁର, ପୌ : ଓ ଥାନା : ତମଲୁକ, ଜେଲା ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର, ପିନ : ୭୨୧୬୩୬ ।



প্রয়াগে দেবী ললিতা

পীঠনির্ণয় অনুযায়ী বিংশতিতম শাক্তপীঠ রয়েছে এলাহাবাদের প্রয়াগে। সেখানে বলা আছে,

‘অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ।’

এই তথ্য অনুযায়ী ধারণা করা যায় মা সতীর হাতের আঙুল পড়েছিল প্রয়াগে। এখানে দেবীর নাম ললিতা, ভৈরবের নাম ভব। এই শাক্তপীঠের বর্ণনা করতে গিয়ে ভারতচন্দ্ৰ বলেছে,

‘প্রয়াগেতে দু'হাতের অঙ্গুলী সরস।

তাহাতে ভৈরবের দশ, মহাবিদ্যা দশ॥।’

প্রয়াগের নাম উঠলেই এসে যায়, কুস্তিমেলার কথা। এটি অবশ্যই একটি মহাশাক্তপীঠ। শিবচরিতে বলা হয়েছে, এখানে দেবীর নাম ‘ললিতা’ এবং ভৈরবের নাম ‘বৈশিমাধব’। স্থানীয় নদীর ঘাটের উত্তর-পূর্বদিকে প্রায় এক ক্ষেত্র দূরে রয়েছে ললিতাদেবীর মন্দির। স্থানীয় মানুষেরা মা’কে আলোপী দেবী নামে সম্মোধন করেন।

যিনি ললিতা তিনিই আবার ত্রিপুরা। দেবীর রহস্য উম্মোচনে দুঁটি বই-এর সন্ধান পাওয়া যায়। ‘ললিতোপাখ্যানম্’ ও ‘ত্রিপুরারহস্যম’। পৌরাণিক যুগে ভগ্নাসুর নামে জনেক দৈত্য শিবের আরাধনা শুরু করে। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে অভয় বর দেন। এই বর পাওয়ার পর ভগ্নাসুর হয়ে ওঠে ভয়ঃকর। সে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয় দেবতাদের। সেই অসুর বিশ্রাককে পুথিদীর, বিষক্কে পাতালের দায়িত্ব দিয়ে, নিজে স্বর্গের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে এরপর ইন্দ্রের স্তৰ শচীদেবীর রূপের কথা শুনে তৎপর হয়ে ওঠে ভগ্নাসুর। এছাড়া স্বর্ণের রাজা হিসেবে দেবতাদের ভারবাহী ভৃত্যে পরিণত করেন। একসময় ভগ্নাসুর শুনতে পায়, ইন্দ্রের স্তৰ কৈলাসে দেবী গৌরীর শরণাপন্ন হয়েছেন। শোনামাত্রই ভগ্নাসুর সেখানে গিয়ে শচীকে প্রার্থনা করে। অসুরের স্পর্ধার কথা শুনে মহামায়া তাঁকে মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হন। সেই মুহূর্তে ব্রহ্ম এসে মহামায়াকে দেবাদিদেবের বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন দেবী সাময়িকভাবে ভগ্নাসুরকে অব্যাহতি দেন। ছাড়া পাওয়ার পর আরও অত্যাচারী হয়ে ওঠে ভগ্নাসুর। তখন বৃহস্পতি দেবতাদের বললেন, তপ্তানুসারে মহামায়ার উদ্দেশ্যে মহাযাগ অনুষ্ঠান করতে। সেই স্বাদে দেবতারা নিজেদের দেহের মাংস কেটে মহামায়ার উদ্দেশ্যে হোমাগ্রিতে আশ্রতি দিলেন। তা সত্ত্বেও দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তখন দেবতারা ঠিক করলেন, তারা সবাই

নিজেদের দেহ আছতি দেবেন হোমাগ্নিতে। সেই সময় দেখা গেল, হোমের আগুনের মধ্যে থেকে ভোরের সূর্যের প্রভাবের মতো তেজস্বিতা নিয়ে আবির্ভূতা হলেন দেবী ললিতা। বলাবাহ্ল্য, তিনি ছিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সমন্বিত শক্তি। রক্ষণবস্তু পরিহিতা ও সর্বাভরণ তৃষ্ণিতা। তাঁর চারহাতে পাশ, অঙ্কুশ, ইঙ্কু-কোদাও এবং পঞ্চবাণ শোভা পাচ্ছিল। দেবী ললিতার উপস্থিতিতে দেবতারা তাঁদের হারানো মনোবল ফিরে পেলেন এবং ভগ্নাসুরের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য স্তব করে তাঁকে তুষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন। তাঁদের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী বললেন,

অহমেব বিনির্জত্য ভগ্নং দৈত্যকুলেশ্বরম্।

অচিবাওব দাস্যামি ত্রেলোকং সচরাচরম্।

নির্ভয়া মুদিতাঃ সন্ত সর্বে দেবগণাস্তথা॥।

অর্থাৎ, হে ইন্দ্র, আমি অচিরেই দৈত্যরাজ ভগ্নাসুরকে পরাজিত করে তোমাকে ত্রিলোকের অধিপতি করব। হে দেবগণ! তোমরাও নিঃশক্ত হও।

তারপর দেবী ললিতা শ্রীচক্রন্তাক রথে আরোহণ করে ভগ্নাসুরকে মারার জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁর শক্তি ছিল, বালাস্বা, মন্ত্রিণী ও বারাহী। তাঁরা সবাই মিলে দৈত্যসেনাদের হত্যা করলেন আর দেবী প্রচণ্ড সংঘর্ষের পরে মহাকামেশ্বর নামক দিব্যাস্ত্র দিয়ে ভগ্নাসুরকে নিধন করে ত্রিভুবনে শাস্তি ফিরিয়ে আনলেন। ললিতা দেবীর মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। ভেতরে একটি পাথরের তৈরি বেদি আছে। মাঝখানে রয়েছে চার হাত পরিমাণ গর্ত, যার মধ্যে রয়েছে দেবীর পীঠ। গর্তের মধ্যে একটি দোলা ঝোলানো হয়েছে। এটিই হচ্ছে দেবীর আসন। এই দেবীর কাছে বসে ব্রহ্মাণ্ডেরা দেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি ও মন্ত্রপাঠ করেন।

১৫৮৩ সালে এলাহাবাদ শহরের নামকরণ করেন সন্দাট আকবর। আরবি ভাষায় এই শহরের উচ্চারণ করা হয় ইলাহাবাদ নামকরণের মূল সূত্র হল আকবর প্রণীত ধর্ম দিন-ই-ইলাহি'র অবলম্বনে। 'আবাদ' একটি পার্সি শব্দ, যার অর্থ হল, কিছু তৈরি বা সৃষ্টি করা।

'প্রয়াগ' একটি হিন্দু শব্দ যার অর্থ 'ত্যাগের জায়গা'। প্রচলিত বিশ্বাস, এই পৃথিবী সৃষ্টি করার পর ব্রহ্মা এখানে তাঁর প্রথম ত্যাগ স্থাকার করেছিলেন। এখানেই রয়েছে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম। মহৰ্ষি মার্কণ্ডেয় দ্বাপরে মোক্ষ'র গোপন তথ্য এবং ললিতা দেবীর আবাসস্থল প্রয়াগে শাস্তির প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে ব্যাখ্যা করেন। লোক বিশ্বাস, যে জায়গায় সতীর আঙুল পড়েছিল সেই জায়গাটির একদা নাম ছিল মীরাপুর। দেবীর মন্দির ছাড়াও রয়েছে বেণীমাধব, অক্ষয় বট। রয়েছে পাতালপুরীর মন্দির।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : এলাহাবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘাট থেকে মন্দিরে যাওয়ার জন্য রিকশা পাওয়া যায়। এখানে হোটেল, বিভিন্ন যাত্রীনিবাস এবং ভারত সেবাশ্রমে থাকার জায়গা রয়েছে।

জ্বালামুখী

হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকার তিরিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে একান্নটি সতীপীঠের অন্যতম জ্বালাজীর মন্দির। পৌঁঠ নির্ণয়ের মতে দেবীর জিভ পড়েছিল জ্বালামুখীতে। পৌঁঠস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, জ্বালামুখ্যাং তথা জিহ্বা (মহাজিহ্বাঃ) দেব উন্মত্তভৈরতঃ অস্মিকা সিদ্ধিদানাম্বী (দেবী) ... ॥

তারই ব্যাখ্যায় বাঙালি কবি লিখেছেন,

‘জ্বালামুখে জিহ্বা তাতে অঞ্চি অনুভব।

দেবীর অস্মিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব।’

দেবীর নাম ‘অস্মিকা’, ভৈরবের নাম ‘উন্মত্ত’। দেবীকে অনেক ভক্ত ডাকেন ‘সিদ্ধিদা’ নামে। আবার কেউ বা বলেন, জ্বালাদেবী বা লন্ঠনওয়ালী মাঝে। মন্দিরের উচ্চতা সমুদ্রসমতল থেকে দু'হাজার ফুট উঁচু। তবে আবুল ফজলের আইন-ই আকবরীর মাধ্যমে এই মন্দির সম্পর্ক ঘোড়শ শতাব্দীর হিন্দুদের কাছ থেকে অন্য ধরনের কাহিনী শোনা যায়। যেমন, (১) মহামায়ার মুণ্ড এবং কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়েছিল উন্নত কাশ্মীরে (২) কিছু অংশ পড়েছিল দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরের কাছে তুলজা বা তুরজা ভবানীতে (৩) কিছু অংশ পড়েছিল পূর্ব ভারতের কামরূপে ও (৪) বাকি অংশ পড়েছিল নগরকোটের কাছে—জালন্ধরী নামে ভক্তেরা পুজো করেন দেবীকে। অনেক দ্র থেকে তীর্থ্যাত্রীরা এখানে আসেন পুণ্যের আশায়। শোনা যায়, এখানে নাকি অতিপুণ্যের আশায় ভক্তেরা তাদের নিজেদের জিভ কেটে দেবীকে অর্পণ করেন। কারও কারও নাকি তখনই জিভ গজিয়ে যায়, কারও কারও গজায় দু-এক দিন পরে। তবে এ সবই শোনা কথা।

রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা হেঁটে পাহাড়ের ওপর উঠতে হয়। সমতল থেকে উচ্চতা ১৭৩৭ মিটার। সামনে চাতাল, পশ্চিম দিকে মায়ের মন্দির। পাহাড়ের মাঝে মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। মহারাজ রণজিৎ সিং সোনা দিয়ে মন্দিরের চূড়া বাঁধিয়ে দেন। প্রবেশ দরজার দু'পাশে রয়েছে বামের মূর্তি। তবে মন্দিরের দেবীর কোনও প্রাকৃত মূর্তি নেই। সেখানে পাথরের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে অগ্নিশিখা। এখানে একই সঙ্গে ন'ষ্টি মুখ দিয়ে দেবীর জিভ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। তাই দেবীকে ডাকা হয় ন'ষ্টি ভিন্ন ভিন্ন নামে, মহাকালি, উন্পূর্ণা, চণ্ডী হিংলাজ, বিন্ধ্যবাসিনী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, অস্মিকা এবং অঞ্জিদেবী। কোনও প্রদীপ জ্বালানোর তেল অথবা সাহায্য ছাড়াই এই অনৰ্বাণ শিখা জুলছে।

সুদূর অতীতে হিমালয় অঞ্চলে রাক্ষসরা রাজত্ব করত এবং দেবতাদের নানানভাবে বিরক্ত করত। একসময় ভগবান বিষ্ণুর নেতৃত্বে দেবতারা ওই রাক্ষসদের ধ্বংস করার শপথ নেন। তখন ওই পাহাড়ে নিরস্তর জুলতে থাকা আগুনের মধ্যে এক তরঙ্গীর জন্ম হয়। আবির্ভূত হন মা আদ্যাশক্তি। এই নটি আগুনের শিখার মধ্যে একটি শিখাকে বিশেষভাবে পুজো করা হয়।

মন্দিরের মাঝখানে একটি কুণ্ড আছে। তার উত্তরদিকে চারটি শিখা রয়েছে, মাঝখানে আছে দুটি শিখা। একটি শিখা খুবই শক্তিশালী। অন্য দুটি শিখা বা জ্যোতি কখনও প্রকট, কখনও বা অপ্রকট থাকে। কুণ্ডের মধ্যেই ভক্তেরা পুজো ও হোম করে। এই জ্যোতি বা শিখা থেকে আগুন জুলিয়ে নেয়। রীতি হল, হোমকুণ্ডে পুজো দেবার পরে নির্দিষ্ট শিখার পুজো করতে হয়। হোমকুণ্ডের পাশেই মায়ের চরণচিহ্ন হিসেবে পাথরের গায়ে দুটি পদচিহ্ন দেখানো হয়। মন্দিরের ওপরে আছে দুটি তপ্তকুণ্ড—ব্রহ্মকুণ্ড ও গোমুখী। এখনকার জল স্পর্শ করতে হয়। পাহাড়ের ওপরে জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে বৈরবের মন্দির।

মন্দিরের উত্তরদিকের দেয়ালের মাঝখানে যে জ্যোতি (শিখা) আছে সেটিই নাকি আদি। তাই সেখানের দেয়ালে গহুর করে কৃপোর সিংহাসন বসানো আছে। এই জায়গাটিকে বলা হয় দেবীর প্রধান গদি। জ্বালাজী দেবীর পুজো ও পুস্পাঙ্গলি এই সিংহাসনের সামনে অর্পণ করা হয়। এর পশ্চিমে দেবীর ভাগুরের সাজাই কলসি থাকে। এই গদির পশ্চিম-উত্তর কোণে যে প্রবল জ্যোতি আছে তার নাম হিঙ্গরাজ। এই শিখার মধ্যে দুধ, পঁয়াড়া—যা কিছুই দেওয়া হয় তাই মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পূর্বদিকে আর একটি জ্যোতি শিখা আছে। তার নাম অন্নপূর্ণা। এখানেও যা কিছু পুজো দেওয়া হয় মুহূর্তের মধ্যে তা ভস্মীভূত হয়ে যায়। মন্দিরের বাইরে পূর্বদিকে যেখানে হনুমানের মূর্তি দেয়ালের মধ্যে আছে সেখানে রয়েছে একটি গুপ্ত জ্যোতি। রাতে এই জ্যোতির উত্তাপ এতটাই বেড়ে যায় যে তার দিকে এগোনো যায় না। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে দিনের বেলায় তাপ তেমন থাকে না। উত্তরদিকে রয়েছে গোরক্ষনাথের গদি। এর কাছে দুটি শিখা রয়েছে। কাছেই একটি কুয়ো আছে। কুয়োর জলে আগুনের বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। কুয়োর জলে হাত দিয়ে আলোড়িত করে দেবীর জ্যোতি থেকে দীপ জুলিয়ে ওই জলের কাছে নিয়ে গেলে আগুনের শিখা প্রবলভাবে প্রজ্জলিত হয় এবং সেই সঙ্গে ভয়ানক শব্দের সৃষ্টি হয়। এর স্বপক্ষে অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা তাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভূমিকম্প হবার পরে নাকি কয়েক বছর সাতটি অগ্নিশিখা জুলেনি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য আবার শিখাগুলি জুলতে থাকে। নারকেল, পঁয়াড়া, ছোলা, মুড়ি দিয়ে দেবীর ভোগ দেওয়া হয়।

এক সময় মোগল সশ্রাট আকবর এই আগুনের শিখা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তখন তিনি দেবীর কাছে মানসিকভাবে আত্মনিবেদন

করে তামার ওপর সোনার ছাতা তৈরি করিয়ে দেন। মহারাজা রঞ্জিত সিং ১৮০৯ সালে এই মন্দির পরিদর্শন করেন। তাঁর ছেলে খরক সিং এক জোড়া রূপোর দরজা মন্দিরের জন্য তৈরি করিয়ে দেন। মহারাজা রঞ্জিত সিং মন্দিরের ছাদ তৈরি করানোর বন্দোবস্ত করেন। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, একসময় এই মন্দিরে নৃত্য পরিবেশন করার জন্য সুন্দরী নৃত্যশিল্পীরা উপস্থিত থাকত। রাজাদের রাজস্বের সময় মন্দিরের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করতেন নাদুয়ানের রাজা। তিনিই পুরোহিতদের নিয়োগ করতেন। দেশের স্বাধীনতার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পালটে যায়। এখন সরকারের পক্ষে থেকে এই মন্দিরের পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। মন্দিরে ভক্তদের দান করা টাকার একাংশ খরচ করা হয় যাত্রী পরিবেশের উন্নতি বিধানে। সারাদিনে এই মন্দিরে পাঁচবার আরতি হয়। সূর্যোদয়ের আগে প্রথম আরতি হয়, যা মঙ্গলারতি নামে পরিচিত। দ্বিতীয় আরতি হয় সূর্যোদয়ের সামনে, যাকে ‘পঞ্চপূজন’ বলা হয়ে থাকে। মধ্যাহ্নে একবার দেবীর আরতি করা হয়। একে বলা হয়, ‘ভোগ কী আরতি’। এরপর সন্ধ্যা সাতটার সময় যা শুধুমাত্র আরতি হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া রাত দশটার সময় আয়োজন করা হয় ‘শয়ান কী আরতি’। দিনের এই আরতি আক্ষরিক অর্থে অভিনব। এইসময় নানান ধরনের ফুল এবং গয়না দিয়ে দেবীর শয্যাকে সাজানো হয়। দু'ভাগে এই আরতিকে উপস্থাপিত করা হয়। একই সঙ্গে পড়া হয় শ্রীশক্রাচার্য সৃষ্টি ‘সন্ধ্যারায়া লহরি’। দেবীর উদ্দেশে ভোগ হিসেবে ঘন দুধের রাবড়ি, মিছরি, মরশুমি ফল, দুধ প্রভৃতি নিবেদন করা হয়।

মন্দিরের আধ মাইল ওপরে উন্নত তৈরির মন্দির রয়েছে। কারও কারও মতে, উন্মত্তেশ্বর তৈরির পাহাড়ের মধ্যে গুহায় অপুকট অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। বিষাক্ত সাপেরা নাকি তাকে সেখানে ঘিরে আছে। গুহাটি খুবই অঙ্ককার। তাই দেবী ও তৈরবের নির্দেশে নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গকেই পুজো করা হয়।

জ্বালামুখী মন্দিরের গঠনশৈলী স্থাপত্যবিদদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে দেবীর কোণও প্রাকৃত মূর্তি নেই। মন্দিরের চূড়াটি গম্বুজ আকারের। কথিত আছে, কাঞ্চরার রাজা ভূমিচাঁদ কাতোচ সর্বপ্রথম স্বপ্নে দেবীর অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশ পেয়েছিলেন। তারপর সেই জায়গাটি খুঁজে বের করে তিনি সেখানে মন্দির তৈরি করান। মন্দিরের সামনে একটি ছোট নাটমন্দির যেখানে নেপালের রাজার দেওয়া অসংখ্য পেতলের ঘণ্টা খোলানো আছে। মা জ্বালাজী সম্পর্কে আর একটি প্রবাদ শোনা যায়। দক্ষিণ ভারতের জনৈক ব্রাহ্মণকে দেবী স্বপ্ন দিয়ে কাঞ্চরার পাহাড়ে প্রজ্ঞালিত অগ্নিশিখা খুঁজে বের করতে বলেন। সেই দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণই নাকি ওই জায়গায় দেবীর লীলা আবিষ্কার করে সেখানে মন্দির তৈরি করান। দেবীর সম্পর্কে আরও অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। একবার গুরু গোরক্ষনাথ জ্বালামুখী মন্দির দর্শন করতে আসেন। দেবী তাঁকে তাঁর আতিথেয়তা গ্রহণ করতে বলেন। কিন্তু দেবী তাকে রাখা করা খাবার খেতে বললেও তিনি, যারা এখানে আসেন তাদের খাবারের কোনও নিয়মনীতি মানেন

না, এ অজুহাতে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দেবীর বারংবার অনুরোধে গোরক্ষনাথজি চাল-ডাল দিয়ে সেখানে খিচুড়ি রান্না করার প্রতিশ্রুতি দেন। তবে তার আগে তিনি ভিক্ষে করে চাল-ডাল সংগ্রহ করে আনবেন বলে দেবীকে জানান। তিনি দেবীকে অনুরোধ করেন জল গরম করে রাখতে যাতে তিনি ভিক্ষান্ন নিয়ে ফিরলেই সময় নষ্ট না করে সেখানে রান্না করতে পারেন। কিন্তু গুরু গোরক্ষনাথ সেখানে ফিরে এলেন না। অপেক্ষা করতে করতে একসময় দেবী তাঁর শিষ্য নাগার্জনকে গোরক্ষনাথজির খোঁজ করতে পাঠালেন। খোঁজ করতে করতে ভীম দেখলেন রোহিণী এবং তাণ্ডি নদীর সংযোগস্থলে গোরক্ষনাথ অবস্থান করছেন। কালক্রমে এই জ্যায়গাটিই গোরক্ষপুর নামে পরিচিত হয়। ভীম দেখলেন গুরু গোরক্ষনাথের ভিক্ষার ঝুলি তখনও পূর্ণ হয়নি।

কীভাবে ঘৰেন?

পাঠানকোট থেকে যোগীন্দ্র নগরের ট্রেনে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে নামতে হবে। সেখানে বাসে বা শেয়ার ট্যাক্সিতে মন্দিরের কাছে যাওয়া যায়। অথবা ধরমশালা থেকে জ্বালামুখী বাসে যাওয়া যায়। পথের দূরত্ব ৫৬ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে হিমগিরি বা জন্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস পাঠানকোট পৌছে বাস ধরমশালা যেতে হবে। সেখান থেকে জ্বালামুখী যেতে হবে। মন্দির থেকে সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশনের নাম জ্বালাজী রোড। মন্দির থেকে দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য পরিবহনের বাস এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। জ্বালামুখী মন্দির থেকে সবচেয়ে কাছে বিমানবন্দরের নাম হিমাচল প্রদেশের জঙ্গল। দূরত্ব ৫০ কিলোমিটার। দিল্লি থেকে বিমানপথের দূরত্ব ৪৮০ কিলোমিটার।

নবরাত্রি এবং শিবরাত্রির সময়ে এখানে বিশাল মেলা বসে। যাত্রীদের থাকার জন্য এখানে ধর্মশালা আছে। এছাড়াও পূর্তবিভাগ, ন্যাচারাল অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কমিশনের বিশ্রাম ভবন ও কয়েকটি হোটেল আছে।



মানস সরোবরে মা দাক্ষায়ণী

পীঠনির্ণয়ের উল্লেখ আছে, একান্নপীঠের নবম পীঠ আছে মানস সরোবরের তীরে। সেখানে
বলা হয়েছে,

‘মানসে দক্ষ হঙ্গো মে দেবী দাক্ষায়ণী হৰ।

অমরো ভৈরবস্তু সবসিদ্ধি প্রদায়কঃ।’

অর্থাৎ মানস সরোবরের তীরে যে দেবীর অধিষ্ঠান তাঁর নাম দাক্ষায়ণী ও ভৈরবের
নাম অমর। এখানে পড়েছে দেবীর দক্ষিণ হাত। এ প্রসঙ্গে জনৈক বাঙালি কবি লিখেছেন,

‘আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মান সরোবরে।

দেবী দাক্ষায়ণী হৰ ভৈরব বিহৱে।।’

এখানে অবশ্য কবি দেবীর দক্ষিণ হাত না বলে, বলেছেন, ‘অর্দ্ধ ডানি হাতঁ। অন্য একটি লেখায় এই পীঠের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ‘মালবে দক্ষহস্তং।’ পীঠনির্ণয়ের আর একটি পাঞ্চলিপিতে ‘মানস’ না বলে ‘মালব’ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে ‘দাক্ষায়ণী হরিঃ।’ ‘নামষ্টোত্তরশতম’-এ বলা হয়েছে, ‘মানসে কুমুদা নাম বিশ্বকায়া তথাস্বরে।’ তবে পীঠনির্ণয়ের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। তবে সতীর আর এক নাম যে দাক্ষায়ণী সে বিষয়ে অবশ্য নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ যিনি সতেরোবার পায়ে হেঁটে বৃহত্তম ভারত পরিগ্রহ করেছেন তিনি মানস সরোবরে সতীপীঠের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাঁর ডায়েরিতে লেখা আছে, এই মানস হল তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবর। দেবীর বাম হাতের অর্ধেক এখানে পড়েছে।

ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু, সিঙ্গু^ও কণালীর উৎস—এই চারটি নদীর উৎস হল মানস সরোবর। একসময় শোনা যেত, গঙ্গার উদ্গৃবণ না কি মানস সরোবর। পরবর্তী সময়ে সেই তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়।

১৭১৫ সালের ৯ নভেম্বর তার্তার রাজমহিষী প্রিসেস কাসালস গিয়েছিলেন কৈলাস-মানস সরোবরে। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন দু'জন ধর্মপ্রচারক পি ডেসিডেসিয়াস এবং এমানুয়াল ফ্রেইয়ার। ডেসিডেসিয়াসের লেখা একটি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয় দু'শ বছর পরে।

একান্নপীঠের মধ্যে বেশ কয়েকটি পীঠ রয়েছে ভারতীয় ভূখণ্ডের বাইরে। তারই

ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ମାନସ ସରୋବରା ବାଲ୍ମୀକି ତା'ର ରାମାୟଣେ ମାନସ ସରୋବରେର ଉତ୍ସପତ୍ତି ଓ ନାମକରଣେର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଆଦିକାଣ୍ଡ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ସର୍ଗେ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରେର ସଙ୍ଗେ ନୌକାଯୋଗେ ଗଞ୍ଜା ପାର ହଛିଲେନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର । ସର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗଞ୍ଜାର ସମ୍ମେର କାହେ ଜଳରାଶିର ତୁମୁଲ ଶଦ୍ଦେର କାରଣ କି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରେର ଏ-ପଥେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଲେନ,

“କୈଲାସପର୍ବତେ ରାମ ମନସା ନିର୍ମିତଃ ପରମ ॥
ବ୍ରଦ୍ଧା ନରଶାର୍ଦୁଲା ତେନେଦଂ ମାନସଃ ସରଃ ।
ତ୍ସାଂ ସୁତ୍ରାବ ସରସଃ ସାଯୋଧ୍ୟାମୁପଗୃହତେ ॥
ସରଃପ୍ରବୃତ୍ତା ସର୍ଯ୍ୟଃ ପୁଣ୍ୟବରଦ୍ଧାସରଶ୍ଚତା ।
ତସ୍ୟାୟମତୁଳଃ ଶଦ୍ଦୋ ଜାହିମଭିବର୍ତ୍ତତେ” ॥

ହେ ନରଶାର୍ଦୁଲ ରାମ ! ପୁରାକାଳେ ବ୍ରଦ୍ଧା କୈଲାସ ପର୍ବତେ ମନେର ଦ୍ୱାରା ଏକ ସରୋବର ନିର୍ମାଣ କରାନ । ବ୍ରଦ୍ଧାର ମାନସ-ଉତ୍ସୁତ, ତାଇ ନାମ ହୟେଛେ ମାନସ ସରୋବର । ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ ଧର୍ମ ପଥେ ଯେ ପୁନଃହାଦେର ଉତ୍ତଳେଖ ଆହେ, ସେଟିଇ ନାକି ଏହି ମାନସ ସରୋବର । ବିହାରେର ଭାଗଲପୁର ଜେଲାର ବିକ୍ରମଶୀଳ ବିହାରେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛିଲେନ ଅତୀଶ ଦୀପକ୍ଷର । ତନ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ଥେକେ ତିରକତକେ ବଁଚାତେ ୧୦୪୦ ଖିସ୍ଟାବେ ତିନି ସେ ଦେଶେର ରାଜାର ଆମନ୍ତ୍ରଣେ ତିରକତ ରଓଯାନା ହନ । ତିରକତ ପୌଛନୋର ସମୟ ତା'ର ବୟସ ଛିଲ ୬୦ ବର୍ଷ । ୧୦୫୪ ଖିସ୍ଟାବେ ଲାସାର ଦଶ କିଲୋମିଟାର ପଶିମେ ନେବାଂଯେ ତିନି ଶେଷ ନିଶ୍ଚାସ ତ୍ୟାଗ କରେନ । ସୁଇଡେନେର ସ୍କ୍ରେନ ହେଡିନ ୧୯୦୭ ଖିସ୍ଟାବେ ମଧ୍ୟ ଏଶ୍ୟା ଭରମଣେ ଆସେନ । ତିନି ମାନସ ସରୋବରେର ବିଭିନ୍ନ ଦିକେ ଗଭୀରତା ମାପେନ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିମାପ ଛିଲ ୨୬୮.୪ ଫୁଟ । ହେଡିନ ଲିଖେଛେ, ‘Never has a church service, a wedding march, hymn of victory, or a funeral made a more powerful impression on me... Wonderful, attractive, enchanting lake theme of story and legend, playground of storms and changes of colour, apple of the eye Gods and men, goal of weary, yearning pilgrims, holiest of the lakes, art thou, Tso-Mavong, lake of all lakes.’ ମାନସ ସରୋବରେର ଆୟତନ ୩୨୯ ବଗକିଲୋମିଟାର । ତିରତୀରା ଏହି ସରୋବରକେ ‘Tso Mapham’ ବା ‘Tso Mavang’ ନାମେ ଡାକେନ । ପରିଧି ୮୭ କିଲୋମିଟାର । ମାନସ ସରୋବରେ ଚାରଦିକ ଘୁରତେ ହଲେ ପ୍ରାୟ ୯୩ କିଲୋମିଟାର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରତେ ହୁଁ । ପାଯେ ହେଠେ ପରିକ୍ରମା କରତେ କମପକ୍ଷେ ଚାର ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ।

ମାନସ ସରୋବରେର ଚାରଦିକେ ଆଟୁଟି ଗୁମ୍ଫା ଛିଲ । ପଶି ମ ତୀରେ ଗୋସୁଲ । ଉତ୍ତର-ପଶି ମ କୋଣେ ଚିଉ ବା ଛିଉ ଗୁମ୍ଫା । ଉତ୍ତରଦିକେ ରଯେଛେ ଚେରକିପ, ଲାଂପୋନା ଓ ପନରି । ପୁବଦିକେ ସେରାଲୁୁ, ଦକ୍ଷିଣଦିକେ ଏରଗୋ ଓ ଥୁଗୋଲହୋ । ୧୯୫୯ ଖିସ୍ଟାବେ ତିରକତ ଆକ୍ରମଣେର ଏବଂ ୧୯୬୭ ସାଲେ ସାଂକ୍ଷତିକ ବିପ୍ଳବେର ସମୟ ଚିନାରା ବେଶ କରେକଟି ଗୁମ୍ଫା ଭେଙେ ଦେଇଲା ।

ଫିରେ ଆସି ସତୀପୀଠ ବର୍ଣ୍ଣନାୟ । ମାନସ ସରୋବରେର ତୀରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଶିଲାଯ ଅବସ୍ଥାନ କରଛେ ଦେବୀ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ । ଚିନ୍ତାହରଣ ଚତୁର୍ବତୀ ତା'ର ‘ତନ୍ତ୍ରକଥାୟ’ ଲିଖେଛେ, ମାନସ ସରୋବରେର

দেবী হলেন ভীষণাকৃতি দশভুজা। অবশ্য ‘পুণ্যতীর্থ ভারত’ বইয়ের লেখক জনেক সন্ম্যাসী, মানস সরোবর ও কৈলাস ভ্রমণ করে কোনও সতীপীঠের সন্ধান পাননি।

ভূ-পর্যটক সমীর রায় অনেকবার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে গিয়েছেন মানস-কৈলাসে। তিনি জানিয়েছেন, মানস সরোবরের ধারে ছিউ নামে বৌদ্ধদের একটি গুম্ফা আছে। একটি টিলার ওপর গুম্ফাটি অবস্থিত। সেই টিলার মাঝামাঝি গুহার মতো জায়গায় দাক্ষায়ণী আছেন, কিন্তু তাঁর কোনও পুজো করা হয় না। সেখানে কোনও হিন্দু পুরোহিত নেই। দাক্ষায়ণী’র গুহার লোহার দরজা সবসময় বন্ধ থাকে। লামারা সন্ধ্যাবেলা সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলে দেন। যে সব হিন্দু ভক্ত মানস সরোবরে যান তাদের অনেকেই জানেন-ই না যে ছিউ গুম্ফায় দাক্ষায়ণী আছেন। যাঁরা জানেন তারা লামাদের অনুরোধ করলে দরজা খুলে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মানস সরোবর থেকে পাথর ছেঁড়া দূরত্বে এই গুম্ফার অবস্থান। কোনও প্রাকৃত মূর্তি সেখানে নেই। তবে সেখানে একটি শিলাখণ্ড আছে। মানস সরোবরে স্থান করার জন্য যাঁরা ছিউ গুম্ফার পাশ দিয়ে যান তারা অনায়াসে এখানে থাকতে পারেন। এখানে পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে। সমীরবাবু আরও জানান, আমি সঙ্গীসাথীদের ৫০-৬০ বার মানসসরোবরে গেছি, তার মধ্যে ৪০ বার আমরা ওই গুম্ফায় থেকেছি। উল্লেখ্য, লামারাও দেবী দাক্ষায়ণী সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাঁরা শুধু জানেন, অনেকদিন ধরে কোনও হিন্দুদেবী সেখানে রয়েছেন। শোনা যায়, পুরাকালে কোনও পুরোহিত দেবীর পুজো করতেন। তবে লামারা ঘরটি নষ্ট করেননি এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁরা সেখানে একটি প্রদীপ জ্বলে দেন। ইয়াকের চর্বির সাহায্যে ওই প্রদীপ জ্বলে। সমগ্র জায়গাটি জনমানবশূন্য। হাতে গোনা কয়েকজন লামা সেখানে থাকেন। গুম্ফার রেস্ট হাউসে কয়েকজন কেয়ারটেকার আছেন। আশেপাশে তেমন কোনও প্রামাণ নেই।

এটি মানস সরোবরের উত্তর দিক। গাড়ি করে সরাসরি এখানে চলে আসা যায়। কৈলাস পর্বতের দূরত্ব এখান থেকে মাত্র তিরিশ কিলোমিটার। তবে পর্যটকেরা লামাদের অনুরোধ করলে তাদের বক্ষিত করা হয় না দেবীগুহা দেখানোর ব্যাপারে। কোনও উৎসব এখানে হয় না বা এখান থেকে দেবীর কোনও প্রসাদও পাওয়া যায় না। যদিও জায়গাটি ১৫০০০ ফুট উচ্চতে অবস্থিত তা সত্ত্বেও গরমের দিনে এখানে তেমন ঠাণ্ডা নেই। বলা বাহ্যিক, শীতের সময় যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ে। যখন মাও-সে-তুং-এর স্তৰীর নির্দেশে সৈন্যবাহিনী প্রায় কুড়ি হাজার গুম্ফা ভেঙে দিয়েছিলেন, ছিউ গুম্ফার কুড়ি শতাংশ ভাঙা পড়েছিল। যেহেতু দেবী দাক্ষায়ণী শিলাখণ্ডে একটি গুহার মধ্যে রয়েছেন সেজন্য ঝংসকারীরা বোধহয় তা বুঝতে পারেনি।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, মানস সরোবরের কাছে এখন বিদ্যুৎ পৌছেছে। ছিউ গুম্ফায় শিক্ষার্থী ছাড়াও তাদের প্রশিক্ষক থাকেন। নেপাল-চীন থেকে এখানে পৌছাতে সময় লাগে চারদিন। দূরত্ব এর হাজার কিলোমিটার। অতীতে রাস্তায় যেখানে আমরা রাত্রিবাস

করতাম সেখানে বিদ্যুৎ বা টেলিফোন ছিল না। এখন এই সুবিধা পাওয়া যায়। টেলিফোন বুথ হয়ে গেছে। আই এস ডি করার সুবিধাও পাওয়া যায়। শুধু মরুভূমি পার হওয়ার সময় পারিয়াং নামে একটি গ্রাম আছে। সেই জায়গায় এখনও তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। মানস সরোবরে যাওয়ার পথে এখানেই শেষ বারের মতো রাত্রিবাস করতে হয়। কৈলাস পর্বতের নীচে দারচেন নামে একটি জায়গা আছে। সেখানে টেলিফোনসহ বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত আছে, এমনকী মোবাইল ফোনেও সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যায়। পথে কোথাও পর্যটকদের বিপদে পড়তে হয় না। রাস্তার সর্বত্র সেনাবাহিনী পাহারা দেয়। যদিও তাদের দেখতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ের আড়ালে থেকে লুকিয়ে পাহারা দেয়। কয়েক বছর আগে শশরাচার্য শিবলিঙ্গ মানস সরোবরের ধারে প্রতিষ্ঠা করে এসেছিলেন। দু'মাসের মধ্যে চিনা সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা সেটিকে ভেঙে ফেলে দেয়। মস্ত বড় এই লিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করার প্রদেশ্য ছিল, যারা এখানে এসে পুজো দিতে চাইবেন তারা এর সামনে প্রার্থনা করতে পারবেন। কিন্তু চিনা সরকারের এই ব্যাপারটি পছন্দ না হওয়ায় সেটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তারা মনে করেন, পুরো বিষয়টিই কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।

pathagar.net



কাশ্মীরে ক্ষীরভবানী

পীঠনির্ণয়ে বলা আছে; একান্ন পীঠের চতুর্থটি আছে কাশ্মীরে।

কাশ্মীরে কঠদেশশ ত্রিসঙ্ক্ষেপ্যের ভৈরব।

মহামায়া ভগবতী গুণাতীত বরপূর্দ্ধা।।

অর্থাৎ সতীর কঠ পড়েছে কাশ্মীরে। সেখানে দেবী হচ্ছেন মহামায়া, ভৈরব হলেন ত্রিসঙ্ক্ষেপ্যের। অবশ্য শিব চরিত মতে, এটি হল অ্যোদ্য পীঠ। পীঠের অবস্থান ঠিক কোথায়, এই নিয়ে দীঘিদিন নানান দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। পরবর্তী সময়ে জানা যায়, শ্রীনগর থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে ‘তুল্লা মুল্লা’-য় দেবী ও ভৈরবের অবস্থান। মন্দিরের নাম ক্ষীর ভবানী। তবে এ সম্পর্কে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, দেবীর কঠ পড়েছে অমরনাথে। বজ্রতন্ত্র, কালিকাপুরাণ, রূদ্রবামন, কুলাইবত্তন্ত্র প্রাগতোষিণী বা বাচস্পত্য পীঠে এই সতীপীঠের কোনও উল্লেখ নেই। তবে জ্ঞানার্গ তন্ত্রে দেবী ভাগবতে, শঙ্করাচার্যের অষ্টাদশ পীঠের বর্ণনায় কাশ্মীরের এই পীঠের উল্লেখ আছে। কুজিকাতত্ত্বে দেবীর সারদার নাম উল্লেখ করা হয়েছে সিদ্ধপীঠ হিসেবে। রাজতরঙ্গিনীতেও এই জায়গার উল্লেখ করা হয়েছে সিদ্ধপীঠ হিসেবে। রাজতরঙ্গিনীতেও এই জায়গার উল্লেখ আছে। অলবেরুনীও ক্ষীর ভবানী কথা উল্লেখ করেছেন।

আবুল ফজল জানতেন, এ-ধনের চারটি সতীপীঠের কথা। তিনি লিখেছেন, মহামায়াকে বলা হয় শিবের পত্নী। যদিও শাস্ত্র পঞ্জিতদের মতে, তাঁকে মহাদেবের শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। স্বামীর প্রতি অপ্রয়াম সহ্য করতে না পারার জন্য সতী দেহত্যাগ করেন এবং আপন দেহ কর্তন করেন খণ্ডে খণ্ডে। তাঁর দেহের চারটি খণ্ড ছড়িয়ে পড়ে দেশের চারটি জায়গায়। মাথা ও অন্যান্য কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়েছে কামরাজের কাছে উত্তর কাশ্মীরের পাহাড়ে। লোকপ্রবাদ, দেবীর অঙ্গের এই অংশগুলিকেই বলা হয় শারদা। ক্ষীর ভবানীর ঐতিহাসিক নাম হল, ভূক্ষীরবার্তিকা। জানা যায়, একসময় এখানে তন্ত্র, শৈব ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল। ক্ষীর ভবানীর অপর নাম, রাগানিয়া দেবী। রূদ্রযামল তন্ত্রে, রাগানিয়া কবচের উল্লেখ আছে।

দেবী ক্ষীর ভবানীর উত্তরের সঙ্গে একটি পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। ত্রেতায়ুগে ক্ষীর ভবানী বা রাগানিয়া দেবী ছিলেন লক্ষ্মায় রাবণের কাছে। হনুমান, রাবণের অন্দরমহল থেকে দেবীকে নিয়ে আসেন কাশ্মীরে। মুসলমান রাজত্বের সময় এই মন্দির প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তারপর সাড়ে তিনশো বছর আগে কৃষ্ণপঞ্জিত তপিলু নামে জনৈক কাশ্মীরী

ବ୍ରାହ୍ମକଣ ଏହି ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରେନ । ଉନିବିଂଶ ଶତକେ କାଶ୍ମୀରେ ବୁଦ୍ଧନାଥ ଦାର ଏଥାନକାର କୁଣ୍ଡର ପାଁକ ପରିଷକାର କରାନ । ସେଇ ସମୟ ପାଁକେର ଭେତର ଏକଟି ମନ୍ଦିର ଓ କହେକଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଓଯା ଯାଯ । ୧୯୧୨ ସାଲେ କାଶ୍ମୀରେ ରାଜା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ତାଁ ଆମଲେ ସେଥାନେ ଏକଟି ମନ୍ଦିର ଓ ପାଥରେ ଦେବୀମୂର୍ତ୍ତି ତୈରି କରାନ । ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ଏହି ମନ୍ଦିରେ ସଂକ୍ଷାର କରାନ ।

ଦେବୀର ଧ୍ୟାନମନ୍ତ୍ର ହଲ,

ଶଞ୍ଚ ତ୍ରିଶୂଳଚାପ କରାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ
ତ୍ରିଗମେତରାଂ ସକଳୟା ବିକସଂ କିରିଟାଂ ।
ସିଂହଶ୍ଵିତାଂ ଅସୁରମିଦ୍ବନ୍ତନୁତାଃ ଚ ଦୁର୍ଗାଂ
ଦୁର୍ବାନିଭାଂ ଦୂରୀତ ଦୂଃଖହରିଂ ନମାମି ॥

ପ୍ରତି ବଛର ‘ମେ’ ମାସେର ଜୈଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମୀର ଦିନେ, ଯେଦିନ ଦେବୀର ଘରନାର ଜଳେର ରଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ବଲେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ବିଶ୍ୱାସ, ସେଦିନ ହାଜାର ହାଜାର ପୁଣ୍ୟଧୀରୀ ଏଥାନେ ସମବେତ ହନ ଏବଂ କୁଣ୍ଡର ଜଳେ ଦୂଧ ଓ କ୍ଷୀର ଦିଯେ ପୁଜୋ କରେନ । କାରାଓ କାରାଓ ମତେ, ଯଥନିଇ କୋନ୍ତା ବିପଦ ଆସେ ଘରନାର ଜଳେର ରଙ୍ଗ କାଳୋ ହେଁ ଯାଯ । ମତାନ୍ତରେ, ଓଇଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକଭାବେ ଘରନାର ଜଳ କାଳୋ ରଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଁ ଯାଯ । ଏହାଡ଼ାଓ ନବ ରାତ୍ରିର ନବମ ଦିନେ ଏଥାନେ ଅସଂଖ୍ୟା ଭକ୍ତୁସମାଗମ ହୁଏ । ଦଶମ ଦିନେ ତାରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେନ ଦଶେରା ଉତ୍ସବେ ।

ସହାନୀୟ ପାଞ୍ଚଦେର (ପୁରୋହିତ) କାଛେ ଶୋନା ଯାଏ, ଆର ଏକ ବିଚିତ୍ର କାହିନୀ । ଅନେକଦିନ ଆଗେ ତାଁଦେର ପୂର୍ବପୁରୁଷଦେର କାଛେ ଜୈନକୁ ମହିଳା କିଛୁ ଖେତେ ଚାନ । ତଥନ ତାରା ତାଁକେ ଗୋରର ଦୂଧ ଥେକେ କ୍ଷୀର ତୈରି କରେ ଥେତେ ଦେନ । ତାଦେର ବିଶ୍ୱାସ, ତିନିଇ ଶିବପତ୍ନୀ ଦୁର୍ଗା । ଆମଲକି ଗାଛେର ଛାଯାଯ ଏକଟି ଦ୍ଵୀପେର ମତୋ ଜାଯଗାଯ ଦେବୀର ଅଧିଷ୍ଠାନ । ମନ୍ଦିରେ ଚଢ଼ା ସୋନା ଦିଯେ ମୋଡ଼ା । ସାମନେଇ ରଯେଛେ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ।

ମନ୍ଦିରେ ଦେବୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାନ ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ମାନୁଷଙ୍କୁ । ତାଦେର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନ୍ତା ଭାଷା ଜାନା ନେଇ । ଏରକମ ଏକଜନ ମାନୁଷେର ନାମ ଗୁଲାମ ମହମ୍ମଦ । ଶ୍ରୀ ମାରା ଯାଓଯାର ପର ଏଥାନେଇ ଥାକେନ । ବଛରେ ଏକବାର ନିଜେର ବାଡିତେ ଯାନ ଦିନ କଯେକେର ଜନ୍ୟ । ଏହି ମନ୍ଦିରେର ଆଶେପାଶେ ପ୍ରସାଦ, ଛବି, ଫୁଲମାଳା ଓ ପୁଜୋର ନାନାନ ସାମଗ୍ରୀ ଯାରା ବିକ୍ରି କରେନ ତାଦେର ଅଧିକାଂଶଇ ମୁସଲମାନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଏହି ମନ୍ଦିରେର ଓପର ନିର୍ଭର କରେଇ ତାରା ତାଦେର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେନ ।

ପୌରାଣିକ ମତେ, ବନବାସେର ସମୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଦେବୀର ପୁଜୋ କରତେନ । ବନବାସପର୍ବ ଶେଷ ହେଁ ଯାବାର ପରେ ତିନି ହନୁମାନକେ, ଦେବୀକେ କାଶ୍ମୀରେ ନିଯେ ଆସାର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦେଶ ଦେନ । ଅନ୍ୟ ଏକ ମତେ, ଦେବୀ କ୍ଷୀର ଭବନୀ ରାଗନାଥ ଗାରୁ ନାମେ ଜନୈକ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କେ ସ୍ଵପ୍ନେ ଏଥାନେ ଥାକାର ଇଚ୍ଛେ ପ୍ରକାଶ କରେନ ।

ଶୁକ୍ଳପଞ୍ଚେର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିତେ ଏଥାନେ ଦେବୀର ବିଶେଷ ପୁଜୋ ହୁଏ । ଓଇ ଦିନ ଭକ୍ତେରା

সারাদিন উপোষ করে দেবীর কাছে তাদের প্রার্থনা জানান। মহাযজ্ঞের পরে বিশেষ পুজো শেষ হয়।

লক্ষ্মায় যখন দেবী থাকতেন তখন তাঁর নাম ছিল শ্যামা। রাগানিয়া দেবী দুর্গা হলেও আরেক মতে তিনি বৈষ্ণবী। কারও কারও মতে, এই দেবী হলেন শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী সীতা। দেবীর আর একটি নাম হল ‘ত্রিপুরা’। নবরত্নের সময় পঞ্চদশী মন্ত্র পাঠ করে দেবীর কাছে যা প্রার্থনা করা হয়, তিনি তা পূরণ করেন বলে ভগ্নদের বিশ্বাস। তিনশো ষাটটি জলধারা এই দেবীকুণ্ডে মিলিত হয়েছে। ‘তুল্লা-মুল্লা’ জায়গাটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রাজতরঙ্গিনীতে, যখন জয়া পেধার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে নীলামত পুরানায় এই জায়গার অবস্থান। শোনা যায়, হাজার বছর আগে এই জায়গাটি পুরোপুরি জলে ডুবে যায়। কৃষ্ণপঞ্চিত নামে জনৈক ভক্ত এই জায়গাটিকে পরে আবার চিহ্নিত করেন। জ্যৈষ্ঠ অষ্টমীর দিন রাতে দেবী স্বপ্ন দিয়ে তাঁকে বলেন, জলের ভেরত থেকে বের করে লোকচক্ষুর সামনে আনতে।

দারা শুকের উপদেষ্টা মহর্ষি শ্যামসুন্দর কাউল, যিনি একজন শান্ত মার্গী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, এই জায়গায় গিয়ে এক বিচির অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। তিনি দেখেন, তার পাতে রাখা বাটিভরতি মাংস নিমেষে পরিবর্তিত হয়ে গেল সবজিতে। আওরঙ্গজেবের সময়ে কৃষ্ণ কর নামে জনৈক ভক্ত এই কুণ্ডের পাশে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

ক্ষীর ভবানীতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সামনে প্রজ্জলিত হোমের আগুন। বসে আছে যুগ নায়ক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ভেসে গেল সব সংকল্প, সব কর্মের স্ফূর্তি, স্বদেশপ্রেম। হরি ও ময়, এবার শুধু মা-মা। আমি যন্ত্র-তিনি যন্ত্রী; মা-মা, তিনিই সব। তিনি কিংতু, আমি কে? তাঁর অজ্ঞান সন্তান মাত্র।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। কিছুদিন আগেই স্বামীজী ফিরে এসেছেন আমেরিকা, ইউরোপ পরিক্রমা করে। একসময় এসে পৌছালেন কাশ্মীরে। সঙ্গে ছিলেন ধীরা মা, জয়া এবং ভগিনী নিবেদিতা ও কয়েকজন বিদেশি অতিথি। ওই বছর আগস্ট মাসে অমরনাথ দর্শনের পর আসেন ক্ষীর ভবানীতে। দেবী দর্শনের পরে তিনি লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত কবি ‘Kali The Mother’। পরবর্তী সময়ে ইংরেজিতে লেখা এই কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। কাশ্মীর পরিক্রমায় সময় অনেক সাথী হলেও ক্ষীর ভবানীতে তিনি একাই গিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ‘স্বামীজীকে যেমন দেখিয়াছি’ বইতে লিখেছেন, ‘একজন তরুণ ব্রাহ্ম ডাক্তার ওই গীষ্মাকালে কাশ্মীরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিই কেবল জানিতেন, স্বামীজি কোথায় আছেন এবং তাঁহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও খোঝাখবর লইতে পারিতেন। স্বামীজির প্রতি তাঁহার সহায়তা ও ভক্তিপূর্ণ ব্যবহার প্রশংসার অতীত। পরদিন প্রতিদিনের মতো ডাক্তারবাবু স্বামীজির নিকট গেলেন, কিন্তু তাঁহাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া কোনো কথা না বলিয়া ফিরিয়া

আসেন। তারপর দিন ৩০ সেপ্টেম্বর স্বামীজি ক্ষীর ভবানী নামক কুণ্ড দর্শনে যাত্রা করেন, বলিয়া যান কেহ যেন তাহার অনুসরণ না করেন। সেইদিন হইতে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।' সেই সময় তিনি জনৈক ব্রাহ্মণের শিশুকন্যাকে দেবী দুর্গারূপে পুজো করেছিলেন। একদিন ধ্যানমগ্ন স্বামীজির মনে আসে, পুরাকালে যবনেরা এসে যখন এই মন্দির ধ্বংস করে তখন স্থানীয় মানুষেরা কিছু করল না কেন?

তিনি ভাবতে থাকেন, হায়রে! আমি যদি তখন থাকতাম, তবে কখনই চুপ করে ওই ধ্বংস দেখতাম না। কিছুতেই না।

হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন দেবীর দৈববাণী। স্বয়ং মা ক্ষীর ভবানী বললেন, আমার ইচ্ছাতেই যবনেরা মন্দির ধ্বংস করেছে। আমার ইচ্ছা, আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করব। ইচ্ছা করলে আমি কি এখানে এখনই সাততলা সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই করবি! তুই কী করতে পারিস? আমি তোকে রক্ষা করব, না তুই আমাকে রক্ষা করবি?

এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, তা ভেতরেই হোক আর বাহিরেই হোক, তুই যদি নিজের কানে আমার মতো এইরূপ অশৰীরী কথা শুনিস, তাহলে কি মিথ্যা বলতে পারিস? দৈববাণী সত্য সত্যই শোনা যায়, ঠিক যেমন এই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে তেমনি। স্বামীজির এই অনুভূতির সাহায্যেও মা ক্ষীর ভবানীর মন্দির বর্তমানে বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে অন্যতর পৌঁঠ হিসেবে।



শ্রীক্ষেত্রে প্রভু'র সঙ্গে পূজিতা হন দেবী বিমলা

পীঠনির্ণয়ে বলা আছে, দশম পীঠ হল উৎকলে, বিরজা ক্ষেত্রে।
সেখান বলা হয়েছে,

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্ছতে।

বিমলা মা মহাদেবী, জগন্নাথস্ত ভৈরবঃ ॥

উৎকলে পড়েছিল সতীর নাভি। দেবী এখানে বিমলা এবং ভৈরব হচ্ছেন জগন্নাথ।
কিন্তু একথায় সায় দেন নি মধ্যযুগীয় বাঙালি কবি। তিনি লিখেছেন ভিন্নভাবে,

উৎকলে পড়িল নাভি, মোক্ষ যাহা সেবি।

জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী ॥।

পীঠ নির্ণয়ের অন্য একটি পাঞ্চলিপিতে আছে,

বিরজা চোৎকলেখ্যাতা নাভির্মে মম ভৈরব।

বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র রায় এ-বিষয়ে লিখেছেন,

বিজয়া চোৎকলেখ্যাতা না ভির্মে বয় ভৈরব।

অথবা

বিজয়া মা মহাদেবী জয় নামা তু ভৈরব।

কথিত আছে, মন্দির তৈরি হওয়ার অনেকদিন পরেও প্রভুজগন্নাথের অধিষ্ঠান হয়নি।
অবশ্যে একদিন প্রভু জগন্নাথ দেখলেন, বিমলা মা মন্দিরে অবস্থান করছেন। তখন
উপায়স্তর না থাকায় একটিমাত্র শর্তে প্রভু মন্দির ছাড়লেন। তা হল, প্রতিদিন তাঁকে
এবং বলরামকে নৈবেদ্য দেওয়ার পর তা দিতে হবে বিমলা মাকেও।

কিন্তু সম্প্রতি পুরীর মন্দিরের প্রথম সারির পাণ্ডাদের সঙ্গে কথা বলার পর বেরিয়ে
এসেছে ভিন্ন মত। তাঁদের মতে, এখানে পড়েছে দেবীর চরণ। তাই এই জায়গার নাম
হয়েছে শ্রীক্ষেত্র। প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরের পিছনেই রয়েছে দেবী বিমলা'র মন্দির;
যেখানে তিনি পূজিতা হন দুর্গারূপে।

পীঠনির্ণয়কারী অনেক গ্রন্থে জগন্নাথদেবকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভৈরব হিসাবে।
একদিকে তিনি বিষ্ণু অন্যদিকে তিনিই শিব। তাই স্বাভাবিকভাবেই পুরীর মন্দির প্রাঙ্গণ
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ৫১ পীঠের মধ্যে।

পুরী বা শ্রীক্ষেত্র নাকি জগন্নাথদেবের বিলাসক্ষেত্র। তিনধাম পরিক্রম করে এখানে তিনি বিলাসে মগ্ন থাকেন। জনশ্রুতি আছে, সুদূর অতীতে শ্রীপ্রভু শবরদের দ্বারা পূজিত হতেন। জগন্নাথের অপর নাম নীলমাধব। পূজক শবর বিশ্বাবসু নীলমাধবকে নীল পর্বতের এক কল্দরে পুজো করতেন। সুসভ্য আর্যজাতির কাছে শ্রীপ্রভুর কোনও সংবাদই জানা ছিল না। স্যুরবংশীয় মালব দেশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এই সময়ে জনৈক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নীলমাধবের প্রকাশ ও অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট আভাস দেন। রাজার আদেশে অনেক ব্রাহ্মণ নীলমাধবের মূর্তি খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন দিকে যাত্রা করার পর, কেউ কৃতকার্য না হলেও, একসময় পুরোহিত বিদ্যাপতি প্রভু'র দর্শন পান। বিদ্যাপতি অনেক কষ্টে শবরপঞ্জীতে উপস্থিত হয়ে তাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। শবরপ্রধান বিশ্বাবসুর মেয়ে ললিতা, বিদ্যাপতির রূপে-গুণে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রণয় প্রার্থনী হন। বিদ্যাপতি ললিতার রূপ-লাবণ্যে মুক্ত। তখন বিশ্বাবসু ও অন্যান্য শবরেরা তাদের প্রণয়ের বিষয়টি অনুমোদন করেন। বিয়ের পর বিদ্যাপতি খুব স্বাভাবিকভাবেই অনন্যোপায় হয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করেন।

প্রতিদিন বিদ্যাপতি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন, বিশ্বাবসু নীলমাধবের পুজো শেষ করে যখন বাড়িতে ফিরে আসেন, তখন তার শরীর থেকে চলনের গন্ধ বেরোয়। কিন্তু বিদ্যাপতির শত অনুরোধে বিশ্বাবসু তাকে শ্রীমূর্তি দর্শন করাতে রাজি হন না। শেষে ললিতার অনুরোধে একদিন বিশ্বাবসু, বিদ্যাপতির চোখ বেঁধে শ্রীমূর্তি দর্শন করানোর উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যাত্রা করেন। ~~বিদ্যাপতি~~ কৌশলে সরবে ছড়াতে ছড়াতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যান। পরবর্তী সময়ে এই সরবে থেকে যে গাছ হয় তার সাহায্যে প্রভুর সন্ধান পান। প্রভু জগন্নাথের মূর্তি দর্শন করার সময়ে বিশ্বাবসু নীলমাধবের নৈবেদ্যের জন্য কাছের জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করতে যান। জনশ্রুতির ভিত্তিতে জানা যায়, কোনও এক সুদূর অতীতে জগন্নাথদেবের নৈবেদ্য হিসাবে অর্পণ করা হত ফলমূল। আরও শোনা যায়, বিদ্যাপতি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন স্বয়ং নীলমাধব নিজের হাতে শবরদের বনফুল গ্রহণ করছেন। পুজো শেষ হয়ে যাবার পরে নীলমাধব বিশ্বাবসুকে বলেন, হে ভক্তগুণ্ঠে বিশ্বাবসু, এ পর্যন্ত আমি জনসাধারণের অগোচরে তোমার দেওয়া বনের ফলমূল গ্রহণ করেছি। সম্প্রতি শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন আমার পুজো করার জন্য বিশেষভাবে উৎকর্ষিত। তাই আমি তার কাছে থেকে রাজোপচারে পুজো গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করছি। অনেক উত্থান-পতনের পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দারু ব্ৰহ্মকে শ্রীমূর্তিরূপে প্রকট করার জন্য অনেক দক্ষ শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা কেউ-ই সেই দারুব্ৰহ্মকে স্পৰ্শহই করতে পারেন নি। শেষে জনৈক বৃক্ষ শিল্পী একুশ দিনের মধ্যে মূর্তি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন বলে জানালেন। তবে তাঁর একটি শর্ত ছিল। তা হল, ওই একুশ দিন মন্দিরের

দরজা বন্ধ থাকবে ও কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। ইন্দ্ৰদুম্ভ সেই আদেশ পালন কৰাৰ জন্য প্ৰতিজ্ঞাবন্ধ হন।

দু-সপ্তুহ পৱে মন্দিৱেৰ ভেতৰ থেকে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে বৃক্ষ শিল্পী সন্তুত প্ৰাণত্যাগ কৰেছেন, এই চিন্তা কৰে রাজা দরজা খুলে দেখলেন দারুবন্ধাগুলি তিনটি শ্ৰীমূর্তিকূপে প্ৰকট হয়েছে, কিন্তু তাদেৱ হাত বা পা প্ৰকট হয়নি। অন্যদিকে সেই বৃক্ষেৰও কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। নিজেৰ প্ৰতিজ্ঞা থেকে বিচুক্ত হওয়াৰ জন্য ইন্দ্ৰদুম্ভ আত্মহত্যা কৰাৰ জন্য কুশ-শয্যা গ্ৰহণ কৰাৰ পৱ প্ৰভু জগন্নাথ রাজাকে স্বপ্ন দিয়ে বললেন, আমি পতিতপাবনৱপে পুৰুষোত্তম নামে নীলাচলে অবস্থান কৰব। আমাৰ হাত-পা দেখা না গেলেও আমি অনুৱাগী ভক্তদেৱ সেবা, পুজো গ্ৰহণ কৰব। রাজা তখন ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰে ঘোষণা কৰলেন, যে সুত্ৰধৰ ওই মূর্তিগুলি প্ৰকট কৰেছেন তাৰ বৎসুধৰেৱা যুগ যুগ ধৰে মূৰ্তি ও রথ নিৰ্মাণ কৰবেন। সেই সময়ে প্ৰভু জগন্নাথদেৱেৰ আকাশবাণী হল। প্ৰভু বললেন, যে ভক্তশ্ৰেষ্ঠ বিশ্বাসু আমাকে নীলমাধবৱপে পুজো কৰেছে তাৰ বৎসুধৰেৱা দইতা সেবক নামে পৱিচিত হয়ে শ্ৰীমন্দিৱে আমাৰ সেবা কৰবে ও বিদ্যাপতিৰ ব্ৰাহ্মণ-সন্তানেৱা আমাৰ ভোগৱান্নার কাজে নিযুক্ত থাকবে। তাৰা সূপকাৰ নামে পৱিচিত হবে।

রাজা ইন্দ্ৰদুম্ভ জগন্নাথদেৱেৰ এই আদেশ শিরোধাৰ্য কৰে ঘোষণা কৰলেন, প্ৰত্যেকদিন মাত্ৰ এক প্ৰহৰ মন্দিৱ বন্ধ থাকবে। সেই সময় থেকে আজও প্ৰত্যেকদিন মন্দিৱ খোলাৰ বিষয়টি এক বিশেষ পৰ্ব হিসাবে চিহ্নিত কৰা হয়। সূর্যোদয়েৰ অনেক আগে মহামন্দিৱেৰ রক্ষণাবেক্ষণকাৰী, প্ৰতিহাৱিদেৱ সঙ্গে নিয়ে পৱীক্ষা কৰে দেখেন জয়-বিজয় দ্বাৱেৱ (মন্দিৱেৰ প্ৰধান দরজা) সীল ঠিক আছে কিনা, সীল ভেঙে মন্দিৱে প্ৰবেশ কৰে পৰিত্ব স্থানটিকে কেউ অপবিত্ৰ কৰেছে কিনা। সীল ঠিক থাকলে দরজা খোলা হয়। ঠিক একইভাৱে গৰ্ভগৃহেৰ দৰজাও খোলা হয়। পৱিচাৱকেৱা ধুয়ে মুছে গৰ্ভমন্দিৱ পৰিষ্কাৱ কৰেন। তাৰপৱ শুক হয় মঙ্গলাৱতি।

শৱৎকালে দুৰ্গাপুজোৱাৰ তিনদিন অৰ্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীৰ দিন পুৱীৱ শ্ৰীক্ষেত্ৰে ঘোড়শোপচাৱে বিমলা মাকে দুৰ্গারূপে পুজো কৰা হয়। প্ৰভু জগন্নাথদেৱ যখন ঘুমিয়ে পড়েন, তখন ওই তিনদিন মন্দিৱেৰ দক্ষিণ দিকেৰ একটি দৰজা দিয়ে ছাগশিণুকে নিয়ে আসা হয় এবং পৱ পৱ তিনদিন দেবী বিমলাৰ মন্দিৱেৰ সামনে তাদেৱ বলি দেওয়া হয় এবং আমিষ ভোগেৰ ব্যবস্থা কৰা হয়। ওই দিনগুলিতে থাকে দুৰ্গাপুজোৱা বিশেষ আয়োজন। তবে প্ৰতিদিন সূর্যোদয়েৰ আগে চুন জল দিয়ে ওই বলি ও পুজোৱা জায়গাটি পৰিষ্কাৱ কৰে দেওয়া হয়। তাই দেবী বিমলা ভৈৱৰী শাক্ত মতে পুজো কৰা হয়ে থাকে। এইভাৱে পুৱীতে বৈষ্ণব ও শক্তি মতেৰ এক অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ ঘটেছে। তবে বছৱেৱ অন্য দিনগুলিতে সম্পূৰ্ণ বৈষ্ণব মতে দেবী বিমলাৰ পুজো হয়ে থাকে। প্ৰসঙ্গত উল্লেখ্য,

দেবী বিমলা'র পুজো ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষ বিশেষ মানুষকে দেওয়া আছে। এমনকী দুর্গাপুজোয় তিনদিন তাঁর পুজোর জন্য বিশেষজনের উপর দায়িত্ব রয়েছে। জানা গেছে, প্রসাদ তখনই মহাপ্রসাদ হিসাবে চিহ্নিত হয় যখন প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও বিমলা মা তা গ্রহণ করে থাকেন। তাই প্রতিদিন নৈবেদ্য প্রভু জগন্নাথ দেবকে নিবেদন করার পর নিবেদিত হয় দেবী বিমলার উদ্দেশ্যে। শুধু নৈবেদ্যই নয়, প্রতিদিন ভোগের পরে জগন্নাথ দেবকে যে ফুল ও মালা অর্পণ করা হয়, তা প্রভুকে পরানোর পর পরানো হয় দেবী বিমলাকে।



সিলেটে মহালক্ষ্মী ভৈরবী

সপ্তবিংশতি শান্তিপীঠ আছে শ্রীশৈলে। পাঠ নির্ণয়ের বর্ণনায় পাওয়া যায়,
‘শ্রী শৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্ত্র দেবতা।

ভৈরব সম্বরানন্দে দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ।।

সেখানে পড়েছে সতীর গ্রীবা। দেবীর নাম ‘মহালক্ষ্মী’, ভৈরবের নাম ‘সম্বরানন্দ’। অবশ্য পীঠনির্ণয়ের আর একটি পাঞ্জুলিপিতে আছে ‘মহালক্ষ্মী’-র পরিবর্তে আছে ‘মহামায়ার’ উল্লেখ।

রায়গুণাকর কবি ভারত চন্দ্র রায় শ্রীশৈলের বর্ণনার এক বিশেষ দিক নির্দেশ করেছেন। তাঁর রচিত অনন্দামঙ্গলে আছে,

‘শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী

সর্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাঁহা সেবি।।’

শিবচরিতের সঙ্গে অনন্দামঙ্গলের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে আছে, শ্রীহট্টে পড়েছে সতীর গ্রীবা। দেবীর নাম ‘মহালক্ষ্মী’। ভৈরবের নাম ‘সর্বানন্দ’। এক্ষেত্রে অনন্দামঙ্গলের সঙ্গে পুরোপুরি মিল রয়েছে। আশা করা যায়, পীঠ নির্ণয়ে ‘সম্বরানন্দ’ আর ‘সর্বানন্দ’—একই দেবতাকে বলা হয়েছে। শ্রীহট্টে, নামটির আর কোনও জায়গার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টকে চলিত ভাষ্যায় বলা হয়, সিলেট। ব্রিটিশ আমলে এটি ছিল অসমের মধ্যে। দেশবিভাগের সময় ছিল পূর্বপাকিস্তানে। এখন রয়েছে বাংলাদেশে।

এই পীঠস্থানটি শ্রীহট্ট শহরে স্থা তার কাছাকাছি কোনও জায়গায় আছে বলে শোনা যেত। কিন্তু সঠিক স্থানটি অনেকদিন অজ্ঞাত ছিল। অনেকের মতে, দরগা মহল্লায় এই সতীপীঠ পরবর্তীসময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁদের ধারণা ছিল, দুর্গাবাড়িতে এই পীঠের অবস্থান। এক সময় প্রমাণ পাওয়া গেল, শ্রীহট্ট (সিলেট) শহর থেকে দেড় মাইল দক্ষিণে গোটাটি করের (মতান্তরে গোটাটিকর) জৈনপুরে রয়েছে এই মহাপীঠ।

সরকারি ইতিহাস গ্রন্থে এই ভৈরবী স্থানকে মহাপীঠ বলে উল্লেখ করা লেখা হয়েছে,
গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে, সর্বসিদ্ধি প্রদায়নী
দেবীতত্ত্ব মহালক্ষ্মী সর্বানন্দশ ভৈরব।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ঘ তত্ত্বাচার্য প্রচারিত পীঠমালায় বলা হয়েছে, গ্রীবাদেশ শ্রীশৈলে পড়েছে। শ্রীশৈল হল শ্রীহট্টের নামান্তর। সেখানে অবশ্য ভৈরব সর্বানন্দকে, সম্বরানন্দ নামে উল্লেখ

করা হয়েছে। মন্দিরের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানায়, বঙ্গাদ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে বৈদ্য বংশীয় দেবীপ্রসাদ দাশ জৈনপুরগ্রামে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেন। কাজ করতে করতে জনৈক শ্রমিক একটি বড় পাথরের গায়ে কোদাল দিয়ে আঘাত করলে সেটি দুটুকরো হয়ে যায় ও সেখান থেকে রক্ত বেরোতে থাকে। তখন এক বালিকা সেখানে আবির্ভূতা হয়ে ওই শ্রমিকের গালে টোকা মারেন। লোকটি ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে মারা যায়। সেই দিন রাতে শ্রমিক নিয়োগকারী দেবীপ্রসাদকে দেবী স্বপ্ন দিয়ে বলেন, আমি ভৈরবী, এখানে আছি, তোমার লোক আমার অঙ্গে আঘাত করেছে। তোমার কুশল যদি চাও তাহলে এখানে নিত্যসেবা পূজার ব্যবস্থা কর। ধনীর সন্তান দেবীপ্রসাদ অবিলম্বে মায়ের নিত্যসেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। তবে তাঁর ইচ্ছে ছিল, একলক্ষ ইট দিয়ে মন্দির তৈরি করাবেন। কিন্তু দেবীর তাতে সায় ছিল না। রাতে আবার তিনি স্বপ্ন দিয়ে বলেন, আমি ইটের তৈরি মন্দিরে থাকব না। তখন রামপ্রসাদ মুসী বাঁশ দিয়ে মহালক্ষ্মী ভৈরবীর ১৭ নম্বর গ্রীবাপীঠ মন্দিরটি তৈরি করান। দেবীপ্রসাদ ইট দিয়ে মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীর তৈরি করে ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং কাছেই একটি শিব মন্দির তৈরি করান।

দেবীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর রমেশ দাশ একটি উইলের মাধ্যমে মন্দির ও তৎসলগ্ন একশো শতক জ্যাগা মন্দিরের কাজের ব্যবহারের জন্য দান করে যান। ওই উইলে নির্দেশ আছে, বংশানুক্রমিকভাবে এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার পাবে পুরুষ বংশধরেরা। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সেবায়েতের দায়িত্ব পালন করছেন রিন্টু দাস। তাঁর পূর্বসূরীরা হলেন, বুরীলু দাস, রমেশ দাস, রামপ্রসাদ মুসী। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই প্রতিদিন একজন পুরোহিতের মাধ্যমে মায়ের পুজো হয়ে থাকে। এছাড়া প্রতিবছর তিনদিন ধরে অশোকা পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে।

অনেকদিন আগে শ্রীহট্টে পূর্ণানন্দ নামে এক মহাদ্বা মাঝেমধ্যে থাকতেন। তখন তাঁর নাম ছিল—ব্ৰহ্মানন্দপুৱী। জীবিতকালে তিনি কখনও কামাখ্যায়, কখনও বানিয়াবঙ্গে আবার কখনও গোটাটিকরে এসে সাধনা করতেন। তিনি শ্রীহট্টে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন ও ১২৮১ সালে প্রয়াত হন।

একদিন ব্ৰহ্মানন্দপুৱী রাতে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ভৈরবীর (দেবী মহালক্ষ্মী) মন্দিরের ইশান কোণের দিকে গিয়ে শিবটিলা পাহাড়ে উঠে বলেন, এই স্থান অতি পবিত্র, এই জঙ্গলে আবৃত জায়গায় অনাদি লিঙ্গ শিব আছেন। এই ভৈরবী হলেন মহাপীঠ এবং এই শিব তাঁর ভৈরব। এ বিষয়ে তোমাদের যেন সন্দেহ না থাকে। এই ঘটনার পরে ১২৮৬ সালের মাঘ মাসে গোটাটিকরবাসী পণ্ডিত বিরজানাথ ন্যায়বাগীশ একদিন রাতে স্বপ্নে দেখেন, ব্ৰহ্মানন্দপুৱী তাঁকে ও তাঁর দুই ছাত্রকে বলছেন, চল, শিবটিলায় গিয়ে তোমাকে শিব দেখাই। তারপর তাঁরা সকলে সন্ধ্যাসীর সঙ্গে শিবটিলায় গিয়ে শিখৰস্থিত

সূপ খুঁড়ে শিব দেখতে পান।

এই অদ্ভুত স্মৃতি দেখে তাঁর ঘূম ডেঙে যায়। এমন সময় তাঁর দুই ছাত্র আখালিয়াবাসী কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য ও জানাইয়াবাসী কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত হন। ওঁরা দুজনেই বলেন, তারাও একই স্মৃতি দেখেছেন। তখন তারা তিনজনে শিবটিলায় যান। সবাই মিলে সূপ খুঁজতে লাগলেন। প্রথমে পাওয়া গেল একখণ্ড পাথর। পরে আরও মাটি সরানোর পরে দেখা গেল, শিবের উপরিভাগ দেখা যাচ্ছে। তারপর আরও গাছ ও মাটি সরানো হলে বেরিয়ে পড়ল শিবের গৌরীপট্ট। এই শিব-ই হলেন তৈরব সর্বানন্দ। এ প্রসঙ্গে কৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, যেদিন মাটি কাটিয়া শিব বাহির করিয়াছিলাম, সেই দিনের কথা এখনও পুজ্ঞানুপুজ্ঞনুপে মনে অক্ষিত আছে। উপস্থিত জনগণ সকলেই দেখিয়াছে, প্রায় দেড়হাত মাটির নীচে গৌরীপীঠের সঙ্গমস্থলে একখানা প্রদীপের মুদি ও তিন চারিখানা মৃন্ময়পাত্র পাইয়াছিলাম, ইহা কি পূর্বপূজার প্রমাণস্থরূপ গৃহীত হইতে পারে না? (পরিদর্শক, ২০ অক্টোবর, ১৯০৩)

অসম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে(Vol II : Sylhet, chapter III, p 86), 'About a mile and a half of South Sylhet town, where Sati's neck is said to have fallen where her body was dismembered by Vishnu. This pith, as the places consecrated by the fragments of Sati's severed body are called, has only recently been rediscovered. Sati's neck is represented by a piece of flat rock, similar to that found on most of the tiles round Sylhet. Her bhairab of guardian left to protect by Siva takes the usual form of a small upright pillar of rock shaped like phullus. There is no temple over these remains and handles anything neighbourhood of Sylhet town.'

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থানীয় মানুষদের উৎসাহে এখানে শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমী উপলক্ষ্যে মেলা বসে।

অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রণীত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' থেকে জানা যায়, শ্রীহট্টের শেষ হিন্দু রাজা গৌড়গোবিন্দ হাটকেশ্বর পুজো করতেন, মিনারের টিলা বা তার পার্শ্ববর্তী কোনও টিলাতে হাটকেশ্বর স্থাপিত ছিল। ১৩৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের আক্রমণের সময় গ্রীবাপীঠকে গোপন করে রাখা হয় এবং হাটকেশ্বরকে জয়নীয়ার জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকদিন সেখানে থাকার পর চূড়াখাইড় পরগণায় তাঁকে আনা হয়। গ্রীবাপীঠ আবার প্রকট হয় দেবীপ্রসাদ দাসের মাধ্যমে। তারপর আবিষ্কার করা হয় সর্বানন্দ লিঙ্গ মূর্তি।

দেবীর ধ্যান মন্ত্র

ওঁ উদ্যদ্ভানু সহস্র কাঞ্চি মরুণ

ক্ষৌমাং শিরোমালিকাং

রভগ্নিপুঁ পয়োধরাং জপবটীং

বিদ্যমভীতিং বরম্ ॥

হস্তাঞ্জের্দধৰ্তীং ত্রিনেত্র

বিলসদ্বক্ষারবিন্দ শ্রিযং

দেবীং বন্ধ হিমাংশুরত্ত্ব

মুকটাং বন্দে সমন্দশ্মিতাম্ ॥

উদীয়মান সহস্র সূর্যের মতো যাঁর দেহকাণ্ঠি, যিনি রক্তবর্ণ কৌমেয় বন্ত পরিহিতা, ন্যূণমালিনী, যাঁর স্তনযুগল রক্তবর্ণে রঞ্জিত, যিনি করকমল চতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করেছেন, যাঁরা মুখমণ্ডল ত্রিনেত্র শোভিত এবং পদ্মের মতো শ্রীসম্পন্ন এবং যাঁর রত্নমুকুটে চন্দ্র নিবৃক, সেই মৃদুমন্দ হাস্যা দেবীকে বন্দনা করি।

মহালক্ষ্মী তৈরবী মন্দিরে অন্যান্য পুজোর মধ্যে কালিপূজো, সরস্বতী পুজো ও বিশ্বামুক্তি পুজো নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পুজোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয় মন্দিরের নিজস্ব জ্যোতি ও স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের সার্বিক দান ও কমিটির সদস্যদের অনুদান ও স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের অনুদানের মাধ্যমে। সিলেট জেলার দক্ষিণ সুরমা উপজেলার বরইকান্দি ইউনিয়নের জৈনপুর গ্রামে অবস্থিত এই মন্দিরের তত্ত্বাবধানের জন্য ১১ সদস্যের একটি কমিটি রয়েছে।

কমিটির উল্লেখযোগ্য পদে যারা রয়েছেন তারা হলেন, সভাপতি আডভোকেট গৌতম দাস। সহসভাপতি জয়ন্ত চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক আশীষ দেব সহকারী সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ দেব, কোষাঙ্গ্য মারায়ণ চক্রবর্তী। অবশিষ্ট ৬ জন, কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই কমিটি ৩ বছর মেয়াদী এবং ৩ বছর পরপর এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কমিটি পুনর্গঠন করেন। মন্দির সংলগ্ন প্রায় ৪০ শতক জায়গা নানাভাবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অধীনে চলে যাওয়ায় ইংরেজি ১৯৬৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মন্দির পরিচালনা কমিটির সঙ্গে প্রভাবশালী মহলের মামলা চলছে। যা এখনও আদালতের বিচারাধীন।

জালঙ্করে দেবী ত্রিপুরমালিনী

পীঠনির্ণয় অনুসারে একান্নপীঠের বষ্ট পীঠ হল জালঙ্কর। সেখানে বলা হয়েছে,
... স্তনং জালঙ্করে মম ।

ভীষণো ভৈরবস্ত্রে দেবী ত্রিপুরমালিনী ॥

অর্থাৎ জালঙ্করে দেবীর বাম স্তন পড়েছে। দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী এবং ভৈরব হলেন ভীষণ।

অন্নামঙ্গলে বাংলায় অনুবাদ করলে যার মর্মার্থ দাঁড়ায়,

‘জালঙ্করে তাঁহার পড়িল এক স্তন ।

ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥’

পীঠস্থানের পাশে আছে স্বামী শঙ্করাপুরীর আস্তানা। পীঠতস্ত্রে জালঙ্কর পীঠের উল্লেখ থাকলেও অনেকদিন এই পুণ্যস্থান লোকচক্ষুর অন্তরালেই ছিল। তখন পুরো জায়গাটি ঘন জঙ্গলে আবৃত থাকত। পরবর্তী সময়ে পুরো জায়গাটি পরিষ্কার করে পীঠস্থানে মন্দির তৈরি করা হয়। শাস্ত্রমতে দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী কিন্তু মন্দির হল বিক্ষ্যেষ্মীর।

‘নামষ্টোত্তরশতম’-এ বলা হয়েছে,

‘জালঙ্করে বিষ্মযুধী, তারা কিষ্কিন্ধ্যপর্বতে ।

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে,

‘জালঙ্করে স্তনযুগং স্বর্ণহারবিভূষিতম ।’

‘পূর্ণতীর্থ ভারত’ নামে এক ভ্রমণকাহিনীর লেখক জনেক স্বামীজীর লেখায় আছে, ‘কথাপ্রসঙ্গে জানিলাম জলঙ্করেও আছে একটি পীঠস্থান।’

পদ্মপুরাণে আছে, সাগরের ওয়াসে ও গঙ্গার গর্ভে জলঙ্কর নামে এক দৈত্যের জন্ম হয়। তার জন্মের সময় কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী। কেঁপে উঠেছিল পাতালও। এর ফলে ধ্যানভঙ্গ হয় ব্ৰহ্মার। বিপদ্দের আশক্ষায় ব্ৰহ্মা সাগরের কাছে এসে জিজ্ঞেস কৰলেন, সাগর, তুমি এমন করে গৰ্জন কৰছ কেন? উত্তর দিলেন সাগর, ‘প্রভু, এ আমার গৰ্জন নয়, আমার ছেলের গৰ্জন’। সাগরের ছেলেকে দেখে তাঁর দাঢ়ি ধৰে টানতে শুরু কৰে। যন্ত্রণায় অস্তির হলেও ব্ৰহ্মা কিন্তু কিছুতেই নিজেকে মুক্ত কৰতে পারছিলেন না। একসময় সাগর ব্ৰহ্মাকে মুক্ত কৰে দেন। তখন শিশুর পৱাত্রম দেখে ব্ৰহ্মা তার নাম রাখেন জলঙ্কর। বললেন, ভবিষ্যতে এ-শিশু ত্রিলোকের অধিপতি হবে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পৱাত্রমও বৃদ্ধি পেতে থাকে। দৈত্যগুরু শুক্রচার্য একদিন সাগরকে বললেন, তুমি মহাভাদের সাধনভূমি থেকে

দূরে সরে গিয়ে তোমার ছেলেকে অন্য কোনও রাজ্য স্থাপন কর। শুক্রাচার্যের উপদেশমতো সাগর তার ছেলেকে যে রাজ্য স্থাপন করনে তার নাম জলঙ্কর।

দীর্ঘদিন তপস্যা করে জলঙ্কর লাভ করেছিলেন এক অনন্য বর। তা হল, যতদিন তার স্ত্রী সতীসাঙ্কী থাকবে ততদিন তাকে কেউ বধ করতে পারবে না। কিন্তু একদিন ভগবান বিষ্ণু জলঙ্করের রূপ ধরে তার স্ত্রী বৃন্দাকে বঞ্চনা করলেন। সেই সুবাদে শিবের কাছে পরাজিত হলেন জলঙ্কর। কিন্তু শিব যতবারই তার মুণ্ড কেটে ফেলেন ততবারই তা জোড়া লেগে যায়। অবশেষে কোনও উপায় না দেখে শিব তার মাথা কেটে মাটিতে পুঁতে দিয়ে পাথর চাপা দিয়ে দেন।

জলঙ্করকে কেন্দ্র করে অন্য একটি কাহিনীও শোনা যায়। সেখানে উল্লেখ আছে, জলঙ্কর নামে এক রাক্ষস ছিল যার অত্যাচারে ত্রিভুবন কঁপে উঠত। অত্যাচারের মাত্রা যখন চরমে পৌছায় তখন স্বয়ং ঈশ্বর বামনের রূপ ধরে তাকে হত্যা করেন। মরার সময় সেই রাক্ষস উবু হয়ে পড়েছিল। তার পীঠের ওপরেই গড়ে ওঠে এক রাজ্য যার নাম জলঙ্কর। লোকবিশ্বাস, এখানেই পড়েছে সতীর বাম স্তন। অনন্দামঙ্গলে বাংলার কবি বলেছে, ‘পড়িলা এক স্তন’। কিন্তু পীঠ নির্ণয়ে আছে, ‘জলঙ্করে স্তনং মম’। অন্যদিকে কালিকাপুরাণে আছে, ‘স্তনযুগং’। দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে, জলঙ্করে দেবীর নাম বিশ্বমুখী। কালিকাপুরাণের এক জায়গায় জলঙ্করকে বলা হয়েছে জলশৈল। রূদ্রব্যামলে জালঙ্কর সম্পর্কে উল্লেখ আছে, মূলাধারে কামরূপং যদি জিনক্ষৰং তথা। জ্ঞানর্ব তত্ত্বে আছে,

‘কামরূপং চ মলয়ঃ তত্ত্বং কৌলগিরিঃ তথা।

কুলাস্তকং চ চৌহারং জলঙ্করমতঃ পরম।’

প্রাণতোষিণীতত্ত্ব ও বাচস্পত্যপীঠেও জলঙ্করের বর্ণনা পাওয়া যায়,

‘চিঙ্গুলা চ মহাপীঁ তথা জলঙ্কর পুতঃ।’

শাস্ত্রগনন্দতরঙ্গিনীতে আছে,

‘শ্রীপীঠস্য তথোক্ষারং জলঙ্করমতঃ পরম।’

বেশিরভাগ শাস্ত্র গ্রন্থেই জলঙ্করের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত তীর্থযাত্রাপথে কয়েকটি মাতৃতীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে গৌরীশিখরস্থিত ‘স্তনকুণ্ডের’ যে তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে বলা হয়েছে, ‘অনস্তর ত্রিলোকবিশ্রুত গৌরীশিখরে আরোহণ করে স্তনকুণ্ডে যাবে। সেখানে স্নান ও পিতৃ এবং দেবতাদের অর্চনা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি ও ইন্দ্রলোক লাভ হয়’ (বনপর্ব ৮৪/১৫১-৩)।

অষ্টাদশ পীঠ বর্ণনা করতে গিয়ে শক্রাচার্য জলঙ্করে নাম উল্লেখ করেছেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কালিকাপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অমিয়কুমার মজুমদার রচিত ‘সতীপীঠ পরিক্ৰমা’ বইতে জলঙ্করের দেবীপীঠ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তা হল, ‘জলঙ্কর প্রাচীন চতুষ্পীঠের অন্যতম। কাংড়া

জেলার জ্বালামুখীর কাছে এই তীর্থ। আধুনিক জালঙ্কর শহরের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। এখানে দেবীর স্তন পড়েছিল। এখানকার দেবীর নাম বিশ্বমুখী বা ত্রিপুরনাশিনী বা ত্রিপুরমালিনী। মতান্তরে এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রজেশ্বরী। এঁকে বিদ্যারাজ্ঞীও বলা হয়। আবার কেউ কেউ বিদ্যাশ্বরীও বলেন। অনেকে দেবীকে চণ্ডী বলে সম্মোধন করেন। জালঙ্করের কাছাকাছি কোনও কোনও জায়গার মাটি থেকে আগুন বেরোতে দেখা যায়। সেখানে ভিড় করেন তীর্থযাত্রীরা। মনের ইচ্ছে পূরণ হবার আকাঙ্ক্ষায় আগুনের মধ্যে তারা নানান জিনিস ছুঁড়ে দেন। সেই আগুনের ওপর তৈরি হয়েছে গম্বুজাকৃতি মন্দির।

জালঙ্করের অবস্থান

দিল্লি থেকে দূরত্ব ৩৭৫ কিলোমিটার, চণ্ডীগড় থেকে ১৫০ এবং অমৃতসর থেকে ৮০ কিলোমিটার। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এই শহরে পাঞ্চাবের রাজধানী ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে এর নাম ছিল জুলঙ্কর।

আবহাওয়া : এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রতি বছর কোনও কোনও দিন ৪৮ ডিগ্রিতে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে কোনও কোনও দিন তাপমাত্র ২/৩ ডিগ্রিতেও নেমে যায়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতার পরিমাণ ৭০ সেন্টিমিটার। ভারতের অন্যতম পুরোনো ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে জলঙ্করে । ১৮৪৮ সালে এর নির্মাণ শুরু হয়। কাছেই পাকিস্তান সীমান্ত থাকায় বর্তমানে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

জালঙ্করে সতীপীঠের কাছেই গড়ে উঠেছে মুছমাঞ্চিকা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। কুইল্য মহল্যায় তাদের দপ্তর রয়েছে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা : দিল্লি থেকে ট্রেন এবং সড়কপথে যাওয়া যায়। দিল্লি থেকে অমৃতসর ভায়া জলঙ্করে ট্রেনে যাওয়ার জন্য অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা যুক্ত শতাব্দী এক্সপ্রেসের ব্যবস্থা আছে। এছাড়াও এখানে যাওয়ার জন্য অন্য ট্রেনও রয়েছে। সবচেয়ে কাছের বিমানবন্দর রয়েছে অমৃতসরে যা রাজা সাসি নামে পরিচিত। মূল শহর থেকে এর দূরত্ব ৮০ কিলোমিটার। নামতে হবে জলঙ্কর ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। সেখানে থেকে কাছেই রয়েছে দেবী তলাও। প্রথমে আছে কালভৈরবের মন্দির। তারপরে রয়েছে মহাবীরের মন্দির।

থাকার ব্যবস্থা : এখানে থাকার জন্য রয়েছে দ্য রিজেন্ট পার্ক হোটেল, স্কাইলার্ক হোটেল, ডলফিন, হোটেল প্লাজা, ম্যাজেস্টিক গ্যার্ড, লিলি রিসর্টস, প্রেসিডেন্ট হোটেল, হোটেল রঞ্জি, কমল প্যালেস, মায়া হোটেলস প্রমুখ। এছাড়া মাঝারি মানের বেশ কয়েকটি হোটেলও আছে। এখানে আসার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হল ডিসেম্বর মাস। এই সময় দেবীর সামনে সংগীত পরিবেশন করেন দেশের খ্যাতনামা উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীরা।

এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান হল, তুলসী মন্দির, শিব মন্দির, সোদাল মন্দির, অম্বৃণা দেবীর মন্দির এবং পাঁচ মন্দির।

নেপালে দেবী গুহ্যেশ্বরী

নেপাল এই মুহূর্তে হিন্দুরাষ্ট্রের তকমা হারালেও সেখানকারার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে অনেক হিন্দু মন্দির। পাশাপাশি চোখে পড়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানান নির্দেশন। এছাড়াও নেপালের কোনও কোনও দেবস্থানে তত্ত্বাষ্ট্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এরকমই একটি মন্দির রয়েছেন মা গুহ্যেশ্বরী। কথিত আছে, এটি একান্নটি সতীপীঠের অন্যতম। পীঠনির্ণয়ের বর্ণনাক্রমে শাঙ্কপীঠের অষ্টম পীঠ আছে নেপালে। এই বর্ণনানুযায়ী এখানে পড়েছিল সতীর জানু। সেখানে উল্লেখ আছে,

‘... নেপালে জানু মে শিব।

কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান् মহামায়া চ দেবতা ॥’

বাংলার কবির ভাষায়,

‘নেপালে পড়িল জঙ্গা কপালী ভৈরব।

দেবী তায় মহামায়া সদা মহাঃসব ॥’

যেখানেই দেবী অবস্থান করেন তার কাছেই থাকেন মহেশ্বর। বাগমতী নদীর ধারে রয়েছে বিখ্যাত পশুপতিনাথ মন্দির। ভক্তেরা প্রথমে দর্শন করেন পশুপতিনাথ, সেখান থেকে গোরক্ষনাথ এবং নদীর অন্য পারে গিয়ে কিছুটা পথ পেরোনোর পর দেখা যাবে গুহ্যেশ্বরী মন্দির, দুর্কিলোমিটার দূরে বোধনাথ (আসল উচ্চারণ হল বৌধনাথ) মন্দির। কথিত আছে, ভগবান শিব নেপালে থাকেন মূলত ছুটি কাটানোর জন্য। মন্দিরের গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা হয়, সেটি কমপক্ষে ১৫০০ বছরের পুরোনো। পুঁথি অনুযায়ী জানা যায়, ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে এখানে শিব মন্দির ছিল। দেবতামূর্তির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মহেশ্বর এখানে চতুর্মুখ নিয়ে অবস্থান করছেন। তাই বলা হয়, তিনি পশুদেরও রাজা। মূর্তির দিকে তাকালেই লক্ষ্য করা যায়, তাঁর শাঙ্ক, সমাহিত ভাব, অন্যান্যক্ষেত্রে যা সম্পূর্ণ বিপরীত। আরেকটি উল্লেখ্য বিষয় হল, পশুপতিনাথ মন্দিরে কোনও পশুবলি দেওয়া হয় না। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে বর্তমানের এই মন্দিরটি তৈরি করান রাজা ভূপালেন্দ্র মাল্ল। একসময় রাজা যাক্সা মাল্লা দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের এনে তাদের হাতে পশুপতিনাথের পুজোর দায়িত্ব তুলে দেন। যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এখানকার পুরোহিতদের পরণে থাকে কমলা রঞ্জের পোশাক।

পীঠনির্ণয়ে পীঠের জন্য কোনও স্থান নির্দেশ করে দেওয়া হয়নি। শিবচরিতে বলা

হয়েছে, নেপালে পড়েছিল দক্ষিণজঙ্গী, দেবীর নাম মহামায়া বা নবদুর্গা। বাগমতী নদীর তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে গোরক্ষনাথ, পরে গুহ্যেশ্বরী মন্দির যাওয়া যায়। স্থানীয় এবং অনেক পণ্ডিতদের মতে, এখানে দেবীর ঘোনি পড়েছিল, যা একটি কলসে রাখা আছে। ১৭ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি তৈরি করান রাজা প্রতাপ মাঙ্গা। শোনা যায়, উত্তর বিহারের তিরহুত থেকে নেপালের রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে জনৈক ব্রাহ্মণ বলেন, ‘হে রাজা, নেপালে শক্তিপীঠ আছে। আমার মনে হয়, এই বনের মধ্যে কোথাও দেবী গুপ্তভাবে রয়েছেন। আপনি আমায় সেই দেবীমূর্তি উদ্ধারে সাহায্য করুন।’ এর আগে রাজা প্রতাপ মাঙ্গা ওই ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর কথায় রাজা জঙ্গল পরিষ্কার করার আদেশ দেন। ব্রাহ্মণের চিহ্নিত জায়গাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সৃষ্টি হয় একটি ছোটখাটো পুকুরের। সেখান থেকেই পাওয়া যায় দেবী গুহ্যেশ্বরীর শিলামূর্তি। ওই জায়গায় রাজা মন্দির তৈরি করান যার চারপাশে স্থাপন করা হয় সিংহমূর্তি।

রাজার প্রতাপমল্ল যেহেতু তত্ত্ব মতে বিশ্বাসী ছিলেন তাই এই পীঠস্থানে মূলত তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। দেবী গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের মাথায় শোভা পায় পিতলের তৈরি চারটি সাপের মূর্তি। দেখে মনে হয়, ওই সাপগুলি যেন তত্ত্বাধকের বেদীকে ধারণ করে আছে। মন্দিরের মধ্যে নানান কারুকার্যময় বারান্দা আছে, যার বেষ্টনীর সামান্য নীচে রয়েছে একটি চারকোণা চাতাল। চাতালের মাঝখানে রয়েছে স্বাধানো পীঠস্থান। সেখানে রয়েছে একটি ছোট গর্ত। জলে পূর্ণ। ওই গর্তের পেরা/একটি ঢাকনা দেওয়া থাকে। সোনার সেই ঢাকনা তুলে দেবীর দেহাংশ সংস্কার করতে হয়।

দেবীর ভাগবতে বলা হয়েছে,

‘গুহ্যকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যত প্রতিষ্ঠিতম্।’

এই তথ্য অনুযায়ী ধরে নেওয়া যেতেই পারে, নেপালে পড়েছে সতীর জানুদেশ। তিনি মহামায়া, তিনিই দেৱী গুহ্যেশ্বরী।

প্রসঙ্গত, নেপালে এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে প্রতিটি বিহালে (বিহারে) পুরোপুরি উলঙ্গ বালিকাকে মা কালী বা দেবী দুর্গা হিসেবে পুজো করা হয়। বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে এই কুমারীকে নির্বাচন করা যায়। নবরাত্রির শেষদিনে নানান ধরনের পরীক্ষা নেওয়ার পর তাকে নির্বাচন করা হয়। তাই নেপালের মুখ্য দেবতা হিসেবে পশুপতিনাথকে পুজো করা হলেও সেখানে যে শক্তির বিশেষ প্রভাব রয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও কোনও বিদ্যম পণ্ডিতদের মতে, দেবী গুহ্যেশ্বরী বৌদ্ধ ধর্মের জনৈক শক্তিশালী বজ্র যোগিনীর প্রতিমূর্তি, যা আর এক মতে, চারজন তান্ত্রিক দেবতার সম্মিলিত রূপ।

লক্ষায় পড়েছিল দেবীর পায়ের নূপুর

পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে, লক্ষায় পড়েছিল দেবী সতীর পায়ের নূপুর। এখানে দেবীর নাম ‘ইন্দ্রাক্ষী’, তৈরব ‘রাক্ষসেশ্বর’। সেখানে উল্লেখ আছে,

‘লক্ষায়ং নূপুরশ্চের তৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।

ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তব ইন্দ্রেগোপাসিতা পুরা ॥’

দেবরাজ ইন্দ্র দেবীকে পুজো করেছিলেন বলে তাঁকে বলা হয় ইন্দ্রাক্ষী। পীঠনির্ণয়ের মূল পাঞ্জুলিপিতে লক্ষা সতীপীঠ হিসেবে চিহ্নিত ছিল না, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পরে। তৈরবের নাম দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি ছিলেন রাক্ষসরাজ রাবণের দেবতা। একইসঙ্গে সীতাকে উদ্ধার করার আগে লক্ষার অপরপারে সমুদ্রকে বাগে আনার জন্য শ্রীরামচন্দ্র করেছিলেন দেবী দুর্গার অকালবোধন। একইসঙ্গে পুরাণে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, লক্ষাকে রক্ষা করতেন স্বয়ং দেবী কালিকা। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে, লক্ষাও একান্নপীঠের অন্যতম।

একটি পঞ্জিকায় বলা হয়েছে, সমুদ্রতীরে রয়েছে এই পীঠস্থান।

শ্রীলক্ষ্মার বৌদ্ধ গুহা ডাম্বুলা থেকে সিংহলীদের শেষ রাজধানী ক্যাণ্ডি শহরের পথে ‘মাতালে’ নামে একটি জনপদ আছে। এখানেই আছে গৌরী আঘাত বিশাল প্রাচীন মন্দির। গঠনশৈলী দক্ষিণ আদলের। এখানে চারটি অপর্ণপ কারুকাজ করা কাঠের রথ আছে। বিভিন্ন সময় দেবী এই রথে চড়ে পরিত্বরায় দ্বর হন। স্থানীয় মানুষদের বিশ্বাস, এটি একান্নপীঠের অন্যতম এবং এখানেই পড়েছিল দেবীর পায়ের নূপুর।



বাংলাদেশের বগুড়ায় অপর্ণা মা

করতোয়াতটে গুল ফং বামে বামে দেবীর ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তএ ব্রহ্মজপা করোন্তুবা।।।

অর্থাৎ পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরে দেবীর গুলফ পড়েছিল। দেবীর নাম অপর্ণা, দেবতা হলেন বামে ভৈরব। অপর্ণা মাকে অনেকে ভবানী মা নামেও ডাকেন। একটি ভিন্ন মত হল, এখানে দেবীর ‘কণ’ পড়েছিল। পীঠ নির্ণয় তত্ত্বে বলা হয়েছে,

‘করতোয়া তটে কর্ণো বামে বামন ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্ত্ব ব্রহ্মজপা করোন্তুবঃ।।।’

ওই মতে, এখানে ভৈরবের নাম বামন। অতি পবিত্র নদী করতোয়ার পুরাণে উল্লেখ আছে। দেবাদিদেব মহাদেবের হাত থেকে কিছু পবিত্র জল পৃথিবীতে পড়লে তা নদী হিসাবে আস্তাপ্রকাশ করে।

এখানে পড়েছিল দেবীর ‘কণ’ মতান্তরে ‘গুলফ’

এখানে পড়েছিল সতীর দেহখণ্ড

মহাদেবের কর থেকে এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে বলে স্বয�়ং ব্রহ্মা এই নদীর নাম রাখেন করতোয়া। স্কন্দপুরাণে এই নদীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ‘হে করতোয়া নদ, তুমি সরিৎশ্রেষ্ঠা বলে বিশ্রাতা। তোমার তুম্য সন্তুষ্টিনির্মাণ নদী আর নেই। যেহেতু তুমি তরণী হয়েও রঞ্জাবিহীনা, অতএক তুমি ধন্বা ও পুণ্যা।’ অবিভক্ত বাংলার উত্তরাংশের কেন্দ্রস্থল ছিল রাজশাহী। পাবনা জেলার উত্তরে এবং বগুড়া জেলার দক্ষিণে প্রায় একশো বর্গ মাইল জুড়ে ছিল এক বিরাট জঙ্গল। এই জঙ্গলের প্রাচীন নাম ছিল গুলফাপুরী। এই জায়গাতেই ছিল দেবী অপর্ণার পীঠ। এই বিরাট জঙ্গলের অবস্থান ছিল করতোয়া নদীর পশ্চিম তটে। ভবতোয়া নামে আর একটি নদী, মঙ্গলের উত্তরদিকে করতোয়া থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ দিকে জঙ্গলের পশ্চিম দিয়ে বয়ে যেত। এই দুটি নদীর মাঝে এই জঙ্গল প্রাচীন কালে দ্বীপের মতো ছিল। এখন জঙ্গলের একের তিন অংশে মানুষজন বসবাস করেন।

অনেকে দেবী মাকে ভবানী নামেও সম্মোধন করে থাকেন। প্রতিমার বিশেষত্ব কিছু নেই। সর্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকা থাকে। শুধু সোনার মুখটি দেখা যায়। বর্তমানে জায়গাটির

স্থানীয় নাম ভবানীপুর। দৃংখের বিষয়, এই অঞ্চলের যাবতীয় সমৃদ্ধি ১২৯২ বঙ্গাব্দ এবং ১৩০৪ সালের প্রবল ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাচীনকালে দেবী এখানে বিরাজ করতেন, ‘যোড় বাঙালায়’, সেখানে এখন তৈরি হয়েছে আধুনিক মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমদিকে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়া পুরোনো ইটের বাড়িতে ভৈরব বামেশ আছে। শাস্ত্রে আছে, ভৈরব থাকবেন দেবীর বাঁ দিকে। কিন্তু এখানে তা নেই। ভবানীপুরের নৈঘন্ত কোণে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে করতোয়া ও ভবতোয়া নদীর সঙ্গমস্থানে অপর্ণা মায়ের অধিষ্ঠান ছিল। প্রায় ছশ্মো তিয়ান্ত্র-চুয়ান্ত্র বছর আগে রাজনৈতিক টাল মাটালের জন্য জনৈক সাধক দেবীকে এখানে এনে গহন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। পরে মোহন মিশ্র নামে জনৈক মহাসাধক অপর্ণা মা’কে পুনরায় প্রকাশ করেন। আজও গুলফা (গুণ্টা) গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে অনেক প্রাচীন বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। চোখে পড়ে অনেক বড় বড় দিঘির চিহ্ন। বগুড়া শহরের উত্তরে করতোয়া নদীর তীরকে বলা হয়, পৌন্ডুবর্ধন। একসময় এই নদী ছিল খুবই শ্রোতসিনী। কিন্তু আজ স্থুবিরা। নদীর তীরে বগুড়া শহরের চার ক্ষেণ দূরে শিলাদীপ আছে। এখানে নারায়ণীযোগে স্নান করলে ত্রিকোটি কূল উদ্ধার হয়। মহাভারতে উল্লেখ আছে, দ্বাপরের শেষ শক্তি উপাসক পৌন্ডুপতি বাসুদেবের সময় এই গুলফাপুরীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। একসময় করতোয়া নদীর তীরে কমলাপুর নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন লক্ষণ সেনের বংশধর অচ্যুত সেন। রাজা ছিলেন নিঃসন্তান। স্বভাবতই তিনি ছিলেন সন্তানের জন্য ব্যাকুল। এই সময় সেখানে ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। ওই সময় জনৈক দেবীসাধক দেবীকে মুক্তিয়ে রাখেন সকলের অগোচরে। তারপর তারা চলেন কামাখ্যার দিকে। সেই ভয়ংকর যুদ্ধের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন যোগপূরুষ মোহন মিশ্র। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে মুসলমান সম্বাটের সেনাপতি বক্তৃত্বার খিলাজি, সেন-বংশের শেষ রাজা লক্ষণ সেনের কাছে থেকে অবিভক্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গার অধিকার নেন। নিয়মমতো কর দিয়ে সেন-বংশের রাজারা প্রায় একশো বছর রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে এবং চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে করতোয়া প্রদেশের শেষ রাজা ছিলেন অচ্যুত সেন। সেই সময় গুলফা পুরীতে জনৈক মহাপুরুষ মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। তাঁকে সবাই বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। রাজা প্রায়শই যেতেন তাঁর কাছে। একদিন তিনি ওই মহাপুরুষকে তাঁর মনোকন্ঠের কথা জানান। সব কথা শনে তিনি বলেন, একবছর যদি শুন্দাচারে থাকতে পার, তাহলে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। রাজা ও রানী অক্ষরে অক্ষরে যোগীপুরুষের কথা শুনলেন। একসময় তাদের একটি কল্যাসন্তান হল। মহাযোগী বলে গিয়েছিলেন, ছেলে হলে নাম রাখবে জগন্নাথ আর মেয়ে হলে ভদ্রাবতী। তাই মেয়ের নাম রাখা হল ভদ্রাবতী। ততদিনে অবশ্য যোগীপুরুষ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন।

ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল ভদ্রাবতী। রাজা তাঁকে বড় করতে লাগলেন ছেলের মতো করে। অপরদপা রূপের অধিকারী রাজকন্যা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত

হয়ে ওঠেন। একসময় রাজকন্যার দশ বছর বয়স হল। শোনা যায়, রাজকন্যার জন্মের সময় গণৎকারেরা তার কোষ্ঠী বিচার করে বলেছিলেন, কন্যার দশ বছর থেকে আঠারো বছর বয়স অবধি সময়টা ভালো নয়। এই সময় তার বিয়ে দিলে সামগ্রিকভাবে দেশের সর্বনাশ হবে। তারা আরও জানালেন, এই সময়ের মধ্যে যদি রাজকন্যা স্বামী সহবাসিনী হন, তাহলে তার পতির বিনাস অবশ্যজ্ঞাবী। নির্মূল হয়ে যেতে পারে তার পিতৃকুল। স্বভাবতই গণৎকারদের ভবিষ্যদ্বাণী বিষাদের বার্তা পৌছে যায় সমগ্র রাজবাড়িতে। এদিকে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার রূপ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজার পরলোকগত সচিবের দোহিত্র মা-বাবা হারা বিজয়বাহু ছিলেন তাঁর স্বজাতীয়। তখন বিজয়বাহুর বয়স ছিল পঁচিশ। ব্যক্তিগত জীবনে সে অত্যন্ত অসংযত জীবনযাপন করত। শিক্ষাদীক্ষায় ছিল বিশেষ দুর্বল। একসময় সে কামনা করে ভদ্রাবতীকে। রাজা ও দেশের মানুষ বিজয়বাহুকে এ-বিষয়ে তিরক্ষার করে সতর্ক করে দিলেন। তবে শারীরিকভাবে সে ছিল খুবই রূপবান। রাজ্যের মানুষদের এ-হেন ব্যবহারে আত্মেয়ী নদীর তীরে বসবাসকারী জনৈক ব্রাহ্মণের দুশ্চরিত্বা সুন্দরী ষড়শী স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে পশ্চিমদিকে এগিয়ে গিয়ে গৌড়ে আশ্রয় নিল। সেখানে গিয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে সে কামাল খাঁ নামে পরিচিত হয়। কয়েকদিন পরে সে তৎকালীন গৌড়ের রাজা ফিরোজ শাহের ছেলে বাহাদুর শাহকে বলেন, ‘অচুত সেনের কন্যা অপূর্ব সুন্দরী, তাঁকে বিবাহ কর’। বাদশাও তার কৃত্থা মতো অচুত সেনকে তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, এই বাহাদুর শাহও খুবই দুশ্চরিত্ব ছিল। তখন বিজয়বাহু আর একটি চাল চাললো। সে তাঁর রক্ষিতা সর্বাংগীর মাধ্যমে বাহাদুর শাহকে বশীভৃত করে প্রবলভাবে তাঁকে ভদ্রবতীকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে।

গৌড়ের বাদশাহের চিঠি পেয়ে হতবাক হয়ে যান রাজা অচুত সেন। হঠাৎ-ই সেই যোগীপুরুষ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাজাকে বললেন, আপনি রটিয়ে দিন রাজকন্যা অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁরপর কয়েকদিন পরে প্রচার করে দিন, রাজকন্যার মৃত্যু হয়েছে। অন্য এক বালিকার মৃতদেহ দাহ করে দৃতের মনে বিশ্বাস তৈরি করুন। সেইমতো সব কাজ করা হল। সবশূনে ঘটনা পরম্পরা জেনে তা মেনে নিলেন বাহাদুর শাহ। কিন্তু বিজয়বাহু ওরফে কামাল খাঁ সেই তথ্য মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, এ সবই মিথ্যা কথা।

বিপদ থেকে আপাত উদ্ধার পাওয়ার পর রাজা যোগীপুরুষের কাছে মেয়ের, কোনও সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ের জন্য প্রার্থনা করেন। যোগীপুরুষ বললেন, আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত কন্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অশুভ সময়। এই সময় কন্যা যদি স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে তাহলে তার স্বামীর মৃত্যু এবং বাপের বাড়ির সকলের অবধারিত বিনাশ হবে।

যোগীপুরুষ প্রস্তাব দেন, কোনও সুলক্ষণ যুক্ত শিশুর সঙ্গে কন্যার বিয়ে দিন। এর ফলে কন্যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন করার মানসিকতা তৈরি হবে না। এইসঙ্গে রাজকুমারী ও তার খুদে স্বামীকে গোপনে অন্য কোনও প্রাসাদে রেখে দিন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠল, এরকম সুলক্ষণযুক্ত শিশু স্বামীর সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে। যোগীপুরুষ বললেন, তার ব্যবস্থা আছে। আমি আপনার রাজ্যে আসার আগে বারাণসীতে ছিলাম। সেখানে কান্যকুজ দেবীয় জনকে ব্রাহ্মণের বাড়িতে ধারা নগরীর সূর্যবংশীয় রাজার শিশুপুত্র বসবাস করছে। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত রাজা, রানী ও তাঁদের গুরুদেবের সঙ্গে ওই ব্রাহ্মণ বাড়িতে আশ্রয় নেন। রাজার মৃত্যু হলে রানীমা তাঁর দু'বছরের শিশুপুত্রকে রেখে সহমরণে যান। সেই রাজপুত্র সুনীলপ্রতাপ, ব্রাহ্মণের এক শিশুপুত্রের সঙ্গে হেসে খেলে বেড়ায়। ওই রাজপুত্রের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। ব্রাহ্মণ আমার কথা নিশ্চয়ই শুনবে। তবে রাজপুত্রের মন ভালো রাখতে ব্রাহ্মণ-পুত্রকেও একই সঙ্গে এখানে নিয়ে আসতে হবে।

রাজা যোগীপুরুষের এই প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে মেনে নিলেন। একসময় শিশুদুটিকে নিয়ে আসা হল। কয়েকদিনের মধ্যে গুলফাপুরীতে গোপনে দু'বছরের রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল চোদো বছরের রাজকন্যার। কেটে গেল দু'টি বছর।

এদিকে বিজয়বাহু রাজকন্যা জীবিত আছে, এ-বিষয়ে মানসিকভাবে নিশ্চিত হয়ে একাগ্রচিত্তে ভাবতে থাকে কীভাবে রাজ্যের সর্বনাশ করবে। একসময় যোগীপুরুষ চলে গেছেন। অন্য রাজ্যে চলে গেছেন সেই খবর পেয়ে বিজয়বাহু সন্ম্যাসীর বেশ ধরে উপস্থিত হল গুলফাপুরীতে। সন্ম্যাসী কারও সঙ্গে কথা বলেন না। তাকে ব্যাডলেই বিজয়বাহু বেরিয়ে পড়ে রাজকন্যার খোঁজে। একদিন সুর্যোদয়ের সাম্রাজ্যক্ষণ্প পৰে অত্যন্ত গোপনে কমলরাজ অন্তপুরে স্থান করছিলেন রাজকন্যা ভদ্রাবতী। একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে বিজয়বাহু গৌড়ে গিয়ে বাহাদুর শাহকে খবরটা দিয়ে তাকে কমলপুর আক্রমণ করার জন্য উত্তেজিত করে তুলল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে বাহাদুর শাহ কমলপুর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হল। একসময় বাহাদুর শাহ, দুর্দতের মাধ্যমে আচ্যুত সেনকে, ভদ্রাবতীকে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন, না দিলে পরিণতিতে যুদ্ধ যে অনিবার্য তাও জানাতে ভুললেন না। এদিকে এই খবরে রাজ্যের মানুষ জানতে পারল, ভদ্রাবতী তখনও অবধি জীবিত রয়েছে। ঠিক সেই সময়ে রাজার সমস্যার কথা যোগবলে জানতে পারলেন যোগীপুরুষ। মানসিকভাবে বল পেলেন রাজা। ওঁরা জানতে পারলেন, সমস্ত এই ঘটনার মূলে রয়েছে বিজয়বাহু। যোগীপুরুষের আশীর্বাদে যুদ্ধে হেরে গেল বাহাদুর শাহ। কিন্তু তা সন্ত্রেও বিজয়বাহু ওরফে কামাল খাঁ নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করে দিল। তার রক্ষিতা সর্ববীকে অনাথ মহিলা সাজিয়ে পাঠিয়ে দিল রাজা আচ্যুত সেনের কাছে। রাজা তাকে স্থান দিলেন রাজপ্রাসাদে। বিজয়বাহুর এক বন্ধু পশ্চিতমশাই সেজে রাজদরবারে পাঠশালা খুলল। সেখানেই পড়তে যেত রাজকন্যার ছেট্ট স্বামী সুনীলপ্রতাপ ও তার বন্ধু।

একদিন বিজয়বাহুর সেই গুরুমশাই সাজা বন্ধু জোর করে খাবার খাওয়ানোর নাম করে বিষ খাইয়ে দিল সুনীলপ্রতাপকে। বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারালো রাজার জামাই। শোকে ভেঙে পড়লেন রাজকন্যা ভদ্রাবতী। কিন্তু যোগীপুরুষদের কৃপায় অপর্ণা মা'র চরণামৃত

খেয়ে প্রাণ ফিরে পেল সুনীলপ্রতাপ। এরপর বিজয়বাহু শ্বেরিণী সর্বাণীকে পরিচারিকা সাজিয়ে পাঠাল রাজ জামাতার কাছে। এদিকে যোগীপুরুষের গণনায় কৃপ্তভাব তখন কাটতে আর বছর দুয়েক বাকি।

অন্যদিকে গৌড়ে তৈরি হল আর এক নাটক। সেখানকার রাজা ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর বিজয়বাহু ওরফে কামাল খাঁ-র প্ররোচনায় বাহাদুর শাহ সিংহাসনচুত করল তার বড় ভাইকে। আবার বাহাদুর শাহ আক্রমণ করল কমলপুর। কিন্তু আগেই এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে গিয়েছিলেন কমলপুরের সেনাপতি প্রতাপচন্দ্ৰ। সেবারের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন রাজ জামাতা সুনীলপ্রতাপ ও তাঁর ব্রাহ্মণবন্ধু মোহন মিশ্র। তাঁদের বীরত্বে আবার পরাজিত হল গৌড়ের রাজা বাহাদুর শাহ।

তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে বিজয়বাহু মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করল। সে শুনেছিল যোগীপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী। অশুভ সময়ের মধ্যে ভদ্রাবতী যদি সংযম না রাখতে পারে তাহলে রাজ্যের সর্বনাশ সন্তুষ্ট হবে। সর্বাণীকে বলা হল, ভদ্রাবতী ও অন্যান্যদের অসাক্ষাতে কুমার সুনীলপ্রতাপকে মোহিত করতে। এক বছর ধরে এ-ধরনের প্রচেষ্টায় সফল হল সর্বাণী। পরিচারিকার কাছে আদি রসাত্মক কাহিনী শুনে চিন্তাঞ্চল্য ঘটল সুনীলপ্রতাপের। একদিন যখন রাজকন্যা স্বামীকে বাতাস করে ঘুম পাড়িয়ে অন্য কক্ষে যাবার জন্য প্রস্তুত, তখন রাজ জামাতা তার স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হলেন। ভদ্রাবতীও তখন ভুলে গেলেন তার ব্রত, তথা যোগীপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। একমাস ধরে রাজকন্যা সহবাস করলেন তার স্বামীর সঙ্গে।

রাজা তখন যথেষ্ট বুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। রোগশয্যায় দিন কাটাচ্ছেন সেনাপতি প্রতাপচন্দ্ৰ। যোগীপুরুষ যোগবলে বুঝতে পারলেন, রাজ্যের ধৰংসের সময় আসন্ন। চরের কাছে সব খবর পেয়ে বিজয়বাহু তখন আবার কমলপুর আক্রমণে উদ্যত হল। বন্দী হলেন রাজা আচ্যুত সেন। বিজয়বাহুর হাতে নিহত হলেন সুনীলপ্রতাপ। স্বামী ও বাবার মৃতদেহ নিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন ভদ্রাবতী। তার আগে যোগীপুরুষের আশীর্বাদে ও অপর্ণা মা-র পদধূলিধন্য তরবারি নিয়ে তিনি (ভদ্রাবতী) যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সুনীলপ্রতাপের বন্ধু মোহন মিশ্র ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরে এলেন রাজধানীতে। কমলপুরে তখন ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। সারি দিয়ে চিতার আগুন জুলছে করতোয়া নদীর তীরে। খবর এল কামাল খাঁ সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। মোহন মিশ্র তাঁর গুরুদেব যোগীপুরুষকে বললেন, আদেশ দিন পাপীর বিরুদ্ধে ঝুঁকে দাঁড়াই। এ-কাজ করতে গিয়ে যদি প্রাণ চলে যায় তাও আমার কাছে শ্রেয় বলে মনে হবে। কারণ, প্রাণ গেলে মনে করব অনন্দাতার ঝণ শোধ করার চেষ্টা করেছি। প্রত্যুন্তরে গুরুদেব বললেন, তুমি বালক, তবুও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছ। কিন্তু মনে রেখো, বিধির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। রাজা ও রাজ জামাতা জীবিত নেই। অধিকাংশ সৈন্যরাই মারা গেছে। মহিলারা স্বেচ্ছায় সহমরণে চলে যাচ্ছেন। আর তিনিদিনের মধ্যে এই বিশাল নগরী ধৰংস হয়ে

যাবে। সীতার যেমন রাবণ ও তাঁর বংশের ধ্বংসের জন্য জন্ম হয়েছিল, কমলপুর ধ্বংসের জন্য জন্ম হয়েছে ভদ্রাবতীর। এটাই বিধির লিখন। কে সেই বিধান খণ্ডবে!

শুরু হল মহাযুদ্ধ। প্রতিপক্ষের আক্রমণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল কমলপুর। যোগীপুরূষ দু'জন ব্রাহ্মণের সহায়তায় দেবীর পাশাগ অঙ্গ গুলফাপুরী থেকে নিয়ে গিয়ে গহন অরণ্যের মাঝে মাটির নীচে পুঁতে রাখলেন। কমলপুর ধ্বংস হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। এর প্রায় দেড়শো বছর পরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন রাজ জামাতা সুনীলপ্রতাপের বাল্যবন্ধু মোহন মিশ্র। তিনি বললেন, গুরুদেব আমাকে গুলফাপুরীর থেকে কামরাপে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি বললেন, মোহন, আমাকে এবার এই দেহ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার মৃত্যুর পর তুমি এখানে থাকতে পার। তা না হলে বঙ্গদেশে গিয়ে করতোয়া নদীর তীরে মহাপীঠ ক্ষেত্রে অপর্ণা মায়ের মূর্তির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করবে। একদিন স্বপ্নাদেশ পেয়ে আমি এখানে চলে এলাম।

মোহন মিশ্রের নির্দেশে, ঠিক কোন্ জায়গায় তাঁর গুরুদেব সতী অঙ্গকে পুঁতে রেখেছিলেন তা জানতে, তার কাছাকাছি জায়গায় দু'জন ব্রাহ্মণ তপস্যা শুরু করেন। এই দুই ব্রাহ্মণের নাম মথুরেশ চক্রবর্তী ও মনোহর চক্রবর্তী। মথুরেশ চক্রবর্তী থাকতেন পূর্বদিকে, গোবিন্দপুর গ্রামে এবং মনোহর চক্রবর্তী থাকতেন দেবী পুরীর পশ্চিমদিকের একটি বটগাছের তলায়।

একদিন ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। জনেক শাঁখারী করতোয়া নদীর পথ ধরে ব্যবসার জন্য দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় একটি সাত-আট বছরের সুন্দরী মেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি নিয়ে যাচ্ছে ? শাঁখারী বললেন, শাঁখা বিক্রি করতে যাচ্ছি। সেই ছেট্ট মেয়েটি জানতে চাইল, শাঁখা দিয়ে কি হয় ? উত্তর দিলেন শাঁখারী, মেয়েরা হাতে শাঁখা পরেন।

বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তাহলে তুমি আমাকে একজোড়া শাঁখা পরিয়ে দাও। শাঁখারী জিজ্ঞেস করল, তোমার শাঁখার দাম দেবে কে ?

বালিকা বলল, ওই গাছতলায় আমার বুড়ো বাবা তপস্যা করছেন। তাঁকে গিয়ে বলবে, আপনার মেয়ে শাঁখা নিয়েছে, দামটা দিয়ে দিন। মালার থলিতে পয়সা আছে, সেখান থেকে দিতে বলবে। শাঁখারী আর কোনও দ্বিধা না করে বালিকার দু'হাতে শাঁখা পরিয়ে দিল। তারপর ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে ডাকাডাকিতে মনোহর চক্রবর্তীর ধ্যান ভেঙে গেল। বললেন, কি বলছ তুমি ? এবার ব্রাহ্মণের আরও অবাক হওয়ার পালা। শাঁখারী বললেন, আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে। তার দাম ছ'আনা। পয়সাটা আমায় দিয়ে দিন। আশ্চর্য হয়ে যান ব্রাহ্মণ মনোহর চক্রবর্তী। তারপর বললেন, কোথায় আমার মেয়েকে শাঁখা পরালে ?

শাঁখারী বললেন, ওই করতোয়ার পাড়ে, এখনও সে সেখানে বসে খেলা করছে।

ବ୍ରାହ୍ମମ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, କତ ବଡ଼ ମେଯେ ?

ଉତ୍ତର ଦିଲେନ ଶୀଘ୍ରାରୀ, ସାତ-ଆଟ ବଚରେର ହବେ । ପରମାସୁନ୍ଦରୀ । ତାର ହାତେ ଶୀଘ୍ରା ଦୁଟୋ ଖୁବ ଭାଲ ମାନିଯେଛେ । ଆପନାର ମେଯେ ବଲେଛେ, ଆପନାର ମାଲାର ଥଲିତେ ପୟସା ରାଖା ଆଛେ ।

ବ୍ରାହ୍ମଗେର ତୋ ଆବାର ହତବାକ ହେଁଯାର ପାଳା । ଦେଖଲେନ, ସତିଇ ମାଲାର ଥଲିତେ ପୟସା ରାଖା ଆଛେ । ତଥନ ତିନି ଶୀଘ୍ରାରୀକେ ବଲଲେନ, ଚଲ, ମେଯେର ହାତେ ଶୀଘ୍ରା ଦେଖେ ଦାମ ଦେବ ।

ଦୁଇଜନେ ଏସେ ଦେଖଲେନ କେଉଁ କୋଥାଓ ନେଇ । ଶୁଦ୍ଧ ଧୂଲୋଯ ଖେଲାର ଚିହ୍ନ ଆଁକା ରଯେଛେ । ବ୍ରାହ୍ମମ ସବ ବୁଝିତେ ପାରଲେନ । ମନେ ମନେ ଭେବେଛିଲେନ, ଯଦି ମା'କେ ମାନସଚକ୍ଷେ ଦେଖିତେ ପାଓୟା ଯାଯ । ଆହୁଡ଼େ ପଡ଼ିଲେନ ସେଇ ଧୂଲୋର ଓପରେ । କାଂଦିତେ ଲାଗଲେନ ଶୀଘ୍ରାଓ ।

ଅନେକକ୍ଷଣ ଧରେ କରତୋଯା ନଦୀର ଜଲେର ଓପର ଦେଖା ଗେଲ ଶୀଘ୍ରା ପରା ଏକଟି ଛୋଟୁ ହାତ । ସତି ହଲ ସାଧକେର ସ୍ଵପ୍ନ ।

ଭବାନୀପୁରେ ସେଥାନେ ମା ତାଁର ଶୀଘ୍ରା ପରା ହାତ ଦେଖିଯେଛିଲେନ, ସେଇ ଜାୟଗା ଏଥିନ ମଜେ ଗେଛେ । ମଜା ଡୋବାଯ ପରିଗତ ଓହି ଜାୟଗାଟି ପରେ ପୁକୁରେ ପରିଗତ କରା ହୁଯ । ପୁକୁରେର ନାମ ଦେଓୟା ହୟ ଶୀଘ୍ରାଇ । ସେଇ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ଶୀଘ୍ରାରୀ ଓ ତାଁର ବଂଶଧରେରୋ ପାବନା ଜେଲାର ଅଧିନ ନିମାଇଚାରାତେ ବାସ କରତେନ । ତାଁର ବଂଶଧରେରୋ ମା'କେ ନିୟମିତଭାବେ ଏକ ଜୋଡ଼ା ଶୀଘ୍ରା ଦିତେନ । ପରେ ବଂଶ ଲୋପ ପାଓୟା ସେଇ ପ୍ରଥା ଲୋପ ପେଯେଛେ ।

ଆର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମମ ମଥୁରେଶ ଚକ୍ରବତୀ ମାୟେର ଦର୍ଶନ ପାଓୟାର ଜନ୍ମ ଆହାର-ନିନ୍ଦା ତ୍ୟାଗ କରେ ଗଭିର ତପସ୍ୟାୟ ମଘ ହଲେନ । ତାଁର ଦୁଇଟି ଗରୁ ଛିଲ । ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ତାଦେର ଦୁଧ ଖେଯେ ତିନି ଜୀବନ ଧାରଣ କରତେନ । ଏକଜନ ରାଖାଲ ଗରୁ ଦୁଇଟିକେ ସ୍ବାସ୍ଥାଓୟାନୋର ଜନ୍ମ ମାଟେ ନିଯେ ଯେତେନ । ପ୍ରତିଦିନ ତାରା ପାଁଚ ସେର କରେ ଦୁଧ ଦିତ । ଏକମମ୍ୟ ଦୁଧେର ପରିମାଣ କମେ ଆସତେ ଲାଗଲ । ଏକଦିନ ତାରା ଆର ଦୁଧ ଦିଲ ନା । ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେନ ବ୍ରାହ୍ମମ । ମନ୍ଦେହ କରତେ ଲାଗଲେନ ରାଖାଲକେ । ରାଖାଲ ତୋ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ବଲେ ଦିଲ, ଆମି ଦୁଧ ଖାଇ ନା, ବିକ୍ରିଓ କରି ନା । ଏକଦିନ ରାଖାଲ ଦେଖିଲ, ଏକଟି ଗରୁ ଗହନ ବନେର ମଧ୍ୟେ ଛୋଟୁ ବେଲଗାଛେର ତଳାୟ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଦୁଧ ଢେଲେ ଦିଚେ । ପରେ ଆରଓ କୋଣେ ଗିଯେ ଏକଇ କାଜ କରଲ । ପରେର ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମମ ଓ ରାଖାଲ ଏକଇ ଘଟନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରଲ । ମଥୁରେଶ ଓ ମନୋହର, ସମସ୍ତ ଘଟନା ଜାନାଲେନ ତାଦେର ଗୁରୁଦେବେ ମୋହନ ମିଶ୍ରକେ । ମୋହନ ମିଶ୍ର ତାଦେର ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ବଲଲେନ, ଅନେକ ଜମ୍ମେର ପୁଣ୍ୟଫଳେ ଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟେର ମଧ୍ୟେ ତୋମରା ଏକାଜେ ସଫଳ ହତେ ପେରେଛ ।

ମଥୁରେଶର ଗରୁ ସେଥାନେ ଦୁଧ ଢେଲେଛିଲ ସେଥାନେ ଗର୍ତ୍ତ ଖୁଡେ ପାଓୟା ଗେଲ ଅପର୍ଣ୍ଣ ମା'ର ପାଯାଗାକ୍ୟର ଦେହଥଣ୍ଡ । ଶିଳାଖଣ୍ଡଟି ତୁଲେ ବେଲଗାଛେର ତଳାୟ ରାଖା ହଲ । ଗରୁଟି ଦ୍ଵିତୀୟବାର ସେଥାନେ ଦୁଧ ଢାଲଛିଲ ସେଥାନେ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଡାର ପରେ ଦେଖା ଗେଲ ଶିବଲିଙ୍ଗେର ମାଥା । ମୋହନ ମିଶ୍ର ବଲଲେନ, ଗୁରୁଦେବେର କାହେ ଶୁଣେଛି, ବାମେଶ ତୈରବ ଏଥାନେ ଗୁପ୍ତଭାବେ ଅବସ୍ଥିତ । ବୋଧହ୍ୟ ଇନିଇ ହଲେନ ତୈରବ ବାମେଶ । ଶିବଲିଙ୍ଗକେ ଆର ଓଠାନୋ ହଲ ନା । ବେଲଗାଛେର କାହେ ଏକଟି କୁଟିର ତୈରି କରେ ମା'କେ ସ୍ଥାପନ କରା ହଲ । ଗୁରୁଦେବେର ଆଦେଶେ ମା'କେ କାପଡ଼ ଦିଯେ ଢେକେ ରାଖା ହଲ । ଏକଇ ସଙ୍ଗେ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ତାଁର ଦୁଇ ବ୍ରାହ୍ମମ ଶିଷ୍ୟକେ ମାୟେର ପୂଜା ପନ୍ଦତି ଶିଖିଯେ

তা গোপন রাখতে বললেন।

বর্তমানে দেবী অপর্ণা ভবানী নামে পূজিতা হন। মায়ের সর্বাঙ্গে কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে। শুধুমাত্র সোনার মুখটি দেখা যায়। আজও ওই দুই ব্রাহ্মণ পরিবারের উন্নতরসূরিগুলো মায়ের পুজো করেন। মনোহর ও মথুরেশ চক্ৰবৰ্তী মায়ের জন্য কুটির তৈরি কৰিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে পাঠান সেনাপতি রহমৎ খাঁ বেলগাছের কাঠ দিয়ে একটি ‘শোড় বাঙ্গলা’ তৈরি করান। তার সঙ্গেও রয়েছে দেবীর এক অলৌকিক কাহিনী।

একসময় গৌড়ের পাঠান নরপতি বৰ্বৰ শা'র মন্ত্রী সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন হাবসীদের সমূলে নিধন করে প্রভুবধের প্রতিশোধ নেন। তিনি কোচবিহার আক্ৰমণ করে আগেকাৱ রাজবংশ ধৰংস কৰেন। পৰে নিজেৰ ছেলে ও সেনাপতি রহমৎ খাঁকে সেখানে রেখে গৌড়ে ফিরে আসেন।

কোচবিহারের বৰ্তমান রাজবংশের স্থাপয়িতা অনেক কোচ সৈন্য নিয়ে গৌড়ের রাজপুত্র ও সেনাপতিকে প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ কৰেন। যুদ্ধে রাজপুত্র ও সেনাপতি পৰাজিত হয়ে পালাতে থাকেন। গৌড়ে আশ্রয় নেন রাজকুমাৰ। কিন্তু সেনাপতি নৌকা কৰতোয়া নদীৰ চড়ায় আটকে যায়। সেনাপতি রহমৎ খাঁ ও তাঁৰ সঙ্গীসাথীৱা অনেক চেষ্টাচৰিত্ব কৰেও নৌকা ভাসাতে সমৰ্থ হলেন না। এমনসময় তাঁৰা জানতে পাৱলেন, সামনে বনেৰ মধ্যে হিন্দুদেৱ এক দেৱী আছে, যাঁৰ কাছে যে যা মানত কৰে তাৰ সেই বসন্তা পূৰ্ণ হয়। তখন সেনাপতি রহমৎ খাঁ মায়েৰ কুটিৱৰে সামনে এসে প্ৰার্থনা জানান। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। তখন মথুরেশ ও মনোহৰ চক্ৰবৰ্তী, পেঙ্গলেশ্বৰে বিশ্বাসৰত তাঁদেৱ গুৱৰ কাছে গিয়ে সব জানালেন। গুৱৰদেব মোহন মিশ্র তাঁৰ শিষ্যদেৱ এক বিশেষ ত্ৰিয়াৰ নিৰ্দেশ দিলেন। গুৱৰদেবেৰ আদেশে কাজ কৰা মাত্ৰ প্ৰবল বৃষ্টি শুৰু হল। সেনাপতিৰ নৌকা আবাৱ জলে ভাসল। বিপদমুক্তিৰ কিছুদিন পৰে সেনাপতি রহমৎ খাঁ মায়েৰ মন্দিৰ সংলগ্ন সব জঙ্গল পৰিষ্কাৰ কৰিয়ে ‘শোড় বাঙ্গলা’ তৈৰি কৰিয়ে দেন। কিন্তু ১২৯২ সালেৰ ভূমিকম্পে সেটি ধৰংস হয়ে যায়।

ঈশ্বৰেৰ কি বিচিত্ৰ লীলা। একদিন যে মুসলিম ধৰ্মাবলম্বী মানুষ ওই পুৱৰী ধৰংস কৰেছিল, আবাৱ সেই মুসলমান সম্প্ৰদায়েৰ মানুষজনই মায়েৰ মন্দিৰ তৈৰি কৰে দেন।

মনোহৰ চক্ৰবৰ্তী অপৰ্ণাদেৱীৰ পুৱৰীৰ পশ্চিমদিকে প্ৰায় এক মাইল দূৰে খিয়ানী গ্ৰামে বাসত্বন তৈৰি কৰে পৰিবাৱ-পৰিজনসহ বাস কৰতেন। তাঁৰ ওপৰ দায়িত্ব ছিল অপৰ্ণা মায়েৰ প্ৰাত্যহিক স্নান-পুজোৰ ব্যবস্থা কৰা। অন্যদিকে মথুরেশ চক্ৰবৰ্তী তাঁৰ আগেৱ জায়গা গোবিন্দপুৱেৰ বাসগৃহ তৈৰি কৰে সপৰিবাৱে সেখানে থাকতে শুৰু কৰেন। তিনিও মহামায়াৱ স্নান, ভোগ রান্না ও বলিদানেৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰেন। বলিদান কৰতেন বলে তাঁৰ বৎশ ‘তলাপাত্ৰ’ উপাধি পান। কিন্তু দুঃখেৰ বিষয়, মনোহৰ ও মথুরেশ চক্ৰবৰ্তীৰ কাজে বারেন্দ্ৰ ব্রাহ্মণ সমাজে সমালোচনাৰ ঘড় ওঠে। একঘৰে হয়ে যান তাঁৰা।

আশৰ্য্যেৰ বিষয়, গুৱৰদেব মোহন মিশ্রকেও পেঙ্গলেশ্বৰ ধামে গ্ৰামেৰ ও আশেপাশেৰ

কিছু দুষ্টলোক ভীষণ উৎপাত শুরু করল। একমসয় তিনি বিরক্ত হয়ে কৃপাখালি নদীতীরের বনের মধ্যে এটি পাকুড় গাছের তলায় আশ্রয় নেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন পাষাণময় কালাচাঁদ। এই পাকুড় গাছ থেকেই ক্রমে গ্রামের নাম হয়েছিল পাকুড়িয়া। একদিন রাতে ঘূমন্ত অবস্থায় মোহন মিশ্র স্বপ্নে দেখলেন দেবী বলছে, ‘মোহন এ ঘোর কলিকালে তুমি যে মন্ত্রের উপাসক হয়েছ, তাতে দার পরিগ্রহ করে শক্তির সাহায্য গ্রহণ করলে আমার সাক্ষাৎ পাবে, না হলে তোমার এই সাধ অপূর্ণই থেকে যাবে।’ স্বপ্নেই উন্নত দিলেন মোহন মিশ্র, ‘মা আমি এখন তো অতি বৃদ্ধ হয়েছি। তায় বিদেশি, অজ্ঞাতকুলশীল। এখানে কে আমায় ব্রাহ্মণকল্যা সম্প্রদান করবে?’ উন্নত দিলেন দেবী, ‘তুমি চিন্তা করোনা। কাল সকালে তুমি কিছু দূরে উদিশা গ্রামে চলে যাও। আমার নির্দেশে ওই গ্রামের কুমুদানন্দ চক্রবর্তী তোমাকে তার কল্পগুণবতী কল্যা সম্প্রদান করবে।’ পরেরদিন মোহন মিশ্র ওই গ্রামে গেলেন। যথারীতি অপর্ণা মায়ের আদেশে ভক্ত কুমুদানন্দ তাঁর কল্যা ভবনীকে, মোহন মিশ্রের হাতে সম্প্রদান করলেন। এই ঘটনায় গ্রামের সকলে কুমুদানন্দকে সমাজচ্যুত করলেন। ঘটনাপরম্পরায় বিচলিত হয়ে মোহন মিশ্র তাঁর শ্বশুরের স্বার্থে মহারাজা কংসনারায়ণের শরণাপন্ন হন।

রাজা কংসনারায়ণের রাজত্ব ছিল রাজশাহী জেলার বারাহী নদীতীরে। তাহিরপুর নগরেই তিনি ভূমাধিকারী হলেও করদ রাজাদের মত ছিলেন। কিছু দিন ধরে গুরুদেব মোহন মিশ্র পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে তাহিরপুর আসেন। সেখানে পা রাখার পরেই শুনলেন, রাজধানীতে হাহাকার লেগেছে। অনেককে জিজ্ঞেস করায় জানতে পারলেন, রাজা কংসনারায়ণের একমাত্র যুবক ছেলে হঠাতে মারা গেছেন। শোনা গেল, ওই মৃত যুবকের সৎকারের আয়োজন চলছে। তখনও মোহন মিশ্রের স্বান-আহিক হয় নি। হঠাতে তাঁর মনের মধ্যে রাজকুমারের মৃতদেহ দেখার বাসনা জেগে উঠল। তিনি জনৈক কর্মচারীকে মৃতদেহের কাছে তাঁকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কেউ তার সেই কথায় কান দিল না। শেষ পর্যন্ত রাজাকে কেউ সেই প্রস্তাবের কথা জানালে কংসনারায়ণ বললেন, আপন্তি কি! নিয়ে এসো তাঁকে।

পশ্চিমদেশী সন্ন্যাসীবেশী ব্রাহ্মণ মৃতদেহ স্পর্শ করে বললেন, আপনাদের রাজকুমারের মৃত্যু হয়নি। দৈব দুর্বিপাকে মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছেন। মহাস্বন্দ্যয়নে ওর চৈতন্য আবার ফিরে আসবে।

তাঁর কথায় রাজা সম্মত হয়ে সন্ন্যাসীর যা যা প্রয়োজন তাই সরবরাহ করার আদেশ দিলেন। রাজকুমারের মৃতদেহ কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হল। সেখানেই গভীর রাতে যোগীবর জনৈক পুরোহিতকে দিয়ে মহাপুজোর আয়োজন করলেন। ধ্যানমগ্ন মহার্থি বুরুতে পারছিলেন, কিছুতেই পুরোহিতের পক্ষে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। বারবার বাধা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন পুরোহিত। বললেন, মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে একথা প্রমাণ করুন। সন্ন্যাসী ত্রিশূল দিয়ে প্রতিমার গায়ে আঘাত করতে কিছুটা মাটি ঝরে পড়ল।

পুরোহিত তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসীকে পুজোর আসন ছেড়ে দিলেন।

এরপর আসনে বসলেন স্বয়ং মোহন মিশ্র। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ধ্যানে বসলেন। অনেকক্ষণ পরে পুরোহিত ঠাট্টা করে বললেন, এবার বুঝি প্রাণ এসেছে। তখন সন্ন্যাসী একটি বেলপাতার শির প্রতিমার পায়ে আঘাত করামাত্র স্থেখান থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। ওই ঘটনা দেখে পুরোহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। স্থেখানে উপস্থিত দু'একজন ছুটে গিয়ে রাজাকে এই অভূতপূর্ব সংবাদ দিলেন। রাজা কংসনারায়ণ ছুটে এলেন তাঁর কাছে। মায়ের চরণের রক্তন্ত্রাত জ্যায়গাটি রক্তচন্দন দিয়ে প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন সন্ন্যাসী। এক প্রহর সময় পুজো চলার পর সম্পূর্ণ হল বলিদান। একসময় মৃত হিসাবে ঘোষিত রাজকুমার ধীরে ধীরে জেগে উঠলেন।

সবাই বলতে শুরু করলেন, এই সন্ন্যাসী মানুষ নন, দেবতা। রাজকুমারকে বাঁচানোর জন্য স্বর্গ থেকে এসেছেন। সারা রাজ্য আনন্দে মেতে উঠল। পরেরদিন সকালে মোহন মিশ্র রাজাকে নিজের পরিচয় জানালেন। নিজের শ্বশুরের অবস্থাও তাঁকে জানালেন। রাজা কংসনারায়ণ বললেন, দেব, এ অতি তুচ্ছ কাজ। আজই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বিকেলে রাজা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজনকে নিয়ে এক সভার আয়োজন করে উপস্থিত সকলের সামনে বললেন, যে মহাদ্বাৰার অঙ্গুত ক্ষমতাবলে গতকাল আমার পুত্র জীবন ফিরে পেয়েছে, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদৱ। অনেকদিন আগে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি কামরূপ যাত্রা করেছিলেন। সম্প্রতি মহামায়ার আদেশে ডিশি প্রামের কুমুদানন্দ চক্ৰবৰ্তীর মেয়ের সঙ্গে ওঁৰ বিয়ে হয়েছে। অজ্ঞাত কুলশীলকে মেয়ে দেবার জন্য কুমুদানন্দকে একঘরে করা হয়েছে। এখন পরিচয় পাওয়ার পর পরিষ্কার হয়ে গেছে, কুমুদানন্দ যোগীবরের হাতে কল্যা সম্পদান করে কোনও অন্যায় করেন নি। তাই আমি সানন্দে ঘোষণা করছি, আজ থেকে কুমুদানন্দ চক্ৰবৰ্তী ও তাঁর কল্যা-জামাতা স্বচ্ছন্দে এখানে বসবাস করতে পারবেন। এতে যার অমত থাকবে তাকে সমাজচুক্যত করা হবে।

সকলেই রাজা কংসনারায়ণের সঙ্গে একমত হলেন। রাজা যোগীবরকে প্রচুর ধন, রত্ন, জ্যায়গা দিতে চাইলেন। সন্ন্যাসী বললেন, আমার এসব কোনকিছুরই প্রয়োজন নেই। সেইসময় থেকেই মোহন মিশ্র, গুণধর ঠাকুর নাম ও রাজা কংসনারায়ণের বংশ, গোত্র, গাঁই গ্রহণ করলেন। রাজা ছিলেন সিদ্ধ শ্রোত্রিয় শাস্ত্রিল্য গোত্রজ, নামসী গাঁই। সেইদিন থেকে ধারা নগরীর রাজগুরুর বংশধর মোহন মিশ্র রাজা কংসনারায়ণের জ্যেষ্ঠ সহোদৱ সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রিল্য গোত্রজ, নন্দনবাসী গাঁই নামে সমাজে পরিচিত হন। রাজা কংসনারায়ণ কুলীন ব্রাহ্মণদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। নির্দোষী কুলীনদের নিয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আট পটীতে বিভক্ত ছিল। আট পটীর মধ্যে যোগীবরের শিষ্য মনোহর ও মথুরেশ চক্ৰবৰ্তীর আশ্রয়দাতা কুলীনগণ ভবনীপুরী পটী নামে বিখ্যাত হন।

মোহন মিশ্র তথা গুণচন্দ্র ঠাকুর পাকুড়িয়াতে সন্তুষ্ট বাস করতেন। বৃন্দ বয়সে তাঁর তিনটি পুত্র হয়। প্রথমটির নাম রত্নগৰ্ভ, দ্বিতীয়টির নাম রাঘব বা শ্রীগৰ্ভ, কনিষ্ঠের নাম

কাশীনাথ। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে মোহন মিশ্র শরীর ত্যাগ করেন। যে পাঠান সেনাপতি ষোড়বাঙ্গলা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি রত্নগর্ভকে গৌড়ে নিয়ে পাসীভাষায় শিক্ষিত করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় রত্নগর্ভ নবাব সরকারের কাজ করতে থাকেন। মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন।

এক সময় বারেলু ব্রাহ্মণ কালাচাঁদ রায় অবস্থা বিপাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে রাজশাহীর দিকে এগোতে থাকেন। রত্নগর্ভ মজুমদার তখন তাঙ্গা নগরীতে ছিলেন। রত্নগর্ভ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালেন প্রয়াত সেনাপতি রহমৎ খাঁ'র ছেলে সেখ হিম্মত খাঁ'কে। হিম্মত খাঁ এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন। ততদিনে কালাপাহাড় ধ্বংস করে দিয়েছেন পেঙ্গলেশ্বরধাম। কিন্তু সেদিন একজন মুসলমান সেনাপতির তৎপরতায় ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল মহামায়ার ধাম।

সপ্তদশ শতকে তখন দিল্লির সিংহাসনে রয়েছেন আকবর। ওই সময় টোডরমল্ল ও মানসিংহ বাংলাদেশে শাস্তিরক্ষার দায়িত্ব নেন। রাজশাহী জেলার সাঁটৈল গ্রামে রামকৃষ্ণ রায় নামে জনৈক স্থিতিধী মানুষ সেইসময় আটটি পরগণার অধিপতি হন। দিল্লির বাদশা তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন। অপর্ণা মায়ের পুরী তৈরি করার জন্য তিনি সম্রাট আকবরের কাছে থেকে যে সনদ পান, সেখানে 'ভবানী থান' বলে উল্লেখ থাকায়, দেবী অপর্ণা নামে এবং তাঁর পুরী ভবানীপুর নামে চিহ্নিত হয়। ১২৯২ সালের প্রারম্ভে প্রবল ভূমিকম্পে মন্দিরটি ধ্বংস হয়ে যায়। রাজা রামকৃষ্ণ নতুন মন্দিরে অপর্ণা মা-কে এনে প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু অপর্ণমা রাজা রামকৃষ্ণকে রাতে স্বপ্নে ঘুলেন, নস্তার বাঙালাতে শুধু নস্তা দেখে, আমাকে দেখে না। আমাকে আগের মন্দিরে বেঁধে আয়।' দেবীর আদেশে রামকৃষ্ণ অপর্ণা মাকে আবার পুরনো ষোড়বাঙ্গলায় বেঁধে আসেন। রাজার আদেশে ভবানীপুরীর পূবদিকে, রাজমহিষী সর্বাণীর নামে একটি বড় পুকুর কাটা হয়। আজ তা পাঁঠা ধোওয়া পুকুর নামে পরিচিত। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুতে বাদশাহ হন জাহাঙ্গীর। তখন বাংলার সুবেদার হন ইসলাম খাঁ। তিনি অপর্ণা মা'র মন্দিরের ষোড়বাঙ্গলার নির্মাণকারী রহমৎ খাঁ'র পৌত্র এবং হিম্মৎ খাঁ'র পুত্র।

রত্নগর্ভের ভাই রাঘব ঠাকুর ছিলেন উচ্চ কোটির সাধক। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় আশ্চর্য হন নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন রায় এবং রঘুনন্দন রায়। রামজীবন রায়ের দন্তক পুত্র রাজা রামকান্ত প্রথমে বৈষ্ণব গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার আগ্রহী হলে তার ওপর দৈব অভিসম্পাত নেমে আসে। রামকান্ত শেষপর্যন্ত কুমার বিষ্঵ানন্দ ঠাকুরের কৃপায় রোগমুক্ত হন। এই রামকান্তের স্ত্রী-ই হলেন রাণী ভবানী। স্বামী স্ত্রী দু'জনেই প্রায় একবছর সময় এই মন্দিরে কাটান। রামকান্তের গুরু কালু তর্কবাগীশ অপর্ণা মায়ের বিশেষ অনুগ্রাহিত ছিলেন। সাঁ তৈলের রাণী সত্যবতী মণিমুক্তাখচিত একটি সোনার ছত্র দেবী অপর্ণা মায়ের মাথায় রাখার জন্য দিয়েছিলেন। একদিন জনৈক দরিত্ব ব্রাহ্মণ মন্দিরের মধ্যে গিয়ে সোনার ছত্রটি কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে বাইরে চলে গেলেন। রাতে কালু

তর্কবাগীশকে 'মা' স্বপ্ন দিয়ে বললেন, 'কালু, আমার সোনার ছাতাটা এক গরীব ব্রাহ্মণকে দিয়েছি। ছাতাটা আমার খুব প্রিয়। ব্রাহ্মণ বেশি দূরে যেতে পারেন। পথে ঘূরপাক থাচ্ছে। তুমি উপযুক্ত অর্থ দিয়ে ওটি ফিরিয়ে নিয়ে এসো।' বগুড়া ও শেরপুরের মধ্যে একটি জায়গা থেকে ব্রাহ্মণকে ধরে, নগদ এক হাজার টাকা দিয়ে ছ্রষ্টি ফেরৎ আনা হয়।

রাণী ভবানী ভবানীপুরের বড় ধরনের বারোদুয়ারি মন্দির তৈরি করিয়ে ভবানীপুর শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা রামকৃষ্ণ ভবানীধামে কয়েক বছর তপস্যা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রাচীনকালে ভবানী পুরীর চারদিকে পরিখা ছিল। আজও তাঁর চিহ্ন আছে। বর্ষায় জল জমে। একটি পাকা মন্দিরে মা অধিষ্ঠিতা আছেন। 'মা' চতুর্বর্গ ফল প্রদান করেন। তিনি মোক্ষদাত্রী। তাঁরই ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত হয়। তিনিই স্বয়ং ভগবত্তী। তিনিই পরম ব্রহ্ম।

ভবানীপুর মন্দির সংস্কার, উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটির গঠনতন্ত্র

ধারা : ১

নামকরণ : এই কমিটির নাম হবে : ভবানীপুর মন্দির সংকার, উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি।

ধারা : ২

ঠিকানা : বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা সদরে গোর এলাকায় সংগঠনের প্রধান কার্যালয় অথাৎ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া ভবানীপুরসহ প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে (কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে)।

ধারা : ৩

কর্মক্ষেত্র : সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী এই সংগঠনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত থাকবে।

ধারা : ৪

মনোগ্রাম : দেবী মহামায়ার শাখা পরিহিত হস্তযুগল জনের মধ্যে থেকে উর্ধবমুখী দৃশ্যমান হবে।

ধারা : ৫

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : (ক) বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের শ্রীশ্রী মা ভবানী মন্দির এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্দিরগুলো সংরক্ষণ, সংস্কার, উন্নয়ন ও সূচী পরিচালনা।

(খ) মন্দিরের অনুকূলে বিভিন্ন সময়ে দানকৃত সম্পত্তি (স্থাবর-অস্থাবর) উদ্ধার করা এবং গ্রহণ করা। মন্দিরে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের দিন নির্ধারণ করা।

(গ) নাটোরের ছেট তরফ এস্টেট সহ অন্যান্য জমিদার, রাজন্যবর্গ এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দানকৃত ভূ-সম্পত্তি এবং সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার, সংরক্ষণ ও

পরিচালনার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(ঘ) ঐতিহাসিক এই পৌঠস্থানে দেশ বিদেশ থেকে আগত পুণ্যার্থী, পর্যটক এবং সর্বসাধারণের আগমন, নির্গমন, পরিদর্শন, পূজা-অর্চনা, অর্ঘ্যদান ইত্যাদির ব্যবস্থা, তাদের আহার, বিশ্রাম ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) পচলিত পথা অনুযায়ী অত্র মন্দিরে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানাদি যেমন : মাঘী পূর্ণিমা, রাম নবমী, দুর্গোৎসব, দীপালিতা (শ্যামা পূজা), শিবচতুর্দশীসহ অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সম্পাদন করা।

(চ) মন্দিরের নিত্য পুজোর আয়োজন সম্পাদন করা, ভোগ ও প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা।

(ছ) সরকার কর্তৃক ভবানীপুর মন্দিরের অনুকূলে প্রদেয় এনুইটি বৃহস্তর কার্যে এই কমিটির পরিচালনা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(জ) ঐতিহাসিক এই পৌঠস্থানের দেশ বিদেশে প্রচার ও প্রসারের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মন্দির সংস্কার ও উন্নয়নকল্পে দেশি বিদেশি সাহায্য অনুদান ইত্যাদি গ্রহণ করা।

(ঝ) ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরি ও মিউজিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা করা।

(ঞ) অনাথ আশ্রম, বৃন্দাবন, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ধারা : ৬

সদস্য পদ : (ক) বাংলাদেশের নাগরিক সন্মান ধর্মাবলম্বী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা মহিলা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারবেন।

(খ) সদস্যের ধরন : (১) সাধারণ সদস্য (২) আজীবন সদস্য (৩) সম্মানীত / উপদেষ্টা সদস্য। (গ) সদস্য পদের পদ্ধতি ও যোগ্যতা :

১. (ক) সদস্য পদ পেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে তাকে সদস্য পদ দেওয়া যেতে পারে। সদস্য পদের জন্য নির্ধারিত ফিজ ও চাঁদা দিতে হবে। সদস্য পদ প্রদানের ব্যাপারে নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। সদস্যগণ ভোটাধিকার প্রাপ্ত হবে।

১.(খ) সংগঠনের কোন বেতন ভোগী কর্মচারী সদস্যপদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২. আজীবন সদস্য : কমিটির অনুকূলে সর্বনিম্ন নগদ ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করে আজীবন সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন। কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এই অঙ্ক হ্রাস বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩. সম্মানিত সদস্য : দেশের যে কোন বিশিষ্ট নাগরিককে পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্মানিত সদস্য পদ দেওয়া যেতে পারে। তবে সম্মানিত সদস্য পদের কোন ভোটাধিকার

থাকবে না।

৪. সদস্য পদের অবসান ও বাতিল : (ক) কোন সদস্যের মৃত্যু হলে (খ) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় তার সদস্য পদ প্রত্যাহারের আবেদন জানালে (গ) সংগঠনের স্বার্থবিরোধী বা ভাবমূর্তির পরিপন্থি কোনও কাজ করলে, নেতৃত্ব স্থলনজনিত অভিযোগ আদালত কর্তৃক প্রমাণিত হলে, কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। কার্যনির্বাহী সদস্য পর পর তিনটি নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকলে সদস্য পদ খারিজ হয়ে যাবে।

ধারা : ৭

সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ :

(ক) সাধারণ পরিষদ (খ) নির্বাহী পরিষদ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ

সাধারণ পরিষদ : সংগঠনের সকল বৈধ সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। সংগঠনের সার্বভৌম ও গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ হিসাবে গঠনতত্ত্ব অনুমোদন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন সহ গঠনতত্ত্বে বর্ণিত দায়-দায়িত্ব পালনে যাবতীয় ক্ষমতা এই পরিষদ প্রয়োগ করবে।

প্রতি বছরে একবার সুবিধামত সময়ে সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাহী পরিষদ :

নির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৫১ (একাত্ত্বান) কমিটির পদসমূহ নিম্নরূপঃ

সভাপতি	১জন
সহ-সভাপতি	৫জন
সাধারণ সম্পাদক	১জন
যুগ্ম সম্পাদক	১জন
সহ-সাধারণ সম্পাদক	৩জন
কোষাধ্যক্ষ	১জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	২জন
দফতর সম্পাদক	১জন
সহ-দফতর সম্পাদক	২জন
অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক	১জন
সহ-অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক	২জন
প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক	১জন
সহ-প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক	২জন
আইন বিষয়ক সম্পাদক	১জন

সহ-আইন বিষয় সম্পাদক	২জন
নির্বাহী সদস্য	২৪জন
	মোট ৫১জন
উপদেষ্টা পরিষদ :	
প্রধান উপদেষ্টা	১ জন
উপদেষ্টা	৩০ জন
	৩১ জন

ধারা : ৮

নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা : নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। মেয়াদ পূর্তির তিনমাস আগে সাধারণ সভায় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। দৈব দুর্বিপাক কিংবা অনিবার্য কারণবশতঃ নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি অন্তবর্তী দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। অন্তবর্তী সময়ের জন্য নির্বাচন পরিচালনা কমিটি শুধুমাত্র দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনা করবেন। কোনও নীতিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

ধাৰা :: ১৮

নির্বাহী পরিষদের দায় দায়িত্ব ও কর্তব্য

সভাপতি : ৩. তিনি সংগঠনের সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী হবেন।

৪. তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

৫. তিনি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের কাজ পরিচালনার জন্য অগ্রিম ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। পরে নির্বাহী পরিষদের সভায় উক্ত খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

৬. বিতর্কিতমূলক কোন বিষয়ে তিনি একটি কাস্টিং ভোট প্রদানের মাধ্যমে চৃড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে পারবেন।

৭. সভাপতি যে কোনও ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে নির্বাহী পরিষদের যে কোন কর্মকর্তাকে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে পারবেন।

৮. গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন বিতর্কে সভাপতির ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সহ সভাপতি :

সংগঠনের কার্যক্রমে সহ-সভাপতিগণ সভাপতিকে সাহায্য করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রম অনুসারে সহ-সভাপতিগণ অস্থায়ী সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

সাধাৰণ সম্পাদক ১

৩. তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংগঠনের সকল সভা আহুন করবেন।

৪. তিনি সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সংগঠনের যে কোনও ব্যাপারে সরকারী বা বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. তিনি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ/পুনর্বাহন/বরখাস্ত/প্রশাসনিক পদক্ষেপ ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারবেন।

৬. তিনি পদাধিকার বলে সংগঠনের যে কোনও কাজে সভাপতি/সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

৭. তিনি সংগঠনের যাবতীয় রেকর্ড ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং সকল সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৮. তিনি জরুরী অবস্থায় যে কোনও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবেন। তবে তা নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন নিতে হবে। তিনি প্রতিষ্ঠানের আয়বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

৯. তিনি সকল প্রকার বিল ভাউচার অনুমোদন করবেন। পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল প্রকার খরচের অনুমোদন নিতে হবে।

১০. সংগঠনের অর্থ/সম্পত্তি গাছিত রাখা ও তার ব্যাপ্তি হিসাব রাখবেন।

১১. তিনি বাংসরিক বাজেট ও কার্যবিবরণী তৈরি করবেন।

১২. তিনি সংগঠনের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য অগ্রিম ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। নির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় সেই ব্যয় অনুমোদন করে নিতে হবে।

যুগ্ম সম্পাদক :

১. সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবেন।

২. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক :

১. সহ সাধারণ সম্পাদকগণ সংগঠনের যাবতীয় কাজে সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

২. যুগ্ম সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ সাধারণ সম্পাদকগণ ক্রমানুসারে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

কোষাধ্যক্ষ :

১. আর্থিক কর্মকাণ্ডের হিসাব সংরক্ষণে সাধারণ সম্পাদকগণ সহযোগিতা করবেন এবং আর্থিক সংক্রান্ত নথিপত্র ও ভাউচারাদি সংরক্ষণ করবেন।

২. প্রাপ্ত নগদ টাকা/চেক/দ্রব্যাদি গ্রহণের সময় রশিদ প্রদান করবেন। প্রাপ্ত অর্থ

প্রতিষ্ঠানের ব্যাক্স হিসাবে জমা করবেন।

৩. বার্ষিক বাজেট ও হিসাব বিবরণী তৈরি করতে সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

৪. তিনি নগদ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অগ্রিম হাতে রাখতে পারবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক :

১. তিনি সংগঠনের সদস্যদেরকে সংগঠিত করে ভাতৃত্ববোধ বজায় রাখা এবং নতুন সদস্য ভর্তির ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাবেন।

২. এছাড়া নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অপৰ্যবেক্ষিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক :

১. সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।

২. এছাড়া নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অপৰ্যবেক্ষিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

দফতর সম্পাদক :

১. সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশক্রমে সংগঠনের অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-দফতর সম্পাদক :

১. সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমান্বয়ে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক :

১. সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ দ্রমে তিনি যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

অনুষ্ঠান বিষয়ক সহ-সম্পাদক :

১. অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

২. অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক :

১. তিনি প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক :

১. প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

নির্বাহী সদস্য :

১. প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

২. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অপৰ্যবেক্ষিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা : ১০

সভা আহ্বান : (১) নৃন্যতম পনের দিনের বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণ সভা এবং সাত দিনের বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

(২) জরুরী সভা : সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে সাত দিনের এবং নির্বাহী পরিষদের

ক্ষেত্রে তিনি দিনের বিজ্ঞপ্তি আহান করতে হবে।

(৩) অতি জরুরী সভা : সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে তিনি দিনের এবং নির্বাহী পরিষদের ক্ষেত্রে ২৪ (চবিশ) ঘন্টার মোটিশে আহান করতে হবে।

ধারা ১১

মূলতুবি সভা : মূলতুবি সভার ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদক সেই সভাতেই অথবা পরবর্তীতে নোটিশের মাধ্যমে সভার তারিখ জানিয়ে দেবেন। মূলতুবি সভায় নতুন কোনও বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং কোরামের প্রয়োজন হবে না।

ধারা ১২

তলবী সভা : সংবিধানগত ভাবে সভা আহানে ব্যর্থ হলে তলবী সভা আহান করা যেতে পারে। নির্বাহী পরিষদের ১/৩ অংশ সদস্য লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদক বরাবর নির্বাহী পরিষদের সভা আহানে অনুরোধ জানাতে পারেন। এই আবেদন ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সভা আহানে ব্যর্থ হলে আবেদনকারীদের একজন আহায়ক হয়ে নির্বাহী পরিষদের সভা আহান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশের গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ১৩ :

সভার কোরাম : সকল পরিষদের সভায় ১/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

ধারা ১৪ :

উপদেষ্টা পরিষদ : নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবার পর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদের প্রথম সভায় একজনকে প্রধান উপদেষ্টা করে ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন। নির্বাহী পরিষদ বিভিন্ন কাজে উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ এবং পরামর্শ গ্রহণ করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ সাধারণ পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভৌটাধিকার থাকবে।

ধারা ১৫ :

তহবিল সংরক্ষণ : (১) সংগঠনের তহবিল সংরক্ষণের জন্য বগুড়া জেলার শেরপুর শহরে অবস্থিত যে কোন তফসিল ব্যাকে সংগঠনের নামে একটি সেভিংস একাউন্ট খুলতে পারবেন। সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিনি জনের মধ্যে যে কোনও দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে ওই হিসাব পরিচালিত হবে। তবে এদের মধ্যে কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর আবশ্যিক। প্রয়োজনে জেলা শহরে একটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা যেতে পারে।

(২) সাধারণ তহবিল ছাড়াও নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনে আরও অন্যান্য তহবিল গঠন করতে পারবেন। সমুদয় ব্যাঙ্ক একাউন্ট ধারা ১৫-১ উপধারার বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(৩) হিসাব নিকাশ নিরীক্ষার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ থেকে দুজন এবং সাধারণ পরিষদ থেকে তিন জন এই পাঁচজনের সমষ্টিয়ে অডিট কমিটি গঠন করে সংগঠনের হিসাব নিকাশ নিরীক্ষা করতে পারবে এবং নিরীক্ষ প্রতিবেদন সাধারণ সভায় উপস্থাপন করবেন।

ধারা ১৬ :

নির্বাচন বিধি : (১) নির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস আগে সাধারণ সভা আহান করতে হবে এবং ওই সভায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হবে। একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যসমষ্টিয়ে গঠিত হবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও প্রার্থী এই কমিটির সদস্য হতে পারবেন না।

(২) প্রচলিত বিধি অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি নির্বাচনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ১৭ :

গঠনতত্ত্ব পরিবর্তন বা সংশোধন : (১) গঠনতত্ত্ব পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন সংক্রান্ত কোনও প্রস্তাব কোনও সদস্য লিখিত আকারে সভাপতির কাছে বরাবর দাখিল করবেন। সভাপতি সেই প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। নির্বাহী পরিষদের সভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে তা সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। সাধারণ পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সেই প্রস্তাবের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

ধারা ১৮ :

ভোটার : সদস্য পদের মেয়াদ ৩ (তিনি) মাসের কম হলে অথবা নির্বাচন তফশীল ঘোষণার আগের মাস পর্যন্ত সদস্য চাঁদা পরিশোধ না থাকলে কোন সদস্য ভোটার যলে গণ্য হবেন না।

ধারা ১৯ :

সংগঠনের পতাকা :

আয়তক্ষেত্রের পতাকা আয়তন = ১০ %

চার রং = লাল, গেরুয়া, নীল ও সাদা।

ধারা ২০ :

নির্বাহী ও উপদেষ্টা পরিষদের শূন্য পদ পূরণ : (১) নির্বাহী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের কোনও পদ শূন্য হলে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই শূন্য পদ পূরণ করা হবে।

ধারা ২১ :

অনাস্থা পদ্ধতি : নির্বাহী পরিষদের কোনও সদস্যের বিকল্পে প্রস্তাব আনতে হলে তা সাধারণ পরিষদের ১/৩ অংশের স্বাক্ষরে সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতি / সাধারণ

সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ অংশের সিদ্ধান্তে তা কার্যকর হবে।

ধারা ২২ :

সংগঠনের বিলুপ্তি : সংগঠনের বিলুপ্তি সাধন করতে হলে উক্ত কারণে আহত বিশেষ সাধারণ সভায় ২/৩ অংশ সদস্যের সমর্থন গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ২৩ :

সংগঠনের নাম পরিবর্তন : সংগঠনের নামের কোনও পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজনের কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না। সংবিধান একটি পবিত্র দলিল ইহা রক্ষার দায় দায়িত্ব সকল সদস্যের।



যশোহরে'র যশোরেশ্বরী

যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গমস্থলে ঈশ্বরীপুর। একসময় এখানে প্রাচীন যশোহর রাজ্যের রাজধানী ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ রাজেশ্বরী কুলদেবতা যশোরেশ্বরী। কঠি পাথরে তৈরি লোলজিহা ভীষণা এই কালী মূর্তি। এখন থেকে আটশ বছর আগে রাজা লক্ষণ সেন হিমালয়ের পাদদেশের সব জায়গার জরিপ করান। ওই জরিপ কাজের গভিতে গঙ্গার দক্ষিণ পাশের অঞ্চলকে নবদ্বীপ এবং বঙ্গীয় সমতট নামে চিহ্নিত করেন। বঙ্গীয় সমতটের পশ্চিমের সর্বদক্ষিণ কোণে একটি এলাকায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে একান্ন পীঠের এক পীঠ। গড়ে ওঠে ঈশ্বরীপুরের কালীমন্দির। কালের বিবর্তনে এই মন্দির কিছু ধ্বংস হয়ে যায়।

আবার ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছুদিন আগে বারো ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান রাজা প্রতাপাদিত্য স্বাধীন যশোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার রাজধানী ছিল ঈশ্বরীপুরে। রাজা প্রতাপাদিত্য এ-অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসহ পর্তুগীজ ও মগদের সমন্বয়ে আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধী মনোভাবাপন্ন হওয়ার সুবাদে রাজা প্রতাপাদিত্য মুসলিম সৈন্যদের জন্য ট্যাংরা মসজিদ, খ্রীষ্টানদের জন্য গীর্জা তৈরি করান এবং যশোরেশ্বরী মন্দিরের সংস্কার করান।

বর্তমান যশোহর শহর থেকে অনেক দূরে (প্রায় ৮০-৮৫ মাইল) যশোরেশ্বরীর মন্দিরটি অবস্থিত। সনাতন ধর্মের মতে, পৃথিবীর মুক্তির গাঁর সমগ্র সময়কে চারটি যুগে ভাগ করা হয়। সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর ও কলি। ক্ষেত্রে উন্মত্ত মহাদেবের, সতীদেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার ঘটনাটি ঘটে সত্য যুগে। জনশ্রুতি সেইসময় দক্ষ নামে এক রাজা ছিলেন। তার মেয়ের নাম ছিল সতী, যিনি আমাদের কাছে মহামায়া দুর্গা, কালী প্রভৃতি অসংখ্য নামে পরিচিত। মহাদেবের সঙ্গে দেবী সতীর বিয়ে হয়। কিন্তু দক্ষ রাজা তাঁর জামাইকে পছন্দ করতেন না। কারণ, তার জামাই সবসময় শাশানে থাকতেন, গায়ে ছাই-ভস্ম মেখে গাঁজা খেয়ে ভূতপ্রেতদের সঙ্গে সময় কাটাতেন। একবার দেবতাদের সভায় দক্ষ রাজাকে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখান, কিন্তু মহাদেব তাকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাননি। এজন্য দক্ষ রাজা বিশেষভাবে অপমানিত বোধ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি যজ্ঞ শুরু করেন। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর জামাইকে নিমত্তণ জানাননি। নারদের মাধ্যমে এই যজ্ঞের কথা জানতে পেরে সতী সেই যজ্ঞস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর

সতীকে পতি নিন্দা শুনতে হয়। একসময় পতি নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন।

সতীর দেহত্যাগের কথা জানতে পেরে মহাদেব দক্ষযজ্ঞের স্থানে আসেন তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে এবং স্ত্রী সতীকে কাঁধে নিয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য শুরু করেন এবং দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দেন। তারপর ভগবান বিষ্ণু অন্যান্য ভগবানের অনুরোধে তাঁর সুদৰ্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে দেন এবং সেগুলি আমাদের পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় পড়তে থাকে। সেই সুবাদে দেবী সতীর পবিত্র ‘করকমল’ পড়ে যশোহরের এই অঞ্চলে। এখানে ভৈরবের নাম চণ্ড। ভারতের হাসনাবাদ থেকে ঈশ্বরীপুরের দূরত্ব ২৫ মাইল এবং বর্তমান যশোহর শহর থেকে মাত্র ১২৫ কিলোমিটার।

সম্প্রতি কয়েক বছর আগে মূল মন্দিরটির আবার সংস্কার করা হয়েছে। এখানে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে দেবীর পুজো হয়। মূল মন্দিরের একটি দরজা ও ছাঁচ জানলা আছে। মূল মন্দিরটি সংস্কার করা হলেও, মন্দিরে ঢোকার প্রবেশ পথ এবং একসময়ে সাধুদের যে থাকার জায়গা ছিল সেগুলির অনেকাংশই বর্তমানে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

৮৫০



বাংলাদেশে বরিশালের শিকারপুরে উগ্রতারা

অনেকদিন আগে বাংলাদেশের (পূর্বতন পূর্ব বাংলায়) বর্তমান বরিশালের বেশিরভাগ অঞ্চলই জলনিমগ্ন ছিল। কথিত আছে, এ-দেশের পুরুর পাঁচ-সাত হাতের বেশি খোঁড়া সম্ভব হয় না। কারণ, ওই জয়গাটুকু খুড়লেই সেখানে জল ভর্তি হয়ে যায়। চীনদেশের পরিবারাজক হিউয়েন সাঙ (খ্রীঃ অব্দ ৬৩৬ থেকে ৬৪৬ খ্রীঃ অব্দ) ভারত ভ্রমণে এসে জলপথে বাকলা ও কামরূপ যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তখন গৌড়ের পূর্বভাগ সম্পূর্ণ জলমগ্ন থাকায় তিনি বাকলায় যেতে পারেন নি। তবে তিনি কামরূপে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অনেকদিন আগে সুগন্ধা নামে অত্যন্ত খরঝোতা নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত হ'ত। মহাকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অনন্দামঙ্গলে সুগন্ধার নাম পাওয়া যায়। তন্ত্র ও পুরাণ মতে সুগন্ধা নদীর তীরে দেবী (সুনন্দা) সতীর ‘নাসিকা’ পড়েছিল। লোকবিশ্বাস, সেই থেকে নদীটির নাম হয় সুগন্ধা। পীঠমালায় রায়গুণাকর লিখেছেন,

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা !

ত্যস্ক তৈরব তাহে সুনন্দ দেবতা ॥

পীঠ নির্ণয়তন্ত্রের বা তত্ত্বচূড়ামণি মতে, এটি তৃতীয় পীঠস্থান। শিবচরিতে উল্লেখ করা হয়েছে ষষ্ঠ পীঠস্থানে, নাম সুগন্ধা। সেখানে বলা হয়েছে,

সুগন্ধায়াঞ্চনাসিকা

দেব স্ত্র্যনন্দাম্ব সুনন্দা তত্ত্ব দেবতা ।'

কুবিজাতত্ত্বের পীঠবর্ণনায় এই জয়গায় উল্লেখ আছে। বাংলাদেশের বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার অধীন শিকারপুর গ্রামে দেবীর প্রাচীনমঠসহ পায়াগমুর্তি এবং পোনাবালিয়ার উপকঠে শ্যামরাইল পল্লীতে পাষাণ শিবলিঙ্গ আছে। সুগন্ধা নদী সম্বন্ধে সেখানে একটি প্রচলিত প্রবাদ শোনা যায়। একবার শ্রীমৎ ব্ৰেলঙ্ঘস্বামী তাঁৰ শিষ্যের বাসস্থান সম্পর্কে জনতে চাওয়ায় তিনি তাঁৰ গ্রামের নাম বলেন। তখন যোগীপুরুষ তা চিনতে না পারায় শিষ্য বললেন গ্রামের নাম ‘সোন্দার কুল’। তখন শ্রীমৎ ব্ৰেলঙ্ঘস্বামী বলেছিলেন, সুগন্ধা কি এই সময়ের মধ্যেই সুপু হয়েছে। একই সঙ্গে স্বামীজী তাঁৰ শিষ্যকে পোনাবালিয়ার শিবলিঙ্গ এবং শিকারপুরের দেবীমূর্তির কথাও জিজ্ঞেস করেছিলেন।

এই এলাকার পূর্বপ্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হওয়া মেঘনা নদী বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছে। এই নদীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি পৌরাণিক কাহিনী শোনা যায়। নমুচি নামে এক দৈত্য তপোবনে বলীয়ান হয়ে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা কোনমতে তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারায়, ইন্দ্র নমুচির সঙ্গে বস্তুত্ব স্থাপন করেন। এইভাবে অনেকদিন কেটে যায়। নমুচি ইন্দ্রের সঙ্গে পূর্বশক্তা ভুলে গিয়ে তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে ইন্দ্র নমুচির শিরক্ষেষ্ট করা মাত্র, সেই কাটা মুণ্ডু ইন্দ্রের দিকে ধেয়ে আসে। ইন্দ্র-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবসহ বিভিন্ন দেবতার শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু কেউ-ই সেই ছিন্ন মুণ্ডের করাল গ্রাস থেকে তাঁকে রক্ষা করতে সাহসী হলেন না। অবশ্যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবৰ্ষি নারদের পরামর্শে সরস্বতী নদীতে স্নান করলেন। ছিন্ন মুণ্ডু ও সেই মুহূর্তে সেখানে পড়ে গেল। তখনকার মত সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেও বিশ্বাসঘাতকতার পাপ দেবরাজকে সবসময় দন্ত করতে লাগল। শেষে পিতামহ, ব্রহ্মা, ইন্দ্রকে গঙ্গাস্নান করতে বললেন। দেবরাজ গঙ্গোত্রীর কাছে পৌঁছানোমাত্র গঙ্গা সেখান থেকে অন্তর্হিতা হলেন। তখন ইন্দ্র গঙ্গার দর্শন পাবার আশায় তপস্যা শুরু করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা দর্শন দিয়ে বললেন, ‘হে ইন্দ্র, তুমি মেঘরূপে ধরাতলে গমনপূর্বক সমুদ্রসহ মিলিত হইয়া আমার স্পর্শ লাভ করিলে, এই মিত্রদ্রোহী মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। ইন্দ্র দেবীর জ্যোতিশে জলরূপ ধারণ করিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে প্রবেশ করিলেন।’ শোনা যায়, মেঘনা নদীর তীরে বসবাসকারী কোনও সংস্কৃতজ্ঞ পঞ্চিত ব্যক্তি তুলটের পাতায় এ ধরনের একটি কাহিনী লিখে রেখেছিলেন। পরে এটি একটি পৌরাণিক গল্পে পরিগত হয়েছে। পোনাবালিয়া গ্রামের উপকণ্ঠে শ্যামরাইলের শিববাড়ি এক প্রসিদ্ধ জায়গা হিসাবে সুনীর্ধকাল ধরে চিহ্নিত হয়ে আছে। এখানকার শিবলিঙ্গ ‘ত্র্যম্বকেশ্বর শিব’ নামে প্রসিদ্ধ। একসময় এই জায়গার পাশ দিয়ে সুগন্ধা নদী বয়ে যেত। এই নদীর অপর পারে শিকারপুরে গ্রামে এই শিবের শক্তি উঁচুতারা (সুনন্দা) অধিষ্ঠিতা রয়েছেন। এই ত্র্যম্বকেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করে একটি প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। একসময়ে ওই জায়গাটি ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। অসংখ্য হিংস্র পশু তখন সেখানে বাস করত। কাছের লোকালয়ে কিছু তথাকথিত নীচু জাতির মানুষ বসবাস করত। রাখালরা দিনের বেলায় গাভীদের জঙ্গলের কাছের জমিতে চরালেও অপরাহ্নে দোহনের সময় দুধ পাওয়া যেত না। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পরে গরুর মালিকেরা ভাবলেন রাখালরাই সব দুধ খেয়ে নেয় অথবা অন্য কোথাও তা বিক্রি করে দেয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে একদিন দেখা গেল, কয়েকটি গাভী জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করছে। রাখালেরা তাদের পিছন পিছন গিয়ে দেখলেন, একটি বড় বেলগাছের চারদিকে গাভীগুলি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ও তাদের স্তন থেকে অজস্র ধারায় দুধ সেখানে গিয়ে পড়ছে। রাখালেরা আরও ভালভাবে দেখার পর বুঝতে পারল, কয়েকটি ছোট গাছে ঢাকা বল্লীকের ওপর সেই দুধ গিয়ে পড়ছে। কেন এরকম হচ্ছে, এই কৌতুহলে রাখালেরা

ওই বন্মীকের চারদিকে পড়ে থাকা গাছের পাতা ও শাখাপ্রশাখা সাজিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাখালেরা কিছুদূরে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। হঠাৎ সেই প্রজুলিত আগুন থেকে একটি ছোটখাটি অপরূপ সুন্দরী কৃষ্ণবর্ণ নারী বেরিয়ে এসে কাছের শেওলা ঢাকা পুরুরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। রাতে ওই এলাকার ভূস্বামী রামভদ্র রায় স্বপ্নে দেখলেন, শুভ্রকণ্ঠি, জটাজুট ও ত্রিশূলধারী জনেক যোগীপুরুষ বলছে যে, তিনি শ্যামরাইলের জঙ্গলে বন্মীকের মধ্যে থাকেন। রাখালেরা ওই জঙ্গলে আগুন জ্বালানোয় জায়গায় জায়গায় তাঁর অঙ্গ ফেটে গেছে। তিনি যেন তাঁকে উদ্ধার করেন।

রামভদ্র রায়ের ঘূম ভেঙে গেল। পরেরদিন সকালে পরিচিত সবাইকে এই স্বপ্নের কথা জানিয়ে ওই জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর অনুগতেরা সেই বন্মীক খোঁড়ার সময় একসময় শক্ত কোনও বস্তুর ওপর আঘাত করার শব্দ শোনা গেল। তখন সবাই মিলে বাকী মাটি সরানোর পরে দেখা গেল, সেখানে একটি শিবলিঙ্গমূর্তি রয়েছে। এরপর সকলে মিলে ওই লিঙ্গকে সরানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও তা একচুলও নড়ানো সত্ত্ব হল না। সেদিন রাতে আবার স্বপ্নাদেশ হল, এই লিঙ্গ পাহাড়ের মত অচল। কোনভাবেই একে সরানো সত্ত্ব নয়। তাই ওই জায়গাতেই মন্দির তৈরি করে পুজোর ব্যবস্থা করা হোক। তবে শিবলিঙ্গের মাথায় যেন কোনও আবরণ না থাকে।

দেবাদিদেবের আদেশে কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে একটি মন্দির তৈরি করা হল। কিন্তু শিবলিঙ্গের মাথায় কোনও আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হয় নি। পরবর্তী সময়ে শিবপ্রসাদ রায়ের মেয়ে চাঁদমণি দেবী ত্যাগকেশ্বরের জন্ম একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করান।

শিকারপুর গ্রামের দেবী মূর্তি সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে। পঞ্চানন চক্ৰবৰ্তী নামে একজন ধার্মিক ব্রাহ্মণ রাতে স্বপ্ন দেখলেন, ভগবতী কালিকা দেবী সামনে এসে উপস্থিত হয়ে সুগন্ধা নদীর গর্ভ থেকে তার পায়াগ মূর্তি উদ্ধার ও স্থাপন করে পূজ্যর্চনা করার আদেশ দিচ্ছেন। সকাল হলে নদীর গর্ভে নেমে প্রথমবার কালোপাথরে তৈরি বৃষভারুচি মহাদেবের মূর্তি পেলেন। সেই মূর্তি স্থাপন করে তিনি পুজো করতে শুরু করলেন। প্রবাদ আছে, বাকলার তৎকালীন রাজা এই বৃত্তান্ত শুনে মহা সমারোহে দেবীর পুজো করলেন এবং দেবীর সেবার জন্য ‘তারাবৃত্তি’ নামে দেবোত্তর সম্পত্তি দান করে ইট দিয়ে তৈরি একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দিলেন। এই মন্দিরটি এখন ভগ্নপ্রায়। কিছুদিন আগে কিছু দুষ্কৃতি দেবীমূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। সেইসময় থেকে ঘটের ওপর দেবীর পুজো হয়। তবে শিবমূর্তিটির কোনও ক্ষতি হয় নি। তারও নিত্যপুজো করা হয়। জায়গাটি ‘তারাবাড়ি’ নামে খ্যাত। বরিশালের সোন্ধ নদীর ধারে দেবী সুনন্দার এই মূর্তি অবস্থিত। মূর্তির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল, দেবী-মূর্তি শবের ওপর দণ্ডয়মান। তাঁর চার হাতে রয়েছে খেটক, খঙ্গ, নীলপদ্ম এবং খুলি (নরমুণ্ডের কক্ষাল)। মাথার উপর ছোট আকৃতির কার্তিক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও গণপতি। অনেকের মতে, মূর্তি পরিকল্পনায় বৌদ্ধ মহাযানী ও বজ্রযানী প্রভাব রয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় ভূস্বামী রামভদ্র রায়কে

স্বয়ং ঈশ্বর স্বপ্নাদেশ দিয়ে বন্ধীকে ঢাকা থাকা শিবলিঙ্গের প্রকাশ ঘটান। এই ভূস্মামী জমিদারির উন্নতিকল্পে প্রচুর পরিশ্রম করতেন। সেইসময় ওই জায়গার জনসংখ্যা খুবই কম ছিল। জায়গাটির অধিকাংশই গভীর অরণ্যে আবৃত ছিল। তাই তিনি ও তাঁর ছেলে শ্রীকৃষ্ণ রায় বাঁশবেড়ে, হরিষণা প্রভৃতি জায়গা থেকে অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদের সেখানে নিয়ে এসে স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। তাঁর সময়ে চৌমট্টি তালুকের সৃষ্টি হয়। রামভদ্র রায় ও তাঁর বংশধরেরা ত্র্যম্বকেশ্বর তৈরবের নিত্য সেবার জন্য যে সব দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন তা আজও বর্তমান আছে।

উজিরপুরের দক্ষিণ দিকে একটি ছোট গ্রাম বারপাইকার পশ্চিতসমাজের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এখানে এসেছিলেন দাশনিক পশ্চিত শুকদেব তর্কালঙ্কার। স্থানীয় ভূস্মামী চৌধুরিবা তাঁকে সেখানে থাকার জন্য বাড়ি ও জমি দেন। সেইসময় তারা স্থানীয় মানুষজনের কুলগুরু হিসাবে পরিচিত হন। আজও সেখানকার গুঠিয়া, ঝুঁটিয়া, নাগপাড়া গ্রামে তাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস করেন।

শুকদেব তর্কালঙ্কারের ভাই আনন্দিরাম সম্পর্কে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়। প্রথম জীবনে আনন্দিরামকে আঞ্চলীয় স্বজনেরা খুবই অবজ্ঞা করতেন। এমনকি একদিন তাঁর স্ত্রী খাবার থালায় অন্যান্য খাবারের সঙ্গে এককুঠো ছাই রেখে দেন। এতটাই অবজ্ঞা তিনি স্ত্রীর কাছে থেকে পেয়েছিলেন। একদিন ক্ষেত্রে দুঃখের আনন্দিরাম ঘর ছেড়ে চলে যান। অনেকদিন তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে নবদ্বীপে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলো আনন্দিরামের বাড়ির ভূত্ত দেখলেন জনৈকা সুন্দরী মহিলা ওই বাড়ির সন্ধ্যাপ্রদীপ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আনন্দিরাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির ভূত্য ‘যশা’ তাঁকে ওই জনৈকা সুন্দরী মহিলার আলো জ্বালানোর ঘটনা বলার কয়েক মুহূর্ত পরে আনন্দিরাম ‘মা’, ‘মা’ বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ওই অচৈতন্য অবস্থায় আনন্দিরামকে স্বপ্নে আদেশ দিয়ে বলা হয়, ‘বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তোমার জ্ঞানের শূরণ হইয়াছে। তোমাদের ঠাকুরের ঘরের মাটির নীচে একখানি তালপাতার গুহ্বা আছে, তাহা দ্বারাই তোমার সৌভাগ্য উদয় হইবে এবং তোমার বংশের উপর আমার অনুগ্রহ থাকিবে।’

এরপরে আনন্দিরাম ঘরে ফিরে আসেন। কালক্রমে এই বৎশে জন্মগ্রহণ করেন অবিতীয় পশ্চিত তারিণীচরণ শিরোমণি। একসময় তাঁর পাণিত্তের খ্যাতি বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একসময় বাকলার পীঠস্থান শিকারপুরে সংস্কৃতচর্চার খ্যাতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। এই জায়গায় অতীতে অনেক সন্ন্যাসীরাও আসতেন। বরিশাল শহর থেকে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে শিকারপুর। এই গ্রামে ভট্টাচার্য, কুণ্ডামী, গোত্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদিক ও বৈদ্য শ্রেণীর মানুষেরা বসবাস করেন। কয়েকটি সরোবর ছাড়াও এখানে কয়েকটি ভাঙা সমাধি মন্দির, একটি ভাঙা প্রাসাদ, কিছু বাসোপযোগী দালান বিগত শতাব্দীর চিহ্ন বহন করে চলেছে। এখানে বনের মধ্যে থেকে প্রাপ্ত ‘উগ্রতারা মূর্তি’ তৈরির কৌশল

খুবই সুন্দর। ইঁটের তৈরি মন্দিরে দেবীর অধিষ্ঠান। বছরের বিভিন্ন সময়, বিশেষত শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে অনেক জনসমাগম হয়। মেলা বসে তিনদিন।

মন্দিরের বর্তমান ট্রাস্ট কমিটির সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল জানিয়েছে, শিব চতুর্দশীর সময় দেশ-বিদেশ থেকে পৃণ্যার্থী বরিশাল জেলার শিকারপুর-তারাবাড়ি নাশিকা পীঠস্থানে সমবেত হন। দুর্গাপুজোর সময়েও বিশেষ পূর্জন্তার আয়োজন করা হয়। ওই সময় প্রতিবছর স্থানীয় সংসদ সদস্য ও সংরক্ষারের বিশিষ্ট মানুষজন উপস্থিত থাকেন। অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে শান্তি যজ্ঞ করা হয়। সেইসময় বাংলাদেশের সীতাকুণ্ড আশ্রমের সন্ন্যাসীসহ অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় আলোচনা হয়। প্রতিবছর বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে মন্দিরের ট্রাস্ট কমিটির পক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ধর্মীয় গান ও বিচ্ছিন্নান্তনের আয়োজন করে।

বছরের প্রতিদিন দুপূরবেলা মায়ের মন্দিরে ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি অমাবস্যার দিন সাড়ৰবেলা মায়ের পুজো হয়। দোল পূর্ণিমার দিন দোলযাত্রার যাবতীয় আয়োজন করা হয়।

‘শুভ-নিশ্চুল বধ’ নামে সংস্কৃত কাব্যের প্রণেতা কালীকান্ত শিরোমণি, প্রখ্যাত পণ্ডিত রামধন ন্যায়লঙ্ঘকার এবং নিদাংবিদ রামচন্দ্র গুপ্ত এই গ্রামের অধিবাসী। শিকারপুরের হাট খুবই জমজমাট। এই গ্রামে যাওয়ার জন্য যেমন বাস চলাচলের রাস্তা আছে তেমনই লক্ষ ও নৌকাতেও যাওয়া যায়। শিবরাত্রির মেলা ‘ছাড়াও’ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো থেকে শ্যামাপুজোর সময় পর্যন্ত এখনও অনেক ধর্মপ্রাণ কৌতুহলী মানুষ এখানে পুজো দেওয়ার উদ্দেশ্যে যান।

একসময় এই জেলাকে বলা হত, ‘বাংলার শস্যগার’। এখানকার বালাম চালের খ্যাতি সর্বত্র ছিল। অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র এখান থেকে নুন সরবরাহ করা হত। মুঘল আমলে একাধিক ‘নিমক মহলের’ উল্লেখ আছে। সব থেকে বেশি নুন পাওয়া যেত শাহাবাজপুর, মনপুরা, সেলিমাবাদ পরগণা এবং লোহলিয়ায়। এখানে উৎকৃষ্ট মানের তাঁতের কাপড় এবং নৌকা তৈরি হত। এখানকার শীতলপাটি ও সুপরিচিত।

চট্টগ্রামে দেবী ভবানী

মহামুনি কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাসকাশীতে যখন ছিলেন তখন সেখানকার বৈদিক ঋষিরা ব্যাসদেবের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে তাঁকে প্রচণ্ড উপহাস করেন এবং কাশী থেকে চলে যেতে বলেন। ক্ষুরু ব্যাসদেব কাশীর কাছেই অন্যত্র গিয়ে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন এবং তপোবলে নতুন কাশী সৃষ্টি করার সম্ভাল করেন। এদিকে কাশীর মাহাত্ম্য নষ্ট হবে আশঙ্কা করে স্বয়ং অন্নপূর্ণা ব্যাসদেবকে ছলনা করেন। তখন ব্যাসদেব মহাদেবের শরণ নিলে তিনি বলেন, পৃথিবীর অগ্নিকোণে পরম সুন্দর ও অতি গোপনীয় চন্দ্রশেখর তীর্থ আছে। কলিকালে আমি উমার সঙ্গে ওই চন্দ্রশেখর চট্টলে বাস করব। প্রত্যেকে ওই তীর্থকে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে মনে করবে। সেখানে পরম জ্ঞানী ব্রহ্মবাদী দেবগণ, ব্রহ্মা এবং সিদ্ধ মুনি, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ ভৈরবগণের সঙ্গে অহোরাত্র তপস্যা করে জ্ঞান অর্জন করছেন। এর দক্ষিণে তীর্থরাজ লবণাক্ত সমুদ্রের সঙ্গলাভ করার জন্য ভাগীরথী গঙ্গা স্বয়ং উপস্থিত। হিমালয়ের মত চন্দ্রশেখরও আমার আনন্দদায়ক। এইভাবে নানান উপদেশ দেবার পর মহাদেব দিব্যমূর্তি ধারণ করে ব্যাসদেবকে বললেন, আমি এইরূপে ওই তীর্থে উমার সঙ্গে থাকব। তুমি সেখানে আমার প্রতিনিধিস্থরূপ স্বয়ন্ত্রলিঙ্গ দেখতে পাবে। ওখানে গিয়ে তপস্যা করলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

তারপর বেদব্যাস চন্দ্রশেখরে গিয়ে তপস্যা শুরু করেন। অনেক দিন পরে তাঁর তপস্যায় সম্প্রস্ত হয়ে মহাদেব বললেন, তুমি বর ধ্যান কর। ব্যাসদেব বললেন, প্রভু, আপনি অনেক আগে কাশীতে আমাকে যে রূপে দর্শন দিয়েছিলেন সেই রূপে আপনি এখানে অবস্থান করুন। দেবাদিদেব বললেন, তাঁই হবে। তা ছাড়া পৃথিবীতে গয়া ইত্যাদি যে সব তীর্থ আছে তাদের সবাইকে এই সমুদ্রের কাছে চন্দ্রশেখর পাহাড়ে স্থাপিত করে সেই সব তীর্থকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থাধিষ্ঠিত হয়ে তুমি ত্রিলোক পরিত্রাণ কর। তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

কথা শেষ করে মহাদেব তাঁর সামনের জমিতে ত্রিশূল নিষ্কেপ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই জমি জলপূর্ণ কুণ্ডে পরিণত হল। আর সেই কুণ্ডের ভিতর থেকে আগনের শিখা বেরোতে লাগল। ব্যাসদেব সম্প্রস্ত হয়ে কুণ্ডের পশ্চিম দিকে পাষাণদেহ ধারণ করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ একান্নটি সতীপীঠের অন্যতম। ব্যাসকুণ্ডের অগ্নিকোণে

নদীর তীর দিয়ে সামান্য পথ গেলে দেখা যাবে, মেরু পর্বতসঙ্গ নামে এক মহা তীর্থক্ষেত্র।
দক্ষযজ্ঞের পর বিশুগ্চক্রে কর্তিত হয়ে সতীর দক্ষিণ বাহু এখানে পড়েছিল।

বারাহী তন্ত্রে উল্লেখ আছে,

‘চট্টলে দক্ষিণো বাহু ভৈরবতশ্চ স্তু শেখরঃ ।

তস্যেব কটিদেশস্থো বিরূপাক্ষ মহেশ্বরঃ ॥

রূদ্রলোকং সমাপ্তোতি যন্ত্রারোহয়েন্নবঃ ।

বিশ্঵রূপো মহাদেবো ডমু প্রতিমাশিলা ॥

এখানে ভৈরবের নাম চন্দ্রশেখর। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তলায় বিরূপাক্ষ মহেশ্বর আছেন।
কথিত আছে, এখানে উঠতে পারলে মানুষ রূদ্রলোক পায়। ওই জ্যায়গায় বেলগাছের
আকারে মহাদেব অধিষ্ঠান করেন বলে মানুষের বিশ্বাস। সেখানে ডমুর মত আকৃতি
বিশিষ্ট অনেক শিলা পড়ে আছে। দেবীর নাম ভবানী। তিনি কালীমূর্তিতে এখানে
বিরাজমান। শবারূচা, মুণ্ডমালাধারিণী, শ্যামবর্ণী, দিগম্বরী, চতুর্ভুজ। দেবীর গলায় রয়েছে
নাগ যজ্ঞেপবীত, মাথায় অর্ধচন্দ, দুটি বাম হাতে রয়েছে খড়া ও মুণ্ড এবং অন্য দুটি
হাতে রয়েছে বর ও অভয়মুদ্রা। ওই জ্যায়গায় একই সঙ্গে কৃষ্ণ, জগন্নাথ, রাধিকা, সীতা,
রামচন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা থাকেন বলে ভক্ত মানুষজন বিশ্বাস করেন।

এখানেই রয়েছে সীতাকুণ্ড। কারও কারও মতে, সতীর দক্ষিণ বাহু এখানে পড়েছিল।
তাদের মতে, এই কুণ্ডের নাম ‘সতীকুণ্ড’। উচ্চারণের বাবে ব্যবহারে নামটি ‘সীতাকুণ্ড’-
এ পরিণত হয়েছে। আবার কারও কারও মতে, কোনও সময় সীতা এখানে এসেছিলেন
বলে কুণ্ডের নাম হয়েছে ‘সীতাকুণ্ড’। অমনেন্তু বিশ্বাস তাঁর ‘চট্টল মহাতীর্থ প্রাচীন ইতিবৃত্ত’
বইতে দেবীপুরাণ থেকে উদ্ধৃত করে সীতাকুণ্ড নামের যথার্থতা তুলে ধরেছেন।

বিশ্বেতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে।

চন্দ্রশেখর মারহ্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে ॥

অর্থাৎ কলিযুগে আমি চন্দ্রশেখরে অবস্থান করব, চন্দ্রশেখরে কেউ আরোহণ (দর্শন)
করলে তার আর পুনর্জন্ম হবে না।

দেবীপুরাণ, শ্রীবারাহীতন্ত্র, তত্ত্বচূড়ামণি, জয়দেব পদ্মাবতী, কবি নবীন চন্দ্র সেনের ‘রঞ্জ
মতী’ কাব্য ও অন্যান্য সৃত্রে জানা যায়, এই মাতৃতীর্থের সৃষ্টি হয় সেই প্রাগৈতিহাসিক
সময়ে। সেইসময় রামচন্দ্র ভাই লক্ষণ ও স্ত্রী সীতাকে নিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে এসেছিলেন
মহাদেবের দর্শন পাওয়ার জন্য। সীতাদেবীর সেখানে আসার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল সীতাকুণ্ড।
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবীর এখানে আসার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়,
দেবীপুরাণের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা ঋষি সশ্মেলনে সৃতমুনির বর্ণনার
মাধ্যমে। সেই বর্ণনায় জানা যায়, রামচন্দ্র অজ্ঞাত বনবাসের সময় ঘূরতে ঘূরতে শরভঙ্গ
মুনির আশ্রমে এলে মুনির নির্দেশে পূর্বোক্ত পূরীতে গিয়ে দেখলেন, জনেক পূজনীয় মুনি
ওই তীর্থে অবস্থান করছেন। পরম বিভূতি নিয়ে রামচন্দ্র মুনির কাছে জানতে চাইলেন।

মুনি সীতাদেবীকে দেখিয়ে বললেন, ইনি মহাদেবের আরাধ্য মুক্তকেশী। এই দেবী আপনার অনুগামিনী হওয়ায় আপনি বিশেষভাবে ভাগ্যশালী। সমুদ্রোত্তর তীরে ভাখ্যতাব্য সমষ্টিত জায়গায় এই দেবীর নামাঙ্কিত একটি কুণ্ড আছে যা ত্রিভুবনের সবাইকে পবিত্র করবে। রামচন্দ্র, ইনি যোগনিদ্রা, আপনার চাইতেও এই দেবীর কাজ করবার ক্ষমতা অনেক বেশি। বিধাতা আপনাকে অভিমান প্রদানের জন্য এই দেবীকে পাঠিয়েছেন। এই ক্ষেত্র থেকে অগ্নিকোণে রয়েছে চন্দ্রশেখর পাহাড়। সেখানে ভার্গবদেব আছেন যার নামে একটি কুণ্ড আছে। ওই পাহাড়ের পশ্চিমদিকে রয়েছে স্বয়ন্ত্রনাথ। তার উত্তরে রয়েছে নাভিগঙ্গা, পশ্চিমে ফন্দুনদী, পূর্বে জ্যোতির্ময় ও বাড়বানল।

পরেরদিন সকালে রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবী পরমুষ্টি মুনির সঙ্গে চন্দ্রশেখরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সীতাকুণ্ডে পৌঁছেই মুনিকুণ্ডে ঢুকে সূর্যের দিকে মুখ করে ত্যক্ষর মন্ত্র জপ করতে শুরু করেন। সীতাদেবী রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করে কুণ্ডের জলে ডুব দিয়ে শ্যামবর্ণা অষ্টভূজা হলেন। অষ্টভূজার অধরোষ্ঠ রক্তবর্ণ, তিনটি চোখ, শরীর কৃশ এবং দীর্ঘ, ধৰ্জ-চামর বেষ্টিত। রামচন্দ্র সেখানে কুণ্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা সীতাদেবীকে দেখতে দেখতে ভাবলেন, এই কুণ্ড আমার প্রাণ হরণ করেছে। পরমেষ্ঠি মুনি রামচন্দ্রকে বললেন, হাজার-অযুত বছর এই কুণ্ড গুপ্ত ছিল, কলিকালে জীব উদ্ধাৰার্থে প্রকাশ পাবে। যে কেউ ভক্তিতে এই কুণ্ডজল স্পর্শ বা জলপান করে সে কুণ্ডনানের ফল পেয়ে পুনর্জন্ম নেবে না। মুনির কাছে কুণ্ডের মহিমা শুনে রামচন্দ্রপাহাড়ের শিখরে উঠে এলেন। সেখানে শিবলিঙ্গ দর্শন করে নুনের সাগরে স্থান করেন। এরপর রামচন্দ্র, লক্ষণ ও সীতাদেবী যাত্রা করেন গোদাবরীর উদ্দেশ্যে।

দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লিখেছিলেন ব্যাসদেব। ঐতিহাসিকদের মতে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল ~~শ্রীষ্টি~~ পূর্ব ৯৫০ মতান্তরে ৩২০০-তে। ব্যাসদেব পরাশর মুনির ওরসে মৎস্যগন্ধার সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। মহাদেব ব্যাসদেবকে বলেছিলেন, আমি দেবতাদের সঙ্গে চন্দ্রশেখরে সবসময়েই বাস করতাম। সেখানে আমার মাথা জটাভারে বেষ্টিত, তার ওপর রয়েছে বিরাজিত ফণী, মাথায় শব শিরোভূষণ, কপালে অর্ধচন্দ্র। আমার মূর্তির বক্ষঃস্থল ভূজঙ্গবেষ্টিত, কটিতটে ব্যাঘচর্ম, এক হাতে ডমকু অন্য হাতে ত্রিশূল, গলায় বিলম্বিত ব্রহ্মসূত্র, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে জঙ্গলে আবৃত সীতাকুণ্ডের কাছে জনৈক রজক বসবাস করত। তার একপাল গাভী ছিল। একসময় লক্ষ্য করা গেল, একটি গাভী পাহাড়ের নীচের দিকে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে আসে গাভীদের দলে। একদিন অনুসরণ করার পর দেখা গেল, গাভীটি পাহাড়ের ওপর গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত একটি বিরাট শীলার ওপর দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গভীর স্তুন থেকে দুধ পড়ছে এবং ওই দুধে শিলাখণ্ডটি ভিজে যাচ্ছে। ওই রজক একদিন বিশ্মিত হয়ে দেখল সেখানে রয়েছে অষ্টভূজা মূর্তির সঙ্গে একটি শিবলিঙ্গ। রজকের আহানে কাছের গ্রাম

থেকে এক ব্রাহ্মণ নিয়মিতভাবে সেখানে পুজো শুরু করে। সেই থেকে ওই ব্রাহ্মণের বৎসরেরা ওই তীর্থস্থানে পুজো করার অধিকারী হন।

তখন এই অঞ্চলটি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। একসময় এই সংবাদ পৌছায় ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিকের কাছে। তিনি ওই স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ রাজধানী আগরতলায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হল না। রাত্রিবেলা দেবাদিদেব ধন্যমানিককে স্বপ্ন দিয়ে বলেন, আমায় স্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়। আমি স্বতোঙ্গু। তোমার আগ্রহ থাকলে দেবীকে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা কর! কিন্তু রাত ভোর হবার আগেই তা করতে হবে। দেবীমূর্তিকে রাজধানী আগরতলায় নিয়ে যাবার জন্য সারিবদ্ধভাবে মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পথের মধ্যে এক জায়গায় ভোর হয়ে গেল। সেখানে ভোরের সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি অচলা হয়ে গেলেন। বাধ্য হয়েই সেখানেই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। জায়গাটির নাম দেওয়া হল উদয়পুর। ত্রিপুরার ইতিহাস অনুযায়ী জানা যায়, উদয়পুরে ‘ত্রিপুরেশ্বরী’র বর্তমান মন্দিরটি তৈরি হয় ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে। ‘রাজমালা’ গ্রন্থ অনুসারে ৬১০ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব গৌড়ের রাজা আদিশূরের বৎসরে বিশ্বস্তর শূর জলযানে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নাবিকদের ভুলে জলযান ভুল করে নোয়াখালির ভুলুয়ায় পৌঁছে যায়। গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামী অনেকদিন এই তীর্থে বাস করেন। তখন বঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। জয়দেব তীর্থভ্রমণ শেষে লক্ষ্মণ সেনের এই তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন। জয়দেবের ‘পদ্মাবতী’ বইয়ের বর্ণনায় আছে—

এইরূপে আছে কবি বঙ্গবাসী সনে
চট্টগ্রাম দেখিতে বাস না হইল মনে
রাজার মিকটে তাহা কৈল আবেদন
আদেশ করিলা রাজা করিতে গমন।

অবশেষে চন্দ্রনাথে করিল গমন
নিকটের দেবদেবী করিল দর্শন
ব্যাসকুণ সন্নিকটে আশ্রম করিল
কাষ্ঠ আনি অশ্বি জ্বালি আনন্দে রাহিল।

শার্দুল ভল্লুক সর্প আদি জন্তুগণ
চারিদিকে বাস করে মৃগ অগণন
বৈরভাব শূন্য চন্দ্রনাথের আজ্ঞায়
মনুষ্য দেখিলে স্থান ছাড়িয়া পালায়।

কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ) রঙ্গমতী (১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্যে সীতাকুণ্ড তীর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। তারই কিছু অংশ নীচে দেওয়া হল :—

পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড ! শোভিছে উত্তরে
 কনক চম্পকারণ্য ! সজ্জিছে দক্ষিণে
 হস্তারী বাড়বানল মানব বিশ্বয়
 পশ্চিমে নিরগিকুণ্ড, ব্যাস সরোবর
 বহিতেছে নিরস্তন পূর্বে কলে কল
 কলকষ্টা মন্দাকিনী স্বর প্রবাহিনী।
 পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড অঙ্গরা প্রদেশ
 জ্যোতির্ময় মনোহর ! পরিপূর্ণ মরি
 প্রকৃতির ইন্দ্রজালে, জলেতে অনল
 অনল পাষাণে.....

কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে সীতাকুণ্ড মেলা অর্থাৎ চন্দ্রনাথ তীর্থের
 ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

কম্পানীর দক্ষিণতীরে এক ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী জায়গায় তারা নদীর বাম দিকে সুন্দরী
 রাজরাজেশ্বরী, পূর্বদিকে ভুবনেশ্বরী, ঈশানে ভৈরবী, উত্তর দিকে ছিমুমস্তা ও জলস্থিতা
 ধূমাবতী রয়েছেন। পশ্চিমদিকে আছে বগলা, নৈঝত কোণে সর্বমঙ্গলা, দক্ষিণ দিকে তিন
 কোটি শক্তি সহ কমলা আছেন। সেখানে মৃত্যুঞ্জয়, পঞ্চানন প্রভৃতি অনেক শিবের দর্শন
 পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামের দেবী ভবানী সম্পর্কে শাস্ত্রে বলে হয়েছে—

চট্টলে দক্ষবাস্তুমে ভৈরবচন্দ্র শেখরঃ।

ব্যক্তিমাপা ভগবতী ভবানী যত্র দেবতা।

(বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥)

মহাপীঠ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড স্টেশনের কাছে চন্দ্রনাথ পাহাড়। সেখানে ভবানী
 মন্দিরের কাছেই আছে স্বয়ন্ত্র নাথ শিবলিঙ্গ, আর এক পাহাড়ের ওপরে রয়েছে বিরুপাক্ষ
 শিবলিঙ্গ ও সর্বোচ্চ শিখরে আছে ভৈরব চন্দ্রশেখর শিবলিঙ্গ। সমুদ্র থেকে শৈলশৃঙ্গ
 চন্দ্রনাথ পায় ১২০০ ফুট উঁচুতে।

ইতিহাস বিশ্বত সীতাকুণ্ড এখন প্রায় লুপ্ত প্রায়। শুধু পাহাড়ের গুহায় এক নির্বারণীর
 পাশে মন্দিরটি কোনমতে দাঁড়িয়ে, কুণ্ডটি যে একসময় এখানে ছিল, সে কথাই জানিয়ে
 দিচ্ছে।

এখানে আছে ব্যাসকুণ্ড। যদিও তা ছোট সরোবরে পরিণত হয়েছে। তীর্থ্যাত্রীরা এখানে
 স্নান ও তর্পণ করেন। পশ্চিম পাড়ে ব্যাসদেবের পাষাণমূর্তি হয়ে ধ্যানমগ্ন রয়েছেন। কুণ্ডের
 উত্তর পশ্চিম কোণে ‘বটবৃক্ষ’ যুগ যুগ ধরে এখানে রয়েছে। ব্যাসকুণ্ডের পাড়ে দ্বাপর
 যুগে ভগবান ব্যাসদেব মুনিদের নিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কুণ্ডের কাছেই রয়েছে
 পীঠস্থান ভবানী মন্দির ও কালীবাড়ি।

ব্যাসকুণি থেকে পূর্বদিকে পাহাড়ে কিছুটা উঠলেই ডানদিকে ভুগভ থেকে ওঠ। শিবের নেত্রানন্দরূপী জ্যোতির্ময় নীলশিখা দেখা যায়। দিবারাত্রি এই শিখা জুলছে। কাঠ দিলেই জলে ওঠে। সাধারণ তীর্থাতীরা এখানে যি, বেলপাতা দিয়ে হোম করেন। জায়গাটি পুরোপুরি পাথর দিয়ে ঘেরা। নীচে কোনও ফুটো দেখা যায় না। এক জায়গা থেকেই আগুনের শিখা উঠতে থাকে। পাশের শিলাখণ্ডে আগুন শিখার কালোধোঁয়া জমে আছে।

স্বয়ন্ত্রনাথ মন্দিরের উত্তরে আছে লবণাক্ত কুণি। এখানে অগ্নিদেব নীল জিভ বাড়িয়ে সর্বদা প্রজ্ঞলিত থাকেন। সকলের ধারণা, এখানে স্নান করলে মন পবিত্র হয়ে যায়। কারও কারও ধারণা, এখানে স্নান করলে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সেরে যায়। লবণাক্তে স্নান তর্পণ করলে সূর্যকুণি অভিষেক করতে হয়। কাছেই উৎস জলের ব্রহ্মকুণি আছে। এর জল সবসময় উষ্ণগরম থাকে ও সমুদ্রের জলের মতো লবণাক্ত। এর কাছেই বাসিকুণি নামে আর একটি কুণি আছে। লবণাক্ত তীর্থের জল উপছে যে জায়গায় পড়ছে তাকেই বলা হয় বাসিকুণি। তবে লবনাক্ত কুণির জল বেশ গরম নয়। এখানে তিল তর্পণ করার বিধি আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাসিকুণি ও লবণাক্ত কুণি ছাড়া এখানকার সব জলাশয়ের জল মিষ্টি।

লবণাক্ত কুণির কাছেই সহস্রধারা তীর্থ নামে পূর্বদিকের পাহাড়ে এক আশ্চর্য জলপ্রপাত আছে। প্রায় দুশো হাত উচু গিরিশূল থেকে বরমার জল প্রাঞ্ছে বেগে নীচে এসে পড়ছে। পাথরে বাধা পেয়ে সহস্রধারায় জল ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে। সেজন্য এই জায়গার নাম সহস্রধারা। এখানে তিন দিক থেকে পাহাড়ের স্রোত এখানে একত্রে মিলিত হচ্ছে। অনেকে এই জায়গাকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গম নামে অভিহিত করেন। কোনও কোনও সময় এখানে জল পড়া বন্ধ হয়ে আয়। তখন চিৎকার করে ‘হর হর, ব্যোম্য ব্যোম্য মহাদেব’ বলে চিৎকার করলেই ওপর থেকে অজস্র জলধারা নেমে আসে।

সীতাকুণি স্টেশনের দক্ষিণের তিন মাইল দূরে বাড়বকুণি স্টেশন। সেখান থেকে মাইল তিনিক পথ উত্তর দিকে গিয়ে আবার পূর্বদিকে এক মাইল দূরে রয়েছে বাড়বকুণি। সামান্য উচুতে একটি মন্দিরের মধ্যে আছে বাড়বানলকুণি। চারকোণা এই কুণিটি দেখতে ডোবার মতো। তবে গভীরতা সম্পর্কে কোনও আন্দাজ করা যায় না। কারও কারও মতে, এই কুণির সঙ্গে পাতালের যোগ আছে। একটি মোটা লোহার চাদর কুণির জলের তিন হাত নীচে ঝোলানো আছে। কুণির পূর্বদিক থেকে একটি আগুনের শিখা জলের মধ্যেই অনবরত দপ দপ করে জুলছে। অথচ কুণির মধ্যে নেমে স্নান করার সময় আগুনের তাপ কিন্তু গায়ে লাগে না। স্নানরত মানুষদের গায়ের ওপর দিয়েই আগুনের শিখা চলে যায়। এখানে স্নান ছাড়াও তর্পণ, হোম, পুজো ও তৈরবদর্শন করতে হয়। ১৯০৭ সালে ময়মনসিংহের জমিদার রাজা যোগেশ কিশোর রায়চৌধুরি সাদা কালো মার্বেল পাথর দিয়ে মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন।

কাছেই রয়েছে অন্নপূর্ণা মন্দির ও কালভৈরব। পথেই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে জালামুখী কালীমূর্তির। এখানে নক্রেশ্বর শিব ধর্মাগ্নিরপে শোভা পান।

বাড়বানলের দক্ষিণে পাহাড়ের নীচে কর্করী নদীর প্রান্তে আছে কুমারীকুণ্ড। মূর্তির উচ্চতা চার হাত। এর জলের ওপরে আগুনের শিখা একবার জুলে ওঠে আবার নিভে যায়।

স্বয়ন্ত্রনাথ মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি স্বচ্ছ জলধারা বয়ে চলেছে। সাধারণ মানুষ একে পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী আখ্যা দিয়েছেন। এই জলেই স্বয়ন্ত্রনাথের পুজো, স্নান ও ভোগ রান্না হয়। স্বয়ন্ত্রনাথ মন্দিরের পূবদিকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মন্দির আছে। এখান থেকে পূবদিকে সামান্য পথ গেলেই দেখা যাবে, মন্থন নদের তীরে গয়াক্ষেত্র নামে একটি পিতৃতীর্থ রয়েছে। এখানে অনেকেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। ১৯০৬ সালে ময়মনসিংহের সঙ্গমের রানী দিনমণি চৌধুরানীর ছেলে হেমেন্তনাথ চৌধুরির তত্ত্বাবধানে এখানে একটি মন্দির তৈরি হয়।

এই গয়াক্ষেত্রের উত্তর দিকে আটধারা বিধৌত ছত্রশীলা পাহাড়ের গুহায় অসংখ্য শিবলিঙ্গ দেখা যায়। তার ভিতর দিয়েই বয়ে যায় মন্দাকিনীর জলধারা। এই জায়গাটির নাম উনকোটি শিব। চারদিক গাছপালায় ভরা। তাই গরমকালেও এখানে শীত শীত করে। উনকোটি শিব সমতল থেকে পনেরো কুড়ি হাত ওপরে রয়েছে। অতীতে নীচে থেকে যাত্রীদের অতি কষ্টে এই শিব দর্শন করতে হত। পুজো করা প্রায় অসম্ভব ছিল। ময়মনসিংহের হেমনগরের জমিদার হেমচন্দ্র চৌধুরির বোন বরদা সুন্দরী দেবী এখানে আটটি লোহার সিঁড়ি তৈরি করে দেন। পরে চট্টগ্রামের কোয়েপাড়া গ্রামের আধিল চন্দ্র বিদ্যারত্ন সেখানে বারোটি পাথরের সিঁড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন।

পাহাড়ের অনেক ওপরে রয়েছে বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের নীচে অনেকটা পথ হাঁটার পর পাতালপুরীর সন্ধান পাওয়া যায়। চারদিক গাছপালা দিয়ে ঘেরা। কথিত আছে, এখানে শিব-দুর্গা গভীর আলাপনে রত থাকেন। এখানে কোনও পাখী ডাকে না, কোনও বন্যজন্তু আওয়াজ করে না। সকলের ধারণা, এখানে কেউ আওয়াজ করলে হরগৌরী আলাপনে ব্যাঘাত ঘটানো হবে। এখানে এক আসনে শিলাখণ্ডের ওপর দেবাদিদেব, মা দুর্গাকে নিয়ে বসে আছেন।

এই মন্দিরের দুটি দরজা অতিক্রম করলেই অষ্টমূর্তি সমন্বিত আদি স্বয়ন্ত্রনাথের অপূর্ব লিঙ্গটির দর্শন পাওয়া যায়।

বিরূপাক্ষ মন্দির থেকে আরও উঁচুতে রয়েছে পীঠভৈরব চন্দ্রনাথ। একসময় এখানে পৌছানো প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। ওপরে ওঠার ভাল পথ ছিল না। চন্দ্রনাথ মন্দিরের পশ্চিমদিকে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগর। এখানে যুগ যুগ ধরে অনেক সাধক তপস্যা করেছেন। পীঠের অধিপতি দেবী ভবনী হলেন চতুর্ভুজা মা কালী। মন্দিরের মধ্যে বেদীর ওপর তিনি অধিষ্ঠিত। ফাল্গুন মাসে শিব চতুর্দশী উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। এছাড়া পৌষ সংক্রান্তি, দোলপূর্ণিমা, শ্রীপঞ্চমী, কার্তিকী পূর্ণিমা, চন্দ্ৰগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের সময় অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ এখানে আসেন।

শোনা যায়, বুদ্ধদেবের শরীরের অংশ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কোনও জায়গায় পুঁতে রাখা আছে। তারই স্মরণে, চৈত্র সংক্রান্তির দিন এখানে বৌদ্ধদের মেলা বসে।

ଆগେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହେଁଛେ ପ୍ରକୃତିର ଅପରାଧ ସୃଷ୍ଟି ସହନ୍ତିରାରାର । ଏହି ଶୋଭାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେଛେ କବି ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ମେନ । ତିନି ଲିଖେଛେ,

ବାରିଛେ ସହନ୍ତିରା ଧାରା ମନୋହରା
ଉଚ୍ଚଭୀମ ଶୃଙ୍ଗ ହତେ ସହନ୍ତ ଧାରାଯ
ମରି ଯେନ ଗିରିମୂଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ
ଆହା କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ! ଆଜି ଚତୁର୍ଦଶୀ
ଆଜି ଶିଳାସନେ ବସି ଶୁଣିତେ ଶୁଣିତେ
କଳକଟେ ହୁଦୁଧବନି, ଭୀମକଟେ ଘୋର
ହର ହର, ବମ୍ ବମ୍, ବିରାମ ସମୟ
ତରଳ ସଲିଲ, ବନ ବିହଙ୍ଗ ସନ୍ଧିତ ।

କୁର୍କରୀ ନଦୀର ଧାରେ କୁମାରୀ କୁଣ୍ଡେର ଅପରାଧ ଦୃଶ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ଗିଯେ ତିନି ଲିଖେଛେ,

କଳୋଲେ କୁମାରୀ କୁଣ୍ଡ ଚାରୁ ନିର୍ବିରିନୀ
ମଧୁର କୁମାରୀ କଟ୍ଟ ତର ତର
ଲଈୟା କୁର୍କରୀ ନଦୀ ଚଲେଛେ ସାଗରେ
ଚକ୍ରେ ଚକ୍ରେ ଶୁନାଇୟା ଭୁଧର ଶୃଞ୍ଚାଳେ
ନିରମଳ, ସୁଶୀତଳ ସଲିଲ ସନ୍ଧିତ୍ତୀ
ସଲଜକୁମାରୀ କୁଣ୍ଡ ଆଛେ ଲୁକାଇୟା
ନିବିଡ଼ ଅରଣ୍ୟମୟ ପରତ ଗହୁରେ
ବନ୍ଦେର କୁମାରୀ ଯେନ ସିଂହ ଅନ୍ତଃପୁରେ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାହାଡ଼େ ଶିବ ଚତୁର୍ଦଶୀ ମେଳାର ସମୟ ବିଶେଷତ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବୀରା ଏଥାନେ ଆସେନ । ରାତ୍ରାକୁ ବାଁ ଦିକେ କିଛୁଦିନ ଆଗେ ଗଢ଼େ ଉଠେଛେ ଶ୍ରୀକ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେବାଶ୍ରମ । ପାଶେଇ ରଯେଛେ ‘ଗିରିଶ ଧର୍ମଶାଲା’ । ସାମନେ ଆଛେ ବିରାଟକାଯ ‘ବୃନ୍ଦାର ମାର ଦୀଦିଶ’ । ଏରଇ ଡାନଦିକେ ୧୯୯୮ ସାଲେ ନନୀଗୋପାଲ ସାହାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନେ ଗଡ଼େ ଉଠେଛେ ‘ଏନ ଜି ସାହା ତୀର୍ଥ୍ୟାତ୍ମୀ ନିବାସ’ । ‘ବୃନ୍ଦାର ମାର ଦୀଦିଶ’ ତୈରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ ତ୍ରିପୁରାର ମହାରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ମାନିକ୍ୟ । ୧୯୦୧ ସାଲେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ତୀର୍ଥ୍ୟ ତାଁର ବୃନ୍ଦା ମାକେ ନିଯେ ଏମେହିଲେନ । ଏଥାନକାର ଅନ୍ୟତମ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାୟଗା ହଲ ‘ଶଂକର ମଠ’ । ଏହି ମଠେର ମଙ୍ଗେ ରଯେଛେ ସଂକ୍ଷତ କଲେଜ, ଦାତବ୍ୟ ଚକିଂସାଲୟ, ବ୍ରନ୍ଦକୁଣ୍ଡ । ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଆଛେ ‘ନାରାୟଣ ଛତ୍ର’ ।

ସଡ଼କ ବା ରେଲପଥେ ଏହି ମାତୃତୀର୍ଥେ ମୋଟ ଚାରଟି ପଥେ ଆସା ଯାଯ । ପ୍ରଥାନ ପଥଟି ହଚ୍ଛେ, ମୀତାକୁଣ୍ଡ ରେଲ ସ୍ଟେଶନ । ଏହାଡ଼ାଓ ରଯେଛେ ବାଡ଼ବକୁଣ୍ଡ ରେଲ ସ୍ଟେଶନ, କୁମିରା ରେଲ ସ୍ଟେଶନ । ମୀତାକୁଣ୍ଡେର କାହେ ସହନ୍ତିରା, ଲବଣାକ୍ତ କୁଣ୍ଡେର ପାହାଡ଼ୀ ପଥ ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ-ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରତେ ହେଁ । ତବେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅନେକଗୁଲି ପାକା ରାତ୍ରା ତୈରି ହେଁଛେ । ତା ସତ୍ରେଓ ଅନେକ ଜାୟଗାଇ ପାହାଡ଼ୀ ପଥ ଦିଯେ ହେଁଟେ ଯେତେ ହେଁ ।

ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରଥମ ତୈରି କରାନ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ମାନିକ୍ୟ । ୧୮୮୫ ସାଲେ ମନ୍ଦିରଟି ଧବଂସ ହେଁ ଗେଲେ ତା ଆବାର ତୈରି କରାନ ସାରୋଯାତଳୀ ଗ୍ରାମେର ଜମିଦାର ରାମସୁନ୍ଦର

সেন। অনেক পরে মন্দিরের সংস্কার করান ময়মনসিংহের জমিদার রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি।

চন্দ্রনাথ ও বিরাপাক্ষ মন্দিরে ওঠা খুবই দুরাহ ব্যাপার। একসময় পশ্চিমবঙ্গের চবিবশ পরগনা জেলার জমিদার রামহরি বিশ্বাসের মা এখানে এসে ওপরে উঠতে পারেন নি। মায়ের নির্দেশে রামহরি ওরফে গঙ্গারাম বিশ্বাস আনুমানিক ১২৭০ বঙ্গাব্দে ওই পথে সাতশ বিরাশিটি সিঁড়ি তৈরি করান। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে চবিবশ পরগনার জমিদার সূর্যকান্ত রায় চৌধুরি ওই সিঁড়িগুলির সংস্কার করান। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে ঢাকার ইনাম গ্রামের গোপাল চন্দ্র সাহা ও মধুসূদন সাহা (দুই ভাই) চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এক মাইল পথে সিঁড়ি তৈরি করান। এছাড়াও চন্দ্রনাথ মন্দিরের ওঠার কিছু অংশে ১৩২৮ বঙ্গাব্দে পাথরের ধাপ তৈরি করিয়ে দেন বাংলাদেশের পাবনা জেলার 'স্তুল' গ্রামের অনন্দাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী বসন্তকুমারী দেবী। তাঁদের উদ্যোগে উনিশটি পাথরের ধাপ তৈরি হয়।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপরের দিকে বটগাছের তলায় যাওয়া আক্ষরিক অর্থে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান রাজা বিজয় চন্দ্র মহাতাব কিছু সিঁড়ি তৈরি করিয়ে দেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহের গোলকপুরের জমিদার উপেন্দ্রলাল চৌধুরির স্ত্রী যোগমায়া দেবী চৌধুরানী চন্দ্রনাথ মন্দিরের নাট মন্দিরটি তৈরি করিয়ে দেন।

স্বয়ন্ত্রনাথ মন্দিরে ওঠার পথে বাঁ পাশে আছে মা ভবানীর মন্দির। পুরাণে বলা হয়েছে, দেবাদিদেব চন্দ্রনাথে দেবী ভবানীর সঙ্গে অধিষ্ঠান করবেন। আগেই উল্লেখ আছে, মা ভবানী এখানে কালী মূর্তিতে বিরাজ করছেন। প্রতিটিন এখানে মায়ের পুজো, ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০৫ সালে ময়মনসিংহের জামিদার বিন্দুবাসিনী চৌধুরানী টিনের চোচালা ঘর তৈরির ব্যবস্থা করে মন্দিরের সংস্কার করান এবং একই সঙ্গে স্বয়ন্ত্রনাথের পাথরের বেদীটি ঝুপো দিয়ে বাঁধিয়ে দেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তগাছার জমিদার বিদ্যাময়ী দেবী চৌধুরানী স্বয়ন্ত্রনাথ মন্দিরের মেঝে শ্রেত পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেন। ১৯০৩ সালে রংপুরের জমিদার অনন্দাপ্রসাদ সেন এই মন্দিরের ভোগঘরটি তৈরি করান। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার শিয়ারশোলের রাজা প্রমথ নাগ মালিয়া শত্রুনাথ মন্দিরে যাওয়ার আটষট্টি সিঁড়ি তৈরির ব্যবস্থা করেন।

ভবানী মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দুলাল কান্তি ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র কলকাতার বেহালার বাসিন্দা 'গোবিন্দ চরণ বারিকের ছেলে হীরালাল দাস বারিক তাঁর মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে মন্দিরের পাকা অংশটি তৈরির ব্যবস্থা করিয়ে দিয়েছেন। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার গিরিলাল মোদী তাঁর বাবার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মূলত মন্দিরের বারান্দা ও কোলাপসিবল দরজা তৈরি করিয়ে দেন। শ্রীভট্টাচার্য আরও জানান, ভবানী মন্দিরের পাশেই রয়েছে জ্যোতির্ময় ও স্বয়ন্ত্রনাথ মন্দির। সতীর দেহখণ্ড যেখানে পড়েছিল তার পাশেই এই মন্দিরের অস্তিত্ব আছে বলে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

চন্দ্রনাথ মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত দেবাশিস ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এখানে নিত্য পুজো

হয় এবং শিব চতুর্দশীর দিন মহাসমারোহে এখানে হাজার হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে পুজো হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এই মন্দির পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। একশ পঁয়তাঙ্গিশ জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে সুবাস চন্দ্র লালা ও সুকুমার চক্রবর্তী।

প্রাথমিকভাবে চন্দনাথ ধামের অধীনে ৮০ দ্রোণ ($1 \text{ দ্রোণ} = 12.50$ একর) সম্পত্তি থাকলেও বর্তমানে মাত্র ২.৫০ দ্রোণ সম্পত্তি মন্দির কমিটির দখলে আছে। মূলত পুকুর, গাছ ও জমি থেকে যে আয় তা মন্দিরের আয়ের উৎস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শিব চতুর্দশীর দিন হাজার হাজার ভক্ত যে প্রণামী দেন তা থেকেও প্রচুর টাকা আয় হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চন্দনাথ ও ভবানী মন্দির ছাড়াও এখানকার সাত-আটটি মন্দিরে নিত্যপুজোর ব্যবস্থা আছে।

ত্রীক্রিচট্রেশ্বরী কালী মায়ের মন্দিরের অবস্থান

প্রাচীন চকবাজারে গুলজার সিনেমার সামনের মোড়, যেটি পশ্চিমদিকে সোজা চলে এসেছে কাজির দেউড়ি সার্কিট হাউজ মোড় পর্যন্ত। এই রাস্তাকেই বলা হয় চট্টেশ্বরী রোড। মেহেদিবাগ হয়ে ওয়াসার মোড় হয়ে কাজির দেউড়ির মোড় হয়ে যে কোনও সুবিধাজনক পথে চট্টেশ্বরী কালীবাড়িতে আসা যায়।

সপ্তম ও অষ্টম শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে নানা অঞ্চলিকতার সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব পড়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে। কমতে থাকে ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করার মতো মানুষের। এ-হেন পরিস্থিতি তখন শক্ররাচার্যকে বিশেষভাবে মাড়া দেয়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন সন্ন্যাস তৈরির জন্য বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করবেন। সেই সুযোগেই তিনি ভারতবর্ষে চারটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শোনা যায়। সর্বত্তরতীয় সন্ন্যাসীরা পদাধিকার বলে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড চন্দনাথ জাতীয় তীর্থ, মহেশখালির আদিনাথ তীর্থ ও ফটিক ছড়ির কাঞ্চন ননাথ তীর্থসহ অন্যান্য তীর্থ মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ হয়ে ধর্মীয় কাজ পরিচালনা করতেন। সীতাকুণ্ডের জাতীয় তীর্থ, মহেশখালির আদিনাথ তীর্থ ও ফটিকছড়ির কাঞ্চন ননাথ তীর্থের সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে যোগসূত্র রয়েছে চট্টগ্রাম মহানগরীর চট্টেশ্বরী কালী মায়ের মন্দিরের সঙ্গে। এই তথ্য জানা গেছে, সীতাকুণ্ড শ্রাইন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী সুখময় চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, ভারতে তীর্থ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন বাংলাদেশের উপরে উল্লিখিত তীর্থস্থানগুলিতে না গেলে তীর্থ পরিপূর্ণ হয় না।

প্রাচীনকালে মোহন্তরা ছিলেন নাগা সন্ন্যাসী। তাঁরা খুবই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শোনা যায়, এরা এক একসময় বাঘের পিঠে চড়েও যাতায়াত করতেন। চট্টেশ্বরী কালী মন্দির তৈরির আগে নাগা সন্ন্যাসীরা এখানে ধূনী তথা যজ্ঞের বড় বড় কাঠ জালিয়ে হোম যজ্ঞ করতেন নিমগাছের তলায়।

চট্টেশ্বরী কালীমায়ের মন্দিরের প্রথম কালী মূর্তির ব্যাপারে নানান কিংবদন্তী শোনা যায়। তথ্যভিত্তি মহলের ধারণা, এখানে প্রথম নিমকাঠের কালিমূর্তি তৈরি করেছিলেন

উত্তরবঙ্গে জয়ন্তী পীঠ

পুরাণ এবং তত্ত্বের মূল কথা হল, যিনি শিব তিনিই শক্তি। অর্থাৎ যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। শিব ছাড়া যেমন শক্তির কোনও অস্তিত্ব নেই, অন্যদিকে শক্তি ছাড়া শিব অসম্পূর্ণ। তাই প্রতিটি শক্তি পীঠেই শিব এবং শক্তি একই সঙ্গে বিরাজমান। পীঠ নির্ণয়ের মতে, একুশতম শক্তিঃপীঠ জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে। সেখানে বলা আছে,

‘জয়ন্তাং বাম জঙ্ঘা চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃঃ বাংলা ভাষায় যার অর্থ দাঁড়ায় জয়ন্তী বা জয়ন্তাতে পড়েছে সতীর বাম জঙ্ঘা। দেবীর নাম জয়ন্তী এবং বৈরবের নাম ক্রমদীশ্বর তথা মহাকাল।

অন্দদামঙ্গল-এর রচয়িতা লিখেছেন,

জয়ন্তায় বাম জঙ্ঘা ফেলিল কেশব।

জয়ন্তী দেবতা, ক্রমদীশ্বর বৈরব।।।

‘তন্ত্রচূড়ামণি’ এবং ‘শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী’র পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে,

‘..... কালেশ্বরং মহাপীঠং মহাপীঠং জয়ন্তিকাম্।

শাস্ত্রমতে, এখানে দেবীর বামজঙ্ঘা পড়েছে।

প্রশ্ন ওঠে, কোথায় এই পীঠের অবস্থান। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের ধারণা, জয়ন্তী পীঠ রয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দাস একান্ন পীঠের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে উল্লেখ আছে, খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে জয়ন্তিয়া পরগনায় রয়েছে এই শক্তিপীঠ। অসমের জনৈক ঐতিহাসিক গেইট-এর নেৰাৱতে উল্লেখ আছে, সতীর বাঁ পায়ের নিম্নাংশ পড়েছিল জয়ন্তিয়া পরগনার ফাজলুরে। কথিত আছে, দুর্গাপুজোর মহানবমীর দিন এখানে নরবলি হত। রাজা ও প্রজা উভয়েই এই নরবলির আয়োজন করতেন। পুত্র সন্তান হলে রাজা নরবলির ব্যবস্থা করতেন।

অন্যদিকে প্রজারা তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে এই প্রক্রিয়ার আয়োজন করতেন। আরও কথিত আছে, বলি হবার জন্য মানুষেরা নাকি নিজেরাই স্বেচ্ছায় এসে উপস্থিত হতেন। তবে কোনও কোনও সময় বলি'র জন্য মানুষ চুরি করাও হোত।

তবে অধিকাংশের মত হল, জয়ন্তী পীঠ হল জলপাইগুড়ি জেলার ভূটান সীমান্তে। আলিপুর দুয়ারের কাছে জয়ন্তী নদীর তীরে মহাকাল পর্বতে এই জায়গাটি আছে।

এই ব্যাপারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, জায়গাটি এতেই দুর্গম যে একমাত্র শিবরাত্রির সময় ছাড়া বছরের অন্য কোনও সময় সেখানে যাবার উপায় নেই। কারণ, জয়স্তী নদীর চারিদিকে রয়েছে পাহাড় ও জঙ্গল। শুকনো নদী, কিন্তু বৰ্ষার সময় তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এমনকি কোনও কোনও বছর বৈশাখ থেকে কর্তিক মাস পুরো জায়গাটিতে যাবার সুযোগই থাকে না। নদীর ধার দিয়ে তিনি থেকে সাড়ে তিনি কিলোমিটার হাঁটলে এই পাহাড়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। সমগ্র এলাকায় জনবসতি না থাকায় নদীর পাড় দিয়ে কোনদিকে মহাকাল মন্দির তথা জয়স্তী পীঠ, তা জানা খুবই দুর্ক হয়ে যায়। তবে ইদনীংকালে সেখানে একটি থাকার জায়গা তৈরি হয়েছে তা খুবই দামী।

সেখানে যাওয়ার জন্য দিনে একটিমাত্র বাস সকাল সাতটার সময় ছাড়ে। আবার বিকেল চারটের সময় ফিরে আসে। এছাড়া অটোয় চড়ে যাওয়া যায়। আসা যাওয়ার জন্য ভাড়া হিসেবে ছশ্ট টাকা নেয়। বাস বা অটো যায় জয়স্তী নদীর তীর পর্যন্ত। শিবরাত্রির দু'দিন পরে গিয়েছিলাম। শিবরাত্রির সময় সেখানে মেলা বসে। কিন্তু সেদিন গিয়ে মেলার কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি।

পথে পেয়ে গেলাম একটি বালি সংগ্রহকারী লরী। প্রায় তিনি কিলোমিটার লরীতে করে গিয়ে পৌছালাম। চারিদিকে অপূর্ব পরিবেশ। অনেকটা ভূস্বর্গ কাশীরের মতো। একই পাহাড়ী নদীকে বারবার পার হতে হয়। একসময় এলাম মহাকাল পাহাড়ের নীচে। সেখানে বর্ণ হয়ে নেমে আসছে নদী। সেখানে স্নান করা যায়। পাহাড়ে ওঠার জন্য লোহার সরু মই করা আছে। মই দিয়ে ওঠার পর এক জায়গায় সম্মুখীন হলাম খাড়াই জঙ্গলে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার একটি লোহার মই রয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, অত্যন্ত কঠিন সেই যাত্রাপথ।

একসময় এসে পৌছালাম মন্দ্যোরম পরিবেশে। মূল গর্ভমন্দিরে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। অঙ্ককার, শুধু সেখানে একটি প্রদীপের আলো জুলছে। একটি তাস্তিক সন্ধ্যাসী দর্শনার্থীদের পুজো করাচ্ছে। কিছুদিন আগে একটি প্রথম সারির কাগজে বেরিয়েছিল, ওই তাস্তিক দণ্ডী কাটতে কাটতে মহাকাল মন্দির থেকে কামাখ্য মন্দিরে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, এটাই জয়স্তী শক্তিপীঠ। দেবীর বাম নিম্নাঙ্গ যখন পড়েছিল তখন মহাকাল সেই প্রবল চাপ ধরে রেখেছিলেন। সেইজন্য সেখানে মহাকালের মান্যতা বেশি। সেই সন্ধ্যাসীই বলেছিলেন বাংলাদেশে নয়, এখানেই পড়েছে সতীর বামজঙ্ঘ। চারিদিকে ঘন জঙ্গল। চিতাবাঘ ও ভালুকের প্রভৃত উপদ্রব প্রায়শই হয়ে থাকে। তাই দলবদ্ধভাবে সেখানে যাওয়া উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাস্তিক সন্ধ্যাসী তথা পূজারী বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেখান থেকে নেমে আসেন, আবার ফিরে যান মাঘ মাসে। পুজোর সামগ্ৰী নিয়ে আসতে হয় শহর থেকে। গুহাটাই মন্দির। পাশাপাশি রয়েছেন মহাকাল ও সতী।

যে সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

- ১) সতীপীঠ পরিক্রমা— শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
- ২) মরুতীর্থ হিংলাজ— শ্রীকালিকানন্দ অবধৃত
- ৩) শ্রী রাজমালা— শ্রীকালিপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত
- ৪) কালীক্ষেত্র দীপিকা— শ্রীসূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ৫) কালীঘাট পুরাণ— শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়
- ৬) রাঢ়ের ক্ষীরগ্রাম ও দেবী যোগাদ্যা— শ্রীসনৎকুমার চক্ৰবৰ্তী
- ৭) দেবী নন্দিকেশ্বরী উপাখ্যান ও বীরভূমের সতীপীঠ— শ্রীবিজয়কুমার দাস
- ৮) কক্ষালী পীঠের কথা— শ্রীসাম্য মুখোপাধ্যায়
- ৯) বেদগভী কক্ষালী— শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য।

হিমাচলে চিন্তাপূর্ণী দেবী

গাড়োয়াল হিমালয় ও সংলগ্ন অঞ্চলে এই দেবীকে সবাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মান্য করেন। জ্বালামুখী ও কাংড়ার খুব কাছেই চিন্তাপূর্ণী দেবীর মন্দির। কাংড়া থেকে চিন্তাপূর্ণীর দূরত্ব প্রায় ৫০ কিলোমিটার। জ্বালামুখী থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। এখানে সতীর ডানপায়ের কিছু অংশ পড়েছে। শোনা যায়, সতী এখানে ছিন্নমস্তা হয়ে তাঁর দশমহাবিদ্যারূপ মহাদেবকে দেখিয়েছিলেন।

জ্বালামুখী বাস স্ট্যান্ড থেকে এক ঘণ্টা অন্তর বাস ছাড়ে চিন্তাপূর্ণীর উদ্দেশ্যে। পথের দূরত্ব খুব বেশি নয়। ভাড়া ২৫ টাকা। চিন্তাপূর্ণীর উচ্চতা ৩৯০০ ফুট। মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে ছোট জনপদ। অন্যান্য ধর্মস্থানের মতো এখানেও রয়েছে দোকানপাটি, ধর্মশালা। বাস স্ট্যান্ডের পিছন দিক দিয়েই মন্দিরে যেতে হয়। পাহাড়ের ওপরে মন্দিরের অবস্থান। প্রায় ১ কিলোমিটারের মতো পাহাড়ী পথ ভেঙে দেবীস্থানে পৌছতে হয়। পথের দু'পাশে অজস্র হোটেল, লজ আছে। জ্বালামুখীর চেয়েও অনেক বেশি ভক্ত এখানে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানানোর জন্য সমবেত হন।

উনা জেলার অন্তর্গত এই চিন্তাপূর্ণী মন্দির। প্রতি বছর ~~আসন্তী~~ ও শারদ নবরাত্রে এখানে প্রচুর যাত্রী সমাগম হয়। বিশাল আকারের মেলা বসে শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষে।

পাহাড়ের মাথায় অনেকখানি প্রশস্ত ও স্বেচ্ছা জায়গার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন কল্পবৃক্ষকে কেন্দ্র করে মন্দিরের অবস্থান। দেবী এখানে ছিন্নমস্তা। এখানেই সতী নিজের খঙ্গাঘাতে মাথা ছিন্ন করে মহাদেবকে মহাশক্তি দেখিয়েছিলেন। দেবী এখানে পিণ্ডিরূপ।

সুন্দর ছোট মন্দির। এখানে সব সময়ই ভীড় লেগে থাকে। ভক্তদের দানে দেবীর মাথায় রয়েছে সোনা রংপোর বেশ কয়েকটি ছোট-বড়ো ছাতা। কথিত আছে, চিন্তাপূর্ণী মা সকলেরই চিন্তা দূর করেন। দেবীর কাছে মানত করলে কেউ ব্যর্থ হয় না। মন্দিরের গা থেকে চূড়া পর্যন্ত সবটাই সোনা দিয়ে মোড়া।

মন্দিরের একদিকে রয়েছে ধৌলাধারের মতো তুষারাবৃত পাহাড়। কল্পবৃক্ষকে ঘিরেও হাজারো মানুষের উন্মাদন। গাছটির এখন আর অস্তিত্ব নেই। অবশিষ্ট রয়েছে গাছের গুঁড়ি। তার গা থেকে যে সব ডালপালা বেরিয়েছে তাতেই কামনা পূরণের আশায় সকলে মহা উৎসাহে চুনির বাঁধে। তাই এই বটগাছের নিচের অংশ লাল হয়ে গেছে। একই সঙ্গে এখানে জ্বালা হয় প্রদীপ ও ধূপ।

অনেকদিন আগে মাইদাস নামে দেবী চণ্ণীর এক পরম ভক্ত এই স্থানটি আবিষ্কার করেন। মাইদাসের বাবা ছিলেন আঠারোনামী গ্রামের (রিয়াসত পাতিয়ালা) এক ব্যবসায়ী। তাঁর তিন ছেলে—দেবীদাস, দুর্গাদাস ও মাইদাস।

মাইদাস সবসময় দেবী চণ্ণীর পুজো ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। নিজেদের পারিবারিক ব্যবসার দিকে তাঁর বিন্দুমুক্ত মন ছিল না। তাই দাদারা মাইদাসের প্রতি বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন। একসময় তাঁরা ছোট ভাইকে পরিবার থেকে বিছিন্ন করে দেন। মাইদাস তাঁর জন্য দুঃখ তো পেলেনই না, বরং আরও গভীরভাবে দেবীর আরাধনায় মগ্ন হলেন। একদিন কাজের জন্য পাহাড়ের ঘন জঙ্গলপথের মধ্যে দিয়ে যাবার জন্য পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একটি বড়ো বটগাছের তলায় বিশ্রামের জন্য বসলেন। সেই জায়গাটির নাম ছপরোহ। বসামাত্রই ক্লান্ত মাইদাসের চোখে ঘুম নেমে এল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলেন এক দিব্যজ্যোতিসম্পন্না কন্যা তাঁকে বলছেন, ‘ভক্ত মাইদাস, তুমি এখান থেকেই আমার আরাধনা করো। এতেই তোমার মঙ্গল হবে।’

ঘুম ভাঙ্গার পর তিনি চারপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি সেখান থেকে শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আবার ফিরে যাবার সময় সেই জায়গাতেই এলেন। সেই বটগাছের নীচে বসে ভাবতে লাগলেন, কে তাকে স্বপ্নের মধ্যে এই নির্দেশ দিল। এইভাবে অহোরাত্র স্মৃতি করতে করতে মাইদাস দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দেবী ভগীরতী। মুহূর্তের মধ্যে মূর্ছা গেলেন তিনি। দেবীর কৃপায় মূর্ছাভঙ্গ হবার দৈর্ঘ্য মাইদাসকে বললেন, ‘ভক্ত মাইদাস! এই বটগাছের তলায় আমি অনন্তকাল ধরে আছি। আমি এখানে দাঁড়িয়েই পুরাকালে মহাদেবকে আমার ছিন্নমস্তা রূপ দেখিয়েছিলাম। তুমি আমার পরম ভক্ত। তাই এই ঘোর অরণ্যে বসে তোমাকে আমার আরাধনা করার আদেশ দিচ্ছি। আমি তোমাকে কৃপা করব। আমি ছিন্নমস্তা হলেও মানুষের চিন্তা দূর করার জন্য চিঞ্চাপূর্ণী নামেই প্রসিদ্ধ হব’।

নতমস্তকে মাইদাস বললেন, ‘এই ভয়ন্ক জঙ্গলে আমি একা থাকব কী করে? এখানে না আছে জল, না আছে খাবার, না আছে থাকার মতো আশ্রয়।’ এখানে দিনের বেলাতেও ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। রাতে তো আরোই ভয়ঙ্কর অবস্থা।’

দেবী বললেন, ‘আমার মায়ার প্রভাবে তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাকতে পারবে। আমার বাহন সিংহ সবসময় তোমায় রক্ষা করবে। “ওঁ এং ক্লীং ত্রি ভয়নাশিনী হং হং ফট স্বাহা”—এই মন্ত্র জপ করলে সমস্ত ভয় এবং বাধাবিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। আর “ওঁ এং ক্লীং ত্রি চামুণ্ডায়ে বিচ্ছে”—এই মন্ত্রে পুজো করলেই আমি তুষ্ট হব। এই জায়গা থেকে একটু নিচে একটা বড় পাথর দেখতে পাবে। সেই পাথর সরালেই পানীয় জল পাবে। ওই জলেই আমার পুজো ও তোমার তৃষ্ণা দূর হবে। পরে আমি কোনও ভক্তের চিন্তা দূর করলে সেই আমার মন্দির গড়ে দেবে। সেই মন্দিরে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। ভক্তদের সেবা, পুজো ও দানেই তোমার সংসার চলবে। তোমার বংশধরেরাই পরবর্তীতে

আমার পুজোর অধিকারী হবে।' এই কথাগুলি বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাইদাস দেবীর নির্দেশমতো পাহাড়ের কিছুটা নিচে নামতেই একটি বড় পাথর দেখতে পেলেন। দেবীকে স্মরণ করে সেই পাথর একটু ঠেলা দিতেই তা সরে গেল। দেখা গেল, সেখানে বইছে নির্মল জলধারা। চরণামৃত জ্ঞানে তিনি সেই জল পান করলেন। তারপর সেখানেই কুটির তৈরি করে বাস করতে লাগলেন। একই সঙ্গে সেই জলে দেবীর অভিষেক করে আরও বেশি করে আরাধনায় মগ্ন হলেন। তিনি যে পাথরের তলা থেকে জলের সন্ধান পেয়েছিলেন তা পরে চিনাপূর্ণ মন্দিরে নিয়ে এসে পুজো করা হয়। ২০০টি সিঁড়ি নীচে নেমে এসে এই জলাশয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই জলেই আজও দেবীর অভিষেক হয়।

pathagar.net

শিবালিক পাহাড়ে নয়নাদেবী

নয়নাদেবী জায়গাটি সমুদ্রতল থেকে চার হাজার ফুট উঁচুতে। পাহাড়ের ওপর বাস স্ট্যান্ডে রয়েছে অনেক দোকানপত্তর। এখান থেকে মন্দিরের দূরত্ব আছে। একটি খাঁড়াই শৃঙ্গ উঠে গেছে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে। মন্দিরে পৌছানোর জন্য সম্পত্তি একটি রোপওয়ে তৈরি করা হয়েছে। ওঠার জন্য ৭৬১টি সিঁড়ি আছে। পথের দূরত্ব দু'কিলোমিটার। শিবালিক পাহাড়ের এই উঁচু জায়গাটিতে রয়েছে মনোরম পরিবেশ।

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমদিকে সব মিলিয়ে সাড়ে বারো যোজন এই তীর্থের সীমানা। শোনা যায়, নয়নাদেবী দেবী চণ্ডীর রূপ ধারণ করে এখানে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। অসুরের নাম কেন মহিষাসুর হল তা নিয়েও কাহিনী প্রচলিত আছে।

পুরাকালে দৈত্যকুলে রস্ত ও করস্ত নামে দু'জন মহাপরাক্রমশালী অসুর ছিল। তারা দু'জনে সহোদর, কিন্তু তাদের কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। সেই জন্য পুত্র সন্তান লাভের আশায় দু'জনে কঠোর তপস্যা শুরু করে। একজন পঞ্চনদতীর্থে জলের তলায় বসে তপস্যা শুরু করল। আর একজন তপস্যা শুরু করল প্রজ্জ্বলিত আগুনের মধ্যে। তাদের তপস্যার ধরন ও অগ্রগতি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তাঁর ধারণা হল, তপস্যার বলে তারা স্বর্গের আসন দখল করে নেবে। তিনি হাঙ্গরের দূর ধরে, পঞ্চনদতীর্থে পৌছে কর্ণকে বধ করলেন। ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন রস্ত। আগুনে প্রাণ বিসর্জন দেবার সময় অগ্নিদেব স্বয়ং তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'মূর্খ দানব! আত্মহত্যা করলে কি তুমি পুত্র সন্তান লাভ করবে? পক্ষান্তরে এভাবে মৃত্যু হলে তোমার অনন্ত নরকবাস নিশ্চিত। আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার বরে, তোমার এক মহা বলবান পুত্রলাভ হবে। তাই আর তপস্যার প্রয়োজন নেই। এখন আত্মহত্যার বাসনা ত্যাগ করো।'

বর পেয়ে আনন্দিত হয়ে সে ঘরে ফিরে চলল। ফেরার সময় যক্ষদেশে এক বলবত্তী মহিষীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর সে তার সঙ্গে মিলিত হল। মহিষীর গর্ভজাত সন্তান বলেই তার নাম দেওয়া হল মহিষাসুর। নয়নাদেবী শৃঙ্গের দু'যোজন দূরে মহিষাসুরের রাজ্য ছিল, যা পরিচিত ছিল মহিষপুরী নামে। এই জায়গাটি পরবর্তী সময়ে মাঝেপাল

নামে পরিচিত হয়, বিলাসপুর জেলার অস্তর্গত। শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুর বিলাসপুর নরেশের কাছে থেকে পাওয়ার জন্য এখানে দুর্গ তৈরি করে নাম দেন আনন্দগড়। এই আনন্দগড়ই বর্তমানে আনন্দপুর সাহিব নামে পরিচিত।

নয়নাদেবীর মন্দিরের চারদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছম। দেবী দর্শনের জন্য রেলিং-এর ব্যবস্থা করা আছে। শোনা যায়, নয়নাদেবীর পুরনো মন্দির অনেকদিন আগে বৌদ্ধসুগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বারোশো বছর আগে মধ্যপ্রদেশের চান্দের নগরের রাজা বীরচন্দ্র নতুন মন্দিরটি তৈরি করান। এই জায়গায় তিনি স্থাপন করেন কোহেনুর (অন্য নাম কহলুর) রাজ্য। বিধীমীরা এখানে কোনও ক্ষতি করতে পারেনি।

এখানেও দেবী প্রকট রয়েছেন পিণ্ডীরূপে। মূল মন্দিরের কাছেই রয়েছেন ক্ষেত্রপাল তৈরোব। রয়েছেন গণপতি ও হনুমানজী। আরও রয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্঵েতবটুক। মন্দির থেকে সামান্য দূরে রয়েছে একটি অতিপ্রাচীন পিপল গাছ। অনস্তকাল ধরে এখানেই আছে ব্রহ্মপিণ্ডি বা শিলা। এখানে মস্তক মুণ্ডন, শ্রান্কশাস্তি সব কিছুই হয়।

সতীর দু'টি চোখ-ই এখানে পড়েছে বলে এখানে দেবীর নাম নয়না। নামকরণের আর একটি কারণ হল, স্থানীয় গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রায়ই ‘জয় নয়নে, জয় নয়নে’ ধ্বনি শোনা যেত। তৃতীয়ত, এখানকার পাহাড়ী অঞ্চলে গুর্জররা বাস করত। নৈনা নামে জনৈক গুর্জর ছিলেন দেবীর পরম ভক্ত। তিনি তাঁর গোকুল, ছাগল প্রায়ই এখানে চরানোর জন্য নিয়ে আসতেন। এখন যেখানে পিপল গাছটি আছে, ঠিক সেখানে এসে নৈনার একটি গাভী দাঁড়িয়ে পড়ত। আর তখনই আপনা হতেই তার বৃষ্ট থেকে দুর ঝরে পড়ত। রোজ একই ঘটনা লক্ষ্য করে একদিন সেখানকার ঝরাপাতা সরিয়ে নৈনা দেখলেন, সেখানে মা ভগবতী পিণ্ডীরূপে বিবাজ করছেন। সেই রাতেই দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বললেন, আমি আদিশক্তিপুর্ণ এই জায়গাতেই আমি বিবাজ করছি। তুই এখানে আমার স্থান তৈরি করে দে। তোর নামেই এই জায়গা প্রসিদ্ধি লাভ করবে।

মন্দির থেকে কিছুটা দূরে ব্রহ্ম সরোবর নামে একটি সরোবর আছে। মহিষাসুরকে বধ করার পর দেবী অসুরের কপাল ফাটিয়ে ব্রহ্মাকে দেন। ব্রহ্মা তা স্থাপন করেন বলে এই জায়গার নাম হল ব্রহ্মকপালী। বিচিত্র ঘটনা হল, এই এলাকায় সিংহের কোনও অস্তিত্ব নেই কিন্তু মাঝে মাঝে গভীর রাতে নাকি এখানে তার গর্জন শোনা যায়।

কথিত আছে, নয়নাদেবীর চরণ থেকে বের হয়ে একটি জলের ধারা চরণগঙ্গা নামে আনন্দপুর সাহিবের উত্তরে শতক্র (সতলুজ) নদীতে মিশেছে। এখানে সারা বছরই যাত্রী সমাগম হয়। চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে ‘জয় নয়ন’ ধ্বনিতে। আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল, স্থানীয় হবনকুণ্ডে আদিকাল থেকে যত হোম হয়েছে তার ভস্মরাশি কখনও বাইরে নিক্ষেপ করতে হয়নি। আস্তে আস্তে সবই কুণ্ডের মধ্যে মিশে গেছে।

মূল মন্দিরের চারটি দরজা আছে। বারো ক্ষেত্র দূরে দক্ষিণদিকে যে পাহাড় চোখে পড়ে যা ‘জটাধর মহাদেব’ নামে পরিচিত। উত্তরদিকে আর একটি পাহাড়ে ব্যোমগঙ্গা

ରଯେଛେନ । ଜାୟଗାଟି 'ବଚରେଟ' ନାମେ ଖ୍ୟାତ । ଏହି ନାକି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରେର ତପସ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର । କେଉ କେଉ ଏହି ଜାୟଗାକେ 'ବରମୋତୀ ନାମେ' ଓ ଡାକେନ । ବଲା ହ୍ୟ, ଏଥାନେ ସ୍ନାନ କରଲେ ସର୍ବରୋଗେର ହାତ ଥେକେ ଅବ୍ୟାହତି ପାଓଯା ଯାଯ । ପୂର୍ବଦିକେର ପାହାଡ଼େ ମା ମହାକାଳୀର ଅବସ୍ଥାନ । ପଶ୍ଚିମ ଦିକେ ବ୍ରନ୍ଦାବନୀ ଦ୍ୱାର । ଶତକ୍ରନ୍ଦ ନଦୀର ତୀରେ ଏକ ମନୋରମ ଜାୟଗାୟ ବ୍ରନ୍ଦାର ତପସ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର । ମନ୍ଦିର ଥେକେ ଏର ଦୂରତ୍ବ ପ୍ରାୟ ସତ୍ୟା ଯୋଜନ ।

ମନ୍ଦିରେର ପିଛନଦିକେ ପ୍ରାୟ ସାଡ଼େ ଚାର କିଲୋମିଟାର ଦୂରତ୍ବେ ଦୁଁଟି ଘରନା ଆଛେ । ନାମ 'ବନ୍ଧୁ କି ବାଉରି' । କଥିତ ଆଛେ, ମହିଷାସୁରକେ ବଧ କରେ ଦେବୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଦିଯେ ତାର ଦୁଁଟି ଚୋଖ ଉପରେ ଏଥାନେ ନିଷ୍କେପ କରେନ । ତାଇ ମହିଷାସୁରର ଚୋଖେର ଜଳ ଘରନାଧାରୀ ହ୍ୟେ ନାକି ଆଜଓ ଅବ୍ବୋର ଧାରାଯ ଘରେ ପଡ଼ିଛେ । ଶୁଦ୍ଧ ମହିଷାସୁର ନଯ, ତାର ସଙ୍ଗୀମାଥୀଦେର ଏକ-ଏକଜନେର ମୁଣ୍ଡ ଛିଁଡ଼େ ଦେବୀ ଯେ ଜାୟଗାଗୁଲିତେ ନିଷ୍କେପ କରେନ, ମେଘଲିଇ ଏଥନ କୁଣ୍ଡ, ବା, ଶିଲାପିଣ୍ଡ କାପେ ବିରାଜ କରିଛେ ।

pathagar.net

উত্তরপ্রদেশে শাকস্তরী দেবী

শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে উত্তরপ্রদেশের সাহারণপুরের উক্তরে ঝরনার তীরে আছে ‘শাকস্তরী শক্তিপীঠ’। বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হওয়ার পরে দেবীর ‘মাথা’ এখানে পড়ে বলে কথিত আছে। শ্রীশ্রীচতুর্ণিতে উল্লেখ আছে, ‘মধ্যমচরিতস্য বিষ্ণুঞ্চি-মহালক্ষ্মী-দেবতা, উষ্ণিক্র ছন্দঃ, শাকস্তরী শক্তি-দুর্গাবীজং, বাযুস্তত্ত্বং, মহালক্ষ্মী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ’। এখানে থাকার জন্য সবরকমের সুবিধাযুক্ত আশ্রম বা ধর্মশালা আছে। একটি ছোট পাহাড়ে ছিন্নমস্তার মন্দির। আর একটি পাহাড়ের পাদদেশে সামান্য উঁচু জায়গায় শাকস্তরী শক্তিপীঠ। শোনা যায়, এই পীঠে যে শুধুমাত্র সতীপীঠ তাই নয়, এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা সবসময় বিরাজ করেন।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, ‘পুকুরতীর্থে ব্রহ্মা নামে, গয়ক্ষেত্রে চতুর্মুখ নামে, কাবেরী তটে সৃষ্টিকর্তা নামে এবং শাকস্তরীতে রসপ্রিয় নামে তিনি বিদ্যমান’।

মহাভারতের বনপর্বের তীর্থকাণ্ডে বলা হয়েছে, ‘এই তীর্থ ত্রিলোক বিখ্যাত’।

সেখানে উল্লেখ আছে,

‘ততঃ শাকস্তরী রীতৈব তৈব নাম উস্যাঃ প্রতিষ্ঠিতম।

শাকস্তরী সমাখ্যাতা ব্রহ্মাচারিণী সমাহিত’॥

ইন্দ্রাণী স্তোত্রে বলা আছে,

‘ইন্দ্রাঙ্কী নাম সা দেবী দেবতে সমুদ্বৃত্তা।

গৌরী শাকস্তরী দেবী দুর্গানান্নী তিবিশ্রুতা’॥

ভক্তদের বিশ্বাস, শিশুর অহ দোষ লাগলে এই দেবীর সারণীলাভে শিশু গ্রহণ করে হয়। চাকরিক্ষেত্রে বা রাজধানীর কোথাও শক্ররা বাধা দিলে বা বিরোধিতা করলে দেবীর কৃপায় তা দূর হয়ে যায়।

দেবী মাহাত্ম্যে আছে,

‘শাস্ত কর্মানি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্ন দর্শন

গ্রহ পীড়াসু চৌগ্রাসু মাহাঘ্যং শৃণয়াস্ম’।

আশ্চর্ষিত মাসে শুক্লা চতুর্দশীতে এখানে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়। দেবী কিন্তু এখানে একা থাকেন না। মধ্যে দেবী শাকস্তরী, সামনেই রয়েছেন গণপতি। ডানদিকে

যথাক্রমে রয়েছেন ভীমা ও ভামরী। বাঁদিকে আছেন দেবী শতাক্ষী। একই দেবী ভিন্ন রূপে
ও ভিন্ন নামে এখানে পূজিতা হচ্ছে।

দেবী শাকন্তরী সম্পর্কে শ্রীশ্রী দুর্গা সপ্তশতিতে আছে—

‘শাকন্তরী নীলবর্ণ নীলোৎপল বিলোচনা

গঙ্গীর নাভি ত্রিবলী বিভূষিত তনুরী।’

বাংলায় তর্জমা করলে অর্থ দাঁড়ায়, শাকন্তরী দেবীর আভা নীলবর্ণ, চোখ নীল পদ্মরাগের
ন্যায়, গভীর নাভি এবং অতি সুন্দর ত্রিবলীযুক্ত সূক্ষ্ম কটিভাগ। দেবীর এক হাতে প্রস্ফুটিত
পদ্ম ফুল, অন্য হাতে বাণ ও নানাবিধ ফুল পদ্মব, কন্দমূলাদি শাকসবজি। দেবীর দক্ষিণ
দিকে আছেন ভীমা ও ভামরী দেবী।

ভীমা দেবীর হাতে রয়েছে তলোয়ার, ডমরু ও পানপাত্র। তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে
নিম্নোক্তভাবে—

‘ভীমাপি নীলবর্ণ সা দংস্ত্রা দশন ভাসুরা

বিশাল লোচনা নারী বৃত্ত পীত পয়োধরা’।।

ভামরী দেবীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

‘তেজো মণ্ডল দুর্ধৰ্ষা ভামরী চিত্রকাস্ত ভৃত

চিত্রানুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা’।।

ভামরী দেবী মহামায়া নামে পরিচিত। কথিত আছে, এই দেবীকে দর্শন করলে
ব্রহ্মত্যার পাপও দূর হয়।

দেবী শতাক্ষী, শীতলা নামে পরিচিত।

শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে বীরখেত নামক জায়গায় দেবী চণ্ডী রক্তবীজকে দমন
করে ভীমা ও ভামরী নাম দিয়ে ঘোরতর যুদ্ধে চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করেন। পুরনো দিনের
মানুষজন মনে করতেন, এই বীরখেত ময়দানেই দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।
রক্তবীজ বধের পরে পর্বতের চারদিক ঢেকে থাকা জঙ্গল থেকে ছুটে আসে দুই অসুর
শুন্ত ও নিশুন্ত। তখন দেবতাদের সকলে দেবীর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। ভূরাদেব
(মহাদেব), তাঁর পাঁচ সঙ্গী মঙ্গল, চঙ্গল, বোরা, মানসিংহ ও ঝোড়াকে নিয়ে এই যুদ্ধে
অংশগ্রহণ করেন। শুন্ত ও নিশুন্তের বজ্রবাণে একসময় ভূরাদেবের পাঁচ সঙ্গী পড়ে গেলে
তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে একাই শত শত অসুরকে মেরে ফেলতে শুরু করলেন। শুন্ত
ও নিশুন্ত তখন ভূরাদেবকে লক্ষ্য করে অঞ্চিবাণ নিক্ষেপ করল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন
'জয় দেবী' বলে। অন্যদিকে দেবীর চক্র শুন্ত ও নিশুন্তকে দু'খণ্ড করে দিল। দেবী চণ্ডিকা
অমৃতবারির সাহায্যে জাগিয়ে তুললেন ভূরাদেবকে। পাঁচ সঙ্গীও অমৃতের পরশে বলবীর
ফিরে পেয়ে ওই জায়গাতেই দেবীর চরণে লীন হয়ে গেলেন। বলা হয়, যেখানে এই
যুদ্ধ হয়েছিল সেইখানেই ভূরাবাবার মন্দির গড়ে উঠেছে। তাই প্রবাদ আছে, ভূরাবাবাকে
দর্শন না করলে দেবী দর্শন সফল হয় না।

প্রাচীনকালে দুর্গম নামে এক ঝৰি ছিলেন। তিনি এখানে দীর্ঘদিন তপস্যার পর ব্ৰহ্মাকে সন্তুষ্ট কৰে বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে বলেন, তাঁৰ চারটি বেদ চাই এবং যুদ্ধে সে যেন অজেয় হতে পাৱে। তথাস্তু বললেন ব্ৰহ্ম। বুদ্ধিভূম হল দুর্গমেৰ। চারটি বেদ লুকিয়ে রেখে সে ভীষণ উপদ্রব শুণ কৰল। একসময় দেবৱাজ ইন্দ্ৰকে পৰাস্ত কৰে দখল নিল স্বৰ্গৱাজ্যেৰ। বছৰেৰ পৰ বছৰ ধৰে দেখো দিল অনাবৃষ্টি। দেবতা ও ব্ৰাহ্মণেৱা বেদেৰ তত্ত্বমন্ত্ৰেৰ ক্ৰিয়াকৰ্ম ভুলতে শুৰু কৰলেন। একসময় দেবতাৱা শিবালিক পাহাড়েৰ পাদদেশে এসে দেবী চণ্ণীকাকে তপস্যাৰ দ্বাৱা সন্তুষ্ট কৰে বললেন, ‘হে দেবী। যেভাবে তুমি চণ্ণ, মুণ্ড, মহিষাসুৱা, রক্তবীজ ও শুভ-নিশ্চৰকে বধ কৰেছ, সেইভাবে দুর্গমকেও শাস্তি দাও। একশো বছৰ ধৰে অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়াৰ মুখে। শুকিয়ে গেছে নদীনালা। তুমি আমাদেৱ সবাইকে রক্ষা কৰো।’

দেবী শতচন্দ্ৰ হয়ে সহস্র ধাৱায় তাঁৰ কৱণাবাৰি জনেৰ আকাৱে বিতৰণ কৱায় সাৱা পৃথিবীতে তাৱ বেশ ছড়িয়ে পড়ল। আবাৱ সূজলা, সুফলা হল পৃথিবী। দেবীৰ শৱীৰ থেকে কন্দমূল প্ৰভৃতি শাক উৎপন্ন হল। তাই তাঁৰ এক নাম শতাঙ্কী ও আৱ এক নাম শাকন্ত্ৰী দেবী। যা আৱ এক অৰ্থে দেবী দুৰ্গা-ই প্ৰতিৱৰ্প। তাই সংস্কৃত স্তব মন্ত্ৰে বলা হয়, ‘শাকন্ত্ৰী শতাঙ্কী সা স এব দুৰ্গা প্ৰকীৰ্তিতাঃ।’

সাহাৱাণপুৱেৰ পথে ‘বেহট’ (বৃহৎবট) নামে বড় ব্যক্তিকেন্দ্ৰ ছিল। চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য একসময়ে এখানে কিছুদিন ছিলেন। তিনি দেবীদৰ্শনে আসাৱ পৱে একটি মন্দিৱ তৈৱিৰ ব্যবস্থা কৱেন। পৱে কলিঙ্গ দেশেৰ রাজবংশেৰ সুযোৰ্বংশীয় রাজপুত নৱেশ পুণীৱ এখানে আসেন এবং দেবীতীৰ্থ থেকে পাঁচমাহিল দুৱে জসমোৱ স্টেটেৱ’ প্ৰবৰ্তন কৱেন। বিক্ৰমী সংবত ১৫১৫-তে রানা সাহেব প্ৰতিপ সিং বাহাদুৱ এই জসমোৱ স্টেটকে আৱও উন্নতমানেৰ কৱে গড়ে তোলেন। ১১২টি গ্ৰাম নিয়ে এই স্টেট গঠিত। ফলে সমগ্ৰ অঞ্চলটি তীৰ্থক্ষেত্ৰেৰ রূপ পায়। প্ৰায় ১২০০ বছৰ বংশপৱৰ্ম্পৱায় এৱাই সমগ্ৰ অঞ্চলটিৰ শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। এই বংশেৰ রানী ফুলদেবী স্বামী জীবনসিংহ-ৱ সঙ্গে সহমৱে গিয়েছিলেন। সেই ‘সতীবেদী’ আজও আছে।

দেবীকে কেন্দ্ৰ কৱে আৱও অনেক কাহিনী প্ৰচলিত আছে। উত্তৱভাৱতে আনন্দপুৱ নামে একটি গ্ৰাম ছিল। সেখানে শ্যামদেব নামে জনেক ব্ৰাহ্মণ বাস কৱতেন। তাঁৰ স্ত্ৰীৰ নাম ছিল সুলেখনী। কিন্তু তাঁদেৱ কোনও সন্তান ছিল না। সেইজন্য বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে সুলেখনীৰ কোনও প্ৰবেশাধিকাৱ ছিল না। দুঃখে দিন কাটছিল তাঁৰ। একদিন এক প্ৰতিবেশিনী তাঁকে বললেন, ‘দুঃখ কোৱো না। একসময় আমিও এই সমস্যায় পড়েছিলাম। তাৱপৱ আমাৱ স্বামী উত্তৱেৰ পাহাড়ে দেবী শাকন্ত্ৰীৰ শৱণাপন্ন হল ও আমি পুত্ৰসন্তান লাভ কৱি। তুমিও দেবীৰ শৱণ নিলে তাঁৰ কৃপা লাভ কৱবে। সন্তানেৰ মা হতে পাৱবে।

পৱদিনই সুলেখনী তাঁৰ স্বামীকে নিয়ে চললেন শাকন্ত্ৰী তীৰ্থেৰ দিকে। একসময় পথশ্ৰমে ক্লাস্ত হয়ে ‘জল জল’ কৱে আৰ্তনাদ কৱতে লাগলেন। এমন সময় গভীৱ বনেৱ

ভিতর থেকে কে যেন বলল, কষ্ট করে আর একটু গেলেই ঝরনা দেখতে পাবি। সেই
ঝরনার জল পান করলে তোদের শরীর সুস্থ হয়ে যাবে।

এগিয়ে যেতেই তারা সেই ঝরনার সন্ধান পেল। সেখানে তখন অনেক সাধু-সন্ন্যাসী
তপস্যা করছিলেন। এইভাবে পাঁচ-ছয় দিন দেবীর ধ্যানে মগ্ন থাকার পর দেবী শাকন্তরী
একটি নয়-দশ বছরের মেয়ের রূপ ধরে দেখা দিয়ে বললেন, আমিই দেবী শাকন্তরী।
তোরা যাঁর ধ্যান করছিস, আমিই সেই। কী চাস বল?

দু'জনেই বিড়ল হয়ে বললেন, আমাদের কোনও সন্তান নেই। আমরা সন্তান চাইছি।

দেবী তখন বললেন, তা এইজন্য এত দূরে আসতে গেলি কেন? যে কোনও মাসের
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী অথবা চতুর্দশীতে আমার ব্রত করলে ফল পাবি। যা ঘরে ফিরে
যা। অবশ্যই ফল পাবি।

এক রাতে সুলেখনী স্বপ্ন দেখলেন দেবী তার ব্রতে প্রসন্ন হয়ে একটি ফল খেতে
দিচ্ছেন। স্বপ্ন ভাঙার পর সত্যি সত্যিই তিনি একটি ফল পেলেন এবং সেটি খাওয়ার
পর তাঁর গর্ভে সন্তান এল। তিনি পুত্রের মা হলেন। মা শাকন্তরীর এইরকম আরও অনেক
মাহাত্ম্য শোনা যায়। গোবিন্দপুর নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে জয়বন্ত নামে জনৈক
বৈশ্য বাস করত। সকলেই তাঁকে শৌজি নামে সম্মোধন করত। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল
শ্রীয়া। তাদের অনেক টাকা ছিল। কিন্তু কোনও কন্যা সন্তান ছিল না। কন্যার অভাবে
শ্রীয়া প্রায়শই ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

একদিন শেঠজির সঙ্গে বাজারের মধ্যে একজন সাধুর দেখা হয়ে গেল। সাধু তাঁর
অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে অশ্বস্ত করে বললেন, আমি এর উপায় বলে দেব। শেঠজি
বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে সব কথা জানালেন।

অন্যদিকে শেঠজির এক ছেলে অত্যন্ত দুরাচারী হয়ে উঠেছিল। একদিন সে প্রচুর
ধনরত্ন চুরি করে দেশত্যাগ করল।

স্বামী-স্ত্রী শরণাপন্ন হলেন সেই সাধুর। তিনি বললেন, তোমার ছেলে যে কাজ করেছে
তার জন্য তোমার মঙ্গল হয়েছে। কারণ, ওইসব ধনরত্ন সৎ উপায়ে অর্জিত হয়নি। এবার
তোমরা মা শাকন্তরীর শরণ নাও। দেবী নিশ্চয়ই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবেন।
এই পাপার্জিত ধনক্ষয় হলেই ছেলে ঘরে ফিরে আসবে আর ব্রতের পুণ্যফলে এক পরমা
সুন্দরী কন্যার জন্ম হবে।

সাধুর উপদেশমত শেঠ জয়বন্ত রায় এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীয়া, দেবীর ব্রত করে ছেলেকে
ফিরে পান এবং শ্রীয়ার গর্ভে একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়।

এই সতীপীঠে উত্তরপ্রদেশের সাহারাগপুর হয়ে আসা যায়। দূরত্ব ২৬ মাইল। নিয়মিত
বাস চলে। সাহারাগপুর চকরাতা রোড থেকে 'বেহট' হয়ে বনবিভাগের সমতল পথেও
শাকন্তরী আসা যায়। তবে এই পথে এলে পাঁচ মাইল হাঁটতে হয়। সঙ্গে চাল, ডাল
নিয়ে আসা উচিত। তাহলে খাওয়ার কষ্ট হয় না।

କୁରଙ୍କ୍ଷେତ୍ରେ ସାବିତ୍ରୀ ମା

କୋନୋ କୋନୋ ବିଦ୍ୱଜ୍ଜନେର ମତେ, ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯେମନ ଏକ, ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିଓ ତେମନ୍ହି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ । ସେଇ କାରଣେଇ ମାତୃଶକ୍ତିର ପାଶେଇ ବିରାଜ କରେନ ଭୈରବଶକ୍ତି । ଶୈବ ସାଧକେରା ଏହି ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କେ ବିଶେଷଭାବେ ଅବଗତ । ତାଁଦେର ମତେ ଶିବ ଯଥନ ଆସ୍ତ୍ର, ତଥନ ତିନି ଶିବ । ଆବାର ଯଥନ ତିନି ସପ୍ରକାଶ, ତଥନ ତିନି ଶକ୍ତି । ଶକ୍ତି ହଳ ଶିବେର ହଦୟ । ଏହି ଜନ୍ୟଇ ଶିବେର ବୁକେର ଓପର ଦାଁଡିଯେ ଥାକେନ କାଲୀ । ଶିବଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କେର ଏହି ଅପାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ବଲେଇ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ପଦ୍ଧତିତେ ଶକ୍ତିପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହୟ । ସେଇ ସୂତ୍ର ଧରେଇ ଘୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଭାଗେ ରଚିତ ହେୟଛି ତପ୍ରଚୂଡ଼ାମଣି ।

ତପ୍ରଚୂଡ଼ାମଣିତେ ବଲା ହେୟଛେ,

‘କୁରଙ୍କ୍ଷେତ୍ରେ ଚ ଗୁଲ୍ଫତଃ

ସ୍ଥାନୁ ନାନ୍ମୀ ଚ ସାବିତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟନାଥସ୍ତ ଭୈରବଃ’ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ କୁରଙ୍କ୍ଷେତ୍ରେ ସତୀର ଗୁଲ୍ଫ ପଡ଼େଛି । ସେଥାନେ ସାବିତ୍ରୀରୁପା ଦେବୀର ନାମ ସ୍ଥାନୁ, ଭୈରବେର ନାମ ଅଷ୍ଟନାଥ ।

ପୀଠ ନିର୍ଣ୍ୟ ରଚିତ ହୟ ୧୭୦୦ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ । ସେଥାନେ ଉତ୍ସିଥିତ ଆଛେ,

.....କୁରଙ୍କ୍ଷେତ୍ରେ ଚ ଗୁଲ୍ଫତଃ ।

ସ୍ଥାନୁନାମ୍ନା ଚ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବତା.... ॥’

ସେଥାନେ ବଲା ହେୟଛେ, ଭୈରବେର ‘ସ୍ଥାନୁ’ ଦେବୀ ବିରାଜ କରଛେ ସାବିତ୍ରୀରୁପେ ।

ବାଙ୍ଗଲୀ କବି ଭାରତଚନ୍ଦ୍ର ତାଁର ରଚିତ ‘ଅନ୍ନଦାମଙ୍ଗଳେ’ ବଲେଛେ,

‘କୁରଙ୍କ୍ଷେତ୍ରେ ଡାନି ପା’ର ଗୁଲ୍ଫ ଅନୁଭବ ।

ବିମଳା ତାହାତେ ଦେବୀ, ସଂବର୍ତ୍ତ ଭୈରବ ॥’

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀତେ ରଚିତ ଶିବଚରିତେ ବଲା ହେୟଛେ, କୁରଙ୍କ୍ଷେତ୍ରେ ପଡ଼େଛେ ସତୀର ଡାନ ଗୁଲ୍ଫ । ଦେବୀର ନାମ ‘ସମ୍ବରୀ’ ବା ‘ବିମଳା’ ।

ଭୈରବେର ନାମ ‘ସଂବର୍ତ୍ତ’ ।

ତବେ ତପ୍ରଚୂଡ଼ାମଣିତେ ଅନ୍ୟ ଏକଟି କ୍ଷେତ୍ରେ ‘ସ୍ଥାନୁ’କେ ତୀର୍ଥପତି ବଲା ହେୟଛେ । ସେଥାନେ ଉତ୍ସିଥିତ ଆଛେ,

‘গুল্ফং মে চ কুরঞ্জেত্রে সাবিত্রী দেবতা তথা।

অশ্বনাথো তৈরবশ্চ তত্ত্ব সিদ্ধির্ন সংশযঃ ॥’

অর্থাৎ এখানে মহাপীঠের দেবী হলেন সাবিত্রী এবং তৈরব হলেন অশ্বনাথ।

প্রস্তুকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে একাম্পীঠের তালিকায় বলেছেন, কুরঞ্জেত্রের দেবী হতে পারেন ‘সম্বরী’ বা ‘বিমলা’ মতান্তরে ‘সাবিত্রী’ এবং তৈরব হতে পারেন ‘সংবন্ধ’ বা ‘স্থানু’।

বিখ্যাত ভ্রমণ গবেষক সুলতান মামুদ পদ্বরজে এই পুণ্যভূমি দর্শন করে এসেছেন। তাঁর মতে, সতীর দক্ষিণ গুল্ফ পড়েছে কুরঞ্জেত্রে। দেবীর নাম ‘সাবিত্রী’, তৈরব ‘স্থানু’। কেউ কেউ তৈরবকে ‘থানেশ্বর’ নামে সম্মোধন করেন। শুন্দ নাম হল, ‘স্থানীশ্বর’ বা ‘স্থানেশ্বর’। তৈরব ‘স্থানু’ হলেন স্থানেশ্বরেরই দেবতা।

যেখানে নাদির শা পরাজিত করেছিলেন মোগলবাদশা মহম্মদ শাকে, সেই পাঞ্জাবের কারনালের জেলাই হল ‘থানেশ্বর’। আগে এটি ছিল পাঞ্জাবে, বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্যের অঙ্গর্ভূত।

কুরঞ্জেত্র স্টেশন থেকে আনুমানিক এক ক্রেগশ পশ্চিমে দৈর্ঘ্যান্ত তুদের তীরে এই মহাপীঠ। বেদের ব্রাহ্মণভাগে এই তীর্থের নাম পাওয়া যায়। শতরূপ ব্রাহ্মণে আছে ‘কুরঞ্জেত্রে হমী দেবা যজ্ঞং তত্ত্বতে’ (৪/১/৫/১৩) — এখানে দেবতারা যজ্ঞ করতেন। জাবালোপনিষদেও উল্লেখ করা হয়েছে, কুরঞ্জেত্র আবর্মুক্ত ক্ষেত্র। এটি হল, ব্রহ্মসদন ও দেবতাদের যজ্ঞভূমি। প্রসঙ্গত উল্লেখ, এটি আর্য উপনিষদের অন্যতম আদি স্থান। উত্তরে বয়ে চলেছে দৃশ্যদ্বীপ ও দক্ষিণে সরস্বতী। একদা এর মাঝের জায়গাটিকে ব্রহ্মার্থ প্রদেশ বলা হত। বৈদিক দৃশ্যদ্বীপ নদী বর্তমানে ঘাঘরা নদী নামে পরিচিত। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে, সরস্বতী নদীর তচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্মা বেদী স্থাপন করে প্রথম যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। সেই সময় থেকে এই জায়গাটি পুণ্য ব্রহ্মবেদী হিসাবে পরিচিত।

মহাভারতের শল্য পর্বে বলা হয়েছে, কুরং নামে এক রাজর্ষি এই পবিত্র ক্ষেত্রে স্বয়ং হাতে চাষ করে একটি অনন্য যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। কুরবাজার নাম থেকেই এই জায়গা কুরঞ্জেত্র নামে পরিচিত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে জানা যায়, ব্রহ্মসহ দেবতারা, মুনি ঋষি, সিদ্ধচারণ ও গক্ষবর্বা সবসময়েই এই তীর্থের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং সেবা করেছেন।

মহাভারতের বনপর্বে তীর্থ্যাত্মা অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ‘হে রাজশ্রেষ্ঠ! তারপরে সর্বতোভাবে প্রশংসিত কুরঞ্জেত্রে যাবে। যেখানে দর্শনমাত্রেই সকল প্রাণী পাপ থেকে মুক্ত হয়। আমি কুরঞ্জেত্রে যাবো এবং কুরঞ্জেত্রে বাস করবো—এমন কথা যে সর্বদা বলে সেও পাপ থেকে মুক্ত হয়। কুরঞ্জেত্রের ধূলিকণাযুক্ত বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হয়ে পাপিষ্ঠ লোকেরও উত্তম গতি হয়ে থাকে। সরস্বতীর দক্ষিণ ও দৃশ্যদ্বীপের উত্তরে এই কুরঞ্জেত্র স্থানে যারা বাস করে তারা স্বর্গে থাকে।’

কুরঙ্গফ্রের সমগ্র এলাকার মোট আয়তন কত? কারও কারও মতে, চুরাশি যোজন। হেমচন্দ্র বলেছেন, এখানকার আয়তন দ্বাদশ যোজন বা ৪৮ ক্রেশ। এখানকার মাটির রঙ লালচে। খুব শক্ত। স্থানীয় পাণুদের অনুমান, কুরং-পাণুবদের যুদ্ধ হওয়ার জন্য রক্তে মাটি লাল হয়ে গেছে। সমস্যা হল, এখানে তেমন কোনও ফসল হয় না। কারণ, জমি খুবই অনুর্বর।

ষড়বিংশতি শাক্তপীঠ হল, মনিবেদ—মতান্তরে কেউ বলেছেন, মণিবেদিক, আবার কারও মতে, মানবেদক। এ-বিষয়ে পীঠ নির্ণয়ে বর্ণনা করা হয়েছে,

‘....মণিবেদকে।

মণিবক্ষে চ গায়ত্রী সর্বানন্দস্ত ভৈরবঃ ॥’

অর্থাৎ মণিবেদকে পড়েছে কজি, দেবীর নাম ‘গায়ত্রী’, ভৈরবের নাম ‘সর্বানন্দ’।

মণিবেদ সম্পর্কে কবি ভারতচন্দ্র রায় তাঁর অনন্দামঙ্গল লিখেছেন,

‘মণিবেদে মণিবক্ষ পড়িল তাঁহার।

স্থানু নামে ভৈরব সবিত্রী দেবী তাঁর ॥’

ভৈরবের নাম ‘স্থানু’, দেবীর নাম ‘সাবিত্রী’। কিন্তু এই মণিবেদের জ্যাগাটি সম্পর্কে কেবল কিছু জানা যায় না। পীঠ নির্ণয়ে ‘মণিবক্ষ’ বলে কোনও শব্দের সঙ্গান পাওয়া যায় না, আছে ‘মণিবেদক’ বা ‘মণিবেদ’।

থানেশ্বরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে একটি জ্যাগায় অভিমন্ত্যুসপ্তরথী দ্বারা নিহত হয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়। এ প্রসঙ্গে কানিংহাম বলেছেন, অভিমন্ত্যু ক্ষেত্রকেই সংক্ষেপে ‘অমিন’ বলা হয়। থানেশ্বরের আট মাইল পশ্চিমে ‘ডোর’ নামক জ্যাগায় অর্জুন সাত্যকিকে বাঁচানোর জন্য অন্যায়ভাবে ভুরিশ্বার বাহু ছেদন করেন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য সুদর্শনচক্র ধারণ করেছিলেন সেই জ্যাগাটি ‘ক্রক্তীর্থ’ নামে পরিচিত। যে জ্যাগায় কুরঙ্গফ্রে যুদ্ধে নিহত অসংখ্য বীরকে সৎকার করা হয়েছিল সেটি ‘অস্থিপুর’ নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

পাণু বংশের শেষ রাজা ক্ষেমক নরপতি থাকার সময় পর্যন্ত কুরঙ্গফ্র চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধিকারে ছিল। পরে কান্যকুজাধিপতির দখলে আসে। বৌদ্ধযুগে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে স্থানেশ্বরে (থানেশ্বর) প্রভাকরবর্ধন রাজত্ব করতেন। এ-কথা জানা যায়, সমুদ্রগুপ্তের লৌহস্তুরের বর্ণনার মাধ্যমে। হিউ-এন-সাং কুরঙ্গফ্রে থানেশ্বর (মতান্তরে স্থানীশ্বর) দেখতে আসেন। তখনও থানেশ্বরের চারপাশের ১৬ ক্রেশ স্থান ‘ধর্মক্ষেত্র’ নামে অভিহিত হত। তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন, কুরঙ্গফ্রে মৃত বীরদের অস্থি তিনি দেখেছেন। থানেশ্বরের আধমাইল উত্তরে ‘স্থানু’ নামে মহাদেবের মন্দির আছে। একাদশ শতকে অল্বেরুণির দেওয়া তথ্যানুযায়ী এই ভীরুর বিশেষত ‘গ্রহণ’-এর সময়ে অনেক যাত্রীরা আসতেন।

থানেশ্বরের পূর্ব-দক্ষিণে কুরঙ্গফ্রের অন্তর্গত সমস্তপঞ্চক তীর্থ নামে দৈপায়ন হুদের

দূরত্ব আধমাইল দক্ষিণে। হুদের উত্তরদিকে বড় বড় অসংখ্য আমগাছ আছে। হুদটির দৈর্ঘ্য প্রায় আধ মাইল, চওড়ায় কম। দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ৩৫৪৬ ফুট, প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে ১৯০০ ফুট। এই হুদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি দ্বীপ আছে। এরই নাম দৈপায়ন হুদ।

এই দ্বীপের পশ্চিমদিকে ‘চন্দ্ৰকৃপ’ নামে একটি পবিত্র কুণ্ড আছে। চন্দ্ৰগ্রহণের সময় এই কুণ্ডের পবিত্র জল স্পর্শ করার জন্য অনেকে এখানে আসেন। এর অপর নাম ‘রামহুদ’। কথিত আছে, পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করার পর হুদের জলে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেছিলেন। এই হুদের তীরে বসে ব্ৰহ্মা তপস্যা করেছিলেন বলে এর অন্য আরেক নাম ‘ব্ৰহ্ম সৱাঃ’। ইন্দ্রের অনুরোধে দধীচি মুনি এখানে আঞ্চলিক মন্দির করেন। তাই অনেকে এই জায়গাকে ‘দধীচি তীর্থ’ বলে অভিহিত করেন। এখানেই দুর্ঘাটন মায়া স্তুত করে লুকিয়েছিলেন।

হুদের উত্তর ও পশ্চিম পাড়ে কয়েকটি বাঁধানো ঘাট আছে। অনেকে এখানে পুজো ও শ্রান্নাদির কাজ করেন। হুদের পাড়ে রয়েছে অনেক দেবদেবীর মন্দির। উত্তর পাড়ে রয়েছে ভৈরব অঞ্চলান্থ লিঙ্গের মন্দির। পশ্চিম পাড়ে রয়েছে পীঠেশ্বৰী সাবিত্রী দেবীর মন্দির। ওপরে উঁচু মঠ। শিখদের অভূদয়ের সময়ে কুরক্ষেত্রে তীর্থ ও দেবমন্দিরগুলি পুনৰুদ্ধার করা হয়।

মাধবাচার্যের ‘কুরক্ষেত্র মাহাত্ম্য’ গ্রন্থ অনুযায়ী জানা যায়, কুরক্ষেত্রের সীমার মধ্যে ৩৬৫টি তীর্থ আছে। থানেশ্বরের কাছে কন্যাদ্বার, সোমতীর্থ, দৈপায়ন, রামতীর্থ-রামহুদ, স্থানীশ্বর পঞ্চবটী অন্যতম। এছাড়াও রয়েছে, অমৃতকৃপ, অগ্নিতীর্থ, অবানা সঙ্গম, ইন্দ্ৰবারি, কাম্যবন, কৌবের তীর্থ, কৌশলি সঙ্গম, দধীচি তীর্থ, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্থ, যষাতিতীর্থ, বিষ্ণুপদতীর্থ।

দেবীপুরাণে (৩৭/৩০) উল্লেখ আছে, নিখিল অমরগণ যজ্ঞে সেই বিশুদ্ধভাব স্বরূপা দেবীকে পূজা করে থাকেন, তাই তাঁকে সকলে ‘সাবিত্রী’ বলেন। অগ্নিপুরাণে (২১৬/২) বলা হয়েছে, গায়মান গুরু যেহেতু শিষ্য, ভার্যা ও প্রাণ—সবাইকে ত্রাণ করেন, তাই তাঁর নাম ‘গায়ত্রী’। যেহেতু তিনি সবিতাকে প্রকাশ করেন, তাই তার নাম ‘সাবিত্রী’। বাক্ৰপিনী বলে তাঁর অন্য নাম ‘সরস্বতী’। স্কন্দপুরাণের আবস্ত্য রেখাখণ্ডে (২০০/৩) বলা হয়েছে, এঁর তেজ সাবিত্র অর্থাৎ সূর্যসদৃশ, তাই তিনি সাবিত্রী।

অগ্নিপুরাণের ব্রাহ্মণ প্রশংসা নামাধ্যায়ে আছে, তিনি সর্বলোক প্রসব করেন, তাই তিনি হলেন ‘সবিতা’। এই সবিতা যাঁর দেবতা, তিনিই সাবিত্রী বা যিনি নিখিল বেদ প্রসব করেছেন, পঙ্গিতেরা তাঁকেই সাবিত্রী আখ্যা দেন।

দেবী ভাগবতে (৯/৩৮/৯৫) আছে, যিনি সূর্যমণ্ডলাত্মক সবিতার অধিদেবী, যিনি গায়ত্রী মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যিনি বেদের প্রসবকর্তা, তিনিই ‘সাবিত্রী’ নামে চিহ্নিত হয়ে আছেন। সেখানে আরও বলা হয়েছে, সৃষ্টির সময়ে পৰাপ্রকৃতি দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও রাধা—এই পঞ্চমূর্তিতে আবিৰ্ভূত হন। সাবিত্রী চার বেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দঃ সমূহের

মাতৃস্বরূপা। তিনি ব্রাহ্মণদির ব্রাহ্মণস্থানি জাতিরূপিণী, জপরূপা ও তাপসী। তিনি ব্রহ্মণ তেজ ও সর্বপ্রকার সংস্কারস্বরূপা। তিনি ব্রহ্মার প্রিয়া পবিত্ররূপা সাবিত্রী ও গায়ত্রী। তীর্থগণও আত্মশুন্দির জন্য তাঁর স্পর্শ প্রার্থনা করে। স্বয়ং নারায়ণ সাবিত্রী প্রসঙ্গে নারদকে বলেছেন,

‘শুন্দস্ফটিকসঞ্চা শুন্দস্তস্বরূপিণী ।
পরমানন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী ॥
পরমব্রহ্মস্বরূপা চ নির্বাণপদদায়িনী ।
ব্রহ্মাতেজোময়ী শক্তি সন্দাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥’

তাঁর বর্ণ শুন্দ স্ফটিকের মতো, তিনি শুন্দ সন্তস্বরূপিণী। তিনি পরমানন্দস্বরূপিণী, সর্বশ্রেষ্ঠা ও সনাতনী। তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপিণী ও মুক্তিপদ প্রদায়িনী। তিনি ব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও ব্রহ্মাতেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ব্রহ্মার স্তুবে প্রসন্না হয়ে সাবিত্রী তাঁকে পতিরূপে বরণ করেন। মদ্রদেশের মহারাজা অশ্বপতি এই স্তুব পাঠ করে সাবিত্রী দেবীর দর্শন ও অভীষ্ট বর পেয়েছিলেন। দেবী ভাগবতে আছে, স্বয়ং নারায়ণ, নারদকে বলেছেন, বেদমাতা সাবিত্রীকে প্রথমে ব্রহ্মা, পরে দেবগণ ও তারপরে জ্ঞানীরা পুজো করেন। তারও পরে ভারতবর্ষে মহারাজ অশ্বপতি তাঁর অর্চনা করেন। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ—এই চার বর্ণের মানুষজন তাঁকে পুজো করেন।

রাজা অশ্বপতির স্ত্রী মালতী ছিলেন ব্রহ্মা মূলিকের বশিষ্ঠের পরামর্শে তিনি সাবিত্রীর আরাধনা করেন। দীর্ঘদিন আরাধনার পরেও যখন কোনও ফল হল না, তখন মহারাজ পুষ্করতীর্থে গিয়ে একশো বছু সংযুক্ত মনে তপস্যা করতে থাকেন। একসময় আকাশবাণী হয় দশলক্ষ বার গায়ত্রী জপ করতে। ওই সময় মহর্ষি পরাশর সেখানে উপস্থিত হয়ে, মহারাজকে গায়ত্রী জপের বিধি, সাবিত্রী জপবিধি, সাবিত্রী ব্রত বিধি, সাবিত্রীর ধ্যান ও স্তুব সম্পর্কে উপদেশ দেন। অশ্বপতি অক্ষরে অক্ষরে সেই বিধি অনুযায়ী জপে মগ্ন হন। একসময় তিনি দেবীর দর্শন লাভ করেন এবং সাবিত্রীর মতো কন্যারত্ন লাভ করেন। ‘সাবিত্রী’র নামানুসারে মেয়ের নাম রাখেন সাবিত্রী। এই সাবিত্রীই এ-জগতে সত্যবানের স্ত্রী হিসাবে পরিচিত।

সাবিত্রীর ধ্যানে বলা আছে, ‘যাঁর বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনতুল্য, যিনি ব্রহ্মাতেজে প্রজ্জ্বলিতা, যাঁর প্রভা গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নকালীন সহস্র সহস্র সূর্যের মতো, যাঁর মুখমণ্ডল মৃদুহাস্যে ভরা ও প্রসন্না, যিনি রত্নবসনে ভূষিতা, যিনি বহু বিশোধিত বস্ত্র পরিহিতা, যিনি ভক্তদের অনুগ্রহ করার জন্য সাকার মূর্তি ধারণ করেন, যিনি সুখ ও মুক্তিদায়িনী, যিনি শাস্তা, যিনি জগতের বিধানকর্তা ব্রহ্মার ভার্যা, যিনি সর্বসম্পদরূপিণী এবং সর্বসম্পদ প্রদায়িকা, যিনি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও বেদশাস্ত্ররূপিণী, সেই বেদবীজ অর্থাৎ প্রাণস্বরূপা বেদমাতা সাবিত্রীকে ভজনা করি।’

সাবিত্রী উপনিষদে সবিতা ও সাবিত্রীকে শিবশক্তি, পুরুষ প্রকৃতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, অগ্নিই সবিতা, পৃথিবীই সাবিত্রী। তাঁরা এক মিথুন। তাঁদের মিলনেই সৃষ্টি। আবার বলা হয়েছে, বর্ণই সবিতা, জল সাবিত্রী। বায়ু সবিতা, আকাশ সাবিত্রী। যজ্ঞ হল সবিতা আর ছন্দ হল সাবিত্রী। এইভাবে উভয়ের মিলনে যে সৃষ্টি হয়েছে তাই প্রতিভাত হয়েছে বিশ্বমন্থের আঙ্গনায়।

যে স্থানে ‘কুর’ ‘কুর’ অর্থাৎ ‘কর’ ‘কর’ রব প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাকেই বলে কুরক্ষেত্র। মানুষের প্রবৃত্তি সর্বদা মানুষকে কর্মে নিযুক্ত করে। তাই মানবদেহকে যৌগিক কথায় কুরক্ষেত্র বলে। সেইজন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনক্ষেত্র হল মানুষের দেহ বলে চিহ্নিত করা হয়।

প্রণব বা সাবিত্রী হলেন আকর্ষণ শক্তি, নিবৃত্তি বা আত্মাভিমুখী শক্তি। আত্মশক্তি দেহের পঞ্চকোষে পাঁচভাগে বিভক্ত। তাদের বলে পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চপ্রাণের হল পঞ্চ প্রাণ। তার মধ্যে যে অংশের মধ্যে প্রাণ, তার মধ্যেই জীবের আত্মশক্তি পূর্ণভাবে বিরাজিত। তাই জীবাত্মাকে অর্জুন বলে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সংগ্রাম হল মনের সঙ্গে প্রাণ বা হাদয়ের যুদ্ধ। জীব তার সংস্কারের জন্য প্রাণশক্তি শ্রোতকে অবরুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু জীবের সংস্কাররূপ আবরণের মধ্যে নিজের যে প্রাণশক্তি আছে তার সাহায্যেই বিরাট প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ করে। মন বা প্রবৃত্তি তা করতে দেয় না। প্রাণশক্তির আঘাতে ক্ষুর হয়ে মানসিক বৃত্তি ফুলে ওঠে। অবশ্যে এই জৈব মনের অবরোধে ভেঙে যায়। বিশ্বজননীর প্রাণশক্তিতে মিলিত হবার চেষ্টাকেই বলা হয়, কুর পাঞ্চবেণু মহাসম্র। তাই এই কুরক্ষেত্রেই আছেন সাবিত্রী মা, যিনি বেদ মাতা এবং প্রণব।

যাতায়াতের ব্যবস্থা :

দিল্লি থেকে আম্বালা জংশনের মধ্যে কুরক্ষেত্র রেল স্টেশন। দূরত্ব ১৫৬ কিলোমিটার। চট্টগড়। দিল্লি, আম্বালার সঙ্গে নিয়মিত বাস যোগাযোগ আছে।

থাকার ব্যবস্থা

পূর্ত বিভাগের বিশ্রাম ভবন, থানেশ্বর (পিপলি) বিশ্রামভবন, বিড়লা ধর্মশালা, আগরওয়ালা ধর্মশালা, কালী কমলীওয়ালা ধর্মশালা, ভারত সেবাশ্রম ধর্মশালায় থাকা যায়। ইদানীং তৈরি হয়েছে কিছু আধুনিক রঞ্চিসম্মত হোটেল।

বৈদ্যনাথধামে হৃদয় পড়েছে সতীর

পীঠনির্ণয়ের মতে সপ্তম সতীপীঠ হল বৈদ্যনাথধাম। সেখানে বলা হয়েছে,
‘হার্দ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্ত তৈরবঃ
দেবতা জয়দুর্গাস্যাত্তে’

বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘর আমাদের সকলেরই অতি পরিচিত জায়গা। দেওঘর কথার অর্থ দেবতার ঘর, যাকে হিন্দিতে বলা হয় দেওতা কি ঘর। শিবক্ষেত্র হিসেবেই এই জায়গার খ্যাতি। পুরাণে বলা হয়েছে, রাবণ শিবের খুবই ভক্ত ছিলেন এবং নিয়মিত শিবপুজো করতেন। রাবণের শিবপুজো দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন শিব। বললেন, রাবণ, তুমি বলো কি বর চাও? প্রত্যন্তের রাবণ বললেন, তাহলে চলুন আমার সঙ্গে লক্ষ্য। শিব বললেন, তথাস্ত। যেখানে নামাবে, সেখানেই আমি থাকব স্থির হয়ে। যাত্রাপথে নামাতে পারবে না কোথাও। শর্ত মেনে নিলেন রাবণ। রাক্ষসরাজ মাথায় নিয়ে চললেন শিবকে। তা দেখে দেবতারা তো চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে শিবকে লক্ষ্য নিয়ে চলে যাবে রাবণ!

রাবণ যখন শিবকে মাথার ওপর তুলতে যাচ্ছেন, তখন পার্বতীর পরামর্শে আচমন করেছিলেন। সেই আচমনের সময় বরঞ্জদেব চুকে পড়লেন। রাখণের পেটে। ফলে হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। বৈদ্যনাথধামে পৌছানোর মুহূর্তে প্রসাব পেয়ে গেল রাখণের। রাবণ তো ভেবে অস্তির। কি করবে এখন? এমন সময় রাখণের বেশে সেখানে এসে দাঁড়ালেন বিষ্ণু। রাখণের ধারণা হল, রাখণের হাতে দিয়ে প্রসাব করা যেতে পারে। তাহলে আর শর্ত অনুযায়ী মাটিতেও নামালো হল না। রাখণের হাতে শিবকে দিয়ে রাবণ প্রসাব করতে গেলেন। কিন্তু প্রসাব আর শেষ হয় না। এদিকে শিবকে মাটিতে রেখে বিষ্ণু চলে গেলেন।

প্রসাব সেরে শৌচ করে এসে রাবণ দেখলেন রাখণ শিবকে মাটিতে রেখে কোথায় চলে গেছেন। অনেক টানাটানি করেও শিবকে মাটি থেকে ওঠাতে পারলেন না রাবণ। স্তব, স্তুতি করেও কোনও ফল হল না। অগত্যা শিবের স্নানের জন্য একটা কুয়ো তৈরি করে রাবণ চলে গেলেন লক্ষ্য।

পুরাণের মতে, সেই থেকেই শিব রয়েছেন বৈদ্যনাথধামে। অনেকদিন তিনি পড়েছিলেন

গভীর অরণ্যে। সেখানে বৈজু নামে একজন গোয়ালা থাকত। শিব একদিন তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি এই জঙ্গলে পড়ে আছি। তুমি আমার পুজো করো।' বৈজু খুঁজে বের করলেন শিবকে। ফলমূল দিয়েই তিনি পুজো করেন তাঁর আরাধ্য দেবতাকে। পাত্রের অভাবে তিনি মুখে করে জল এনে দেন শিবকে, যা দেবাদিদেবের একেবারেই পছন্দ নয়। অথচ বৈজুর অপরাধ নিতে পারেন না। কারণ, তাঁর মনে কোনও পাপ নেই। বাধ্য হয়ে মহাদেব স্বপ্নে দেখা দিলেন রাবণকে। রাবণ তখন পঞ্চতীর্থের জল এনে শিবের অভিষেক করলেন। বাকি জল ঢেলে দিলেন কুয়োর মধ্যে। সেই থেকে এই পবিত্র জলেই শিবের পুজো হয়।

বৈজুর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন শিব। বৈজু বললেন, আমার কোনও অভাব নেই। কি চাইব? একান্তই যদি বর দিতে চান তবে তা যেন এমন হয়, আপনার পুজোর আগে আমার নাম সবাই করে। রাবণের আরাধ্য দেবতা হিসেবে এখানে শিবের নাম হয় রাবণেশ্বর আর তারপর দেবাদিদেবের নাম হয় বৈজুনাথ, যা পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয় বৈদ্যনাথে।

যেখানে রাবণের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার পর শিবকে বসানো হয়েছিল সেখানেই সতীর হৃদয় পড়েছে। তাই এটি শুধুমাত্র শৈবপীঠ নয়, শাক্তপীঠও। ভৈরবের নাম বৈদ্যনাথ, সতীর নাম জয়দুর্গা।

পূর্বরেলের ট্রেনে করে জসিদি চলে গিয়ে সেখান থেকে ছেনে, টঙ্গা বা অন্যান্য যানবাহনে যেতে পারেন বৈদ্যনাথধার্মে। শিবগঙ্গায় স্নান করে দেবীদর্শন করার রীতি রয়েছে।

pathayon.net

পঞ্চসাগরে বারাহী

পীঠনির্ণয়ের ক্ষেত্রে চৌক্রিক স্থানে উল্লিখিত আছে এই পীঠস্থানের কথা। সেখানে বলা হয়েছে, ‘অধোদন্ত মহারংশো বারাহী পঞ্চসাগরে’। কথিত আছে, এখানে দেবীর অধোদন্ত পঙ্ক্তি পড়েছে। দেবী নাম ‘বারাহী’ এবং ভৈরবের নাম ‘মহারংশ’। শিবচরিতে দেবীর বর্ণনা করা একাদশ পীঠ হিসেবে। তত্ত্বচূড়ামণিতে এর কোনও উল্লেখ নেই। দেবীভাগবত, কুজিকা তত্ত্বেও পঞ্চসাগরের কোনও উল্লেখ নেই।

ভারতচন্দ্র তাঁর লেখা অনন্দামঙ্গলে বলেছেন,

‘পঞ্চসাগরেতে পড়ে অধোদন্তসার।

মহারংশ ভৈরব বারাহী দেবী তাঁর ॥’

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, বাস্তবে পঞ্চসাগর কোনও সাগর নয়। ছোটো ছোটো পাঁচটি কুণ্ড। এবং হরিদ্বারের কাছেই এই পীঠস্থান। অন্য মতে, মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের তিন কিলোমিটার দূরে কোটিতীর্থের কাছে পঞ্চনদীর সঙ্গমে যে মন্দির আছে সেখানেই দেবীর অধোদন্ত পড়েছে। গৌড়ীতত্ত্বের পরিশিষ্টে এর উল্লেখ আছে। কাহিনীর মাধ্যমে জানা যায়, বিরাট নান্নী দেবী অভিশপ্তা হয়ে দেব ত্রদ নামে এক তীর্থ পরিবেষ্টন করে পূর্বদিকে বিরাজ করছেন। সেখানে নাকি সারাদিন ধীরত সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। অর্থাৎ এই জায়গাটি দেশের পূর্বদিকে ওড়িশাতেও হচ্ছে পারে। ভিন্নমতের মানুষজনের মতে, জায়গাটি ওড়িশার ময়ুরভঙ্গে।

উজ্জয়িনীতে মঙ্গলচণ্ডিকা

পীঠনির্ণয়ের মতে ত্রয়োদশ শক্তিপীঠ আছে উজ্জয়িনীতে। সেখানে বলা হয়েছে,

‘উজ্জয়িন্যাঃ কূর্পরশ্চ মঙ্গল্য কপিলাম্বুর।

তৈরব সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ॥’

অর্থাৎ উজ্জয়িনীতে তৈরব হলেন কপিলাম্বুর এবং দেবী হল মঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডিকা।

ইতিহাস এবং সাহিত্যে বারবার স্থান করে নিয়েছে উজ্জয়িনী। একদা অবস্তু বা পশ্চিম মালবের রাজধানী এখানে ছিল। বর্তমানে এই জায়গার নাম উজ্জইন। স্থান পশ্চিম ভারতের গোয়ালিয়রে। এখানে তৈরবের নাম মহাকাল। বলা হয়, ভারতের দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গের অন্যতম হলেন তিনি। কারও কারও মতে, এখানকার পীঠদেবীর নাম হরমিদ্ধি। তিনি ছিলেন বিক্রমাদিত্যের আরাধ্যা দেবী। মহাকাল মন্দিরের কাছে রংস্রসাগরের তীরে হরমিদ্ধি দেবীর প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে দেবীর কোনও প্রাকৃত মূর্তি নেই, শ্রীখণ্ডীকে প্রতীকী হিসেবে পুজো করা হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, অতি প্রত্যুষে নাকি সদ্য মৃত্যু হওয়া মানুষের ভস্ম শাশান থেকে সংগ্রহ করে মহাকালের গায়ে লেপন করা হয়।

তন্ত্রবচনের নানা পাঠান্তর আছে—কেউ বলেন, উজ্জয়িন্যাঃ কূর্পরশ্চ। আবার কেউ বলেন, উজ্জয়িন্যাঃ কূর্পরশ্চে। এছাড়া কারও ভাষ্য, উজ্জয়িন্যাঃ কূপরশ্চ।

অন্নদামঙ্গলে বনা হয়েছে,

‘উজ্জানীতে কফেনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।

তৈরব কপিলাম্বুর শুভ যাঁরে সেবি ॥’

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

‘দূরে বহুদূরে

স্বপ্নালোকে উজ্জয়িনীপুরে

খুঁজিতে গেছিনু কবে শিশ্রা নদীপারে

মোর পূর্ব জন্মের প্রথম প্রিয়ারে।

মুখে তার লোঁধরেণু লীলাপন্থ হাতে,

কর্ণকূলে কুন্দকলি কুরুবক মাথে,

তনুদেহে রসম্বর নীবীকন্দে বাঁধা,
চরণে নৃপুরখানি বাজে আধাআধা ।

বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে ।

মহাকাল মন্দিরের মাঝে—

তখন গভীর মন্ত্রে সন্ধ্যারতি বাজে ।
জনশূন্য পণ্যবীথি, উর্ধ্বে যায় দেখা,
অঙ্ককার হর্ম্য 'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা '

ভারতচন্দ্র উজ্জয়লিনী না বলে 'উজানী' বলেছেন। এই উজানী বর্ধমান জেলার কোগ্রামে অবস্থিত। এখানেই জন্মেছেন মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত শ্রীমত্ত সদাগর। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম ঘোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মঙ্গলচণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

এই জায়গাটির বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার বলেছেন, 'Am (ANNADA MANGAL) seems to refer to Ujani or Kogram in the Burdwan District, although Ujjaini (modern Ujjain) in the early list of pithas must be identified with famous city or Avanti or West Malwa, now lying in Gwalior state in West India'.

প্রচলিত আছে, উজানীতে সতীর কফোনি বা কন্টু পড়েছে। পীঠদেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলাশ্বর।

শিবচরিতেও উল্লেখ আছে, এখানে দেবীর কন্টুই পড়েছে।

কেতকাদাস ও বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলে উজানীর উল্লেখ আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গলা ভাষার অভিধান' বইতে এই সতীপীঠের ঠিকানা দেওয়া আছে কোগ্রাম।

কুনুর ও অজয়ের সংযোগস্থলে রয়েছে কোগ্রাম। সহানীয় বাসিন্দারা দেবীকে বলেন সর্বমঙ্গল। মন্দির রয়েছে অজয় নদের তীরে। দেবী দশভূজা সিংহবাহিনীর মূর্তিটি অষ্টধাতুর। দেবীর বাঁদিকে আছেন ভৈরব কপিলাশ্বর। লিঙ্গমূর্তি পাথরে তৈরি। কোনও গৌরীপট নেই। দুর্গাপুজোর সময় এখানে খুব বড় একটি মেলা বসে। ভৈরবের পাশে রয়েছে একটি ভাঙা বুদ্ধমূর্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সন্তবত পাল যুগের।

অনেক পাণ্ডিতের মতে, 'ওডিয়ান মঙ্গলকোট'-এর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হল এই উজানী। এখানে শক্তিতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের এক ব্যতিক্রমী সম্মেলন ঘটেছে।

চৈতন্যদাস রচয়িতা লোচনদাসের বাড়ি এই গ্রামে। অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বাইরে বাইরে কাটানোর পর যখন তিনি শ্বশুরবাড়িতে আসেন তখন ঠিকমতো পথ চিনতে পারেননি। পথে এক যুবতীকে তাঁর শ্বশুরের নাম জিজ্ঞেস করে বলেন, মা ওখানে যাবার পথ বলে দিতে পারো? যুবতীর নির্দেশিত পথে তিনি শ্বশুরবাড়িতে পৌছান। রাতে স্ত্রীকে দেখে চমকে ওঠেন। কারণ, সকালে তাকেই মা বলে ডেকেছেন। পরের দিন সকালেই

তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। ক্ষুক স্ত্রী লোচনের গ্রামের নাম দেন কু-গ্রাম। লোচনদাস একটু পরিবর্তন করে নাম দেন, কোগ্রাম।

বর্ধমান থেকে বাসে নৃতন হাটে যাওয়া শায়। তারই প্রাণ্তে বয়ে চলেছে ছেট্ট কুনূর নদী। খেয়াতে নদী পার হলেই কোগ্রামে যাওয়া যাবে। এছাড়া গুসকরা স্টেশন থেকে উজানীর দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার।

pathagar.net

অমরনাথে শাক্তপীঠ

পীঠনির্ণয়ের মতে চতুর্থ সতীপীঠ রয়েছে অমরনাথে। সেখানে বলা হয়েছে,
কাশীরে কঠদেশশ ত্রিসঙ্গেশ্বর তৈরব।
মহামায়া ভগবতী গুণবতীত বরপদ॥

অর্থাৎ কাশীরে পড়েছে সতীর কষ্ট। দেবীর নাম মহামায়া, তৈরব ত্রিসঙ্গেশ্বর। সমুদ্রতল
থেকে ১২৭২৯ ফুট উঁচুতে রয়েছে অমরনাথ গুহা। তুষারলিঙ্গের পাশে ছোট ডিস্কার্তি
যে বরফপিণ্ড আছে তিনিই হলেন মহামায়া। শ্রাবণী পূর্ণমায় হাজার হাজার যাত্রী দর্শন
করেন অমরনাথকে। একই সঙ্গে দর্শন করেন দেবী পার্বতীকে।

যোড়শ শতাদীতেও ধারণা ছিল না, অমরনাথ একটি শাক্তপীঠ।

আবুল ফজল তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন, ‘মহামায়াকে লোকে বলে শিবের পত্নী।
... তাঁর সেই বিখ্যিত দেহখণ্ডলি ছড়িয়ে আছে দেশের চার অংশে। মস্তিষ্ক ও অন্যান্য
কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পড়েছে কামরাজের কাছে উত্তর কাশীরের পর্বতশীর্ষে। লোকপ্রবাদে অঙ্গের
এই অংশগুলিকেই শারদা বলা হয়।’

শারদার আধুনিক নাম শার্দি। শারদা পরিচিত শক্তি হিসেবেও। এই পথ অতি দুর্গম।
সোপোর হয়ে গেলে শ্রীনগর যাবার পথ প্রায় ১৩ মাইল। সেখানকার পাহাড়ে থাকেন
সক্ষর জাতের মানুষ। গণেশগিরি বা গণেশঘাট হল শারদাপীঠের আসল নাম। বৌদ্ধ
কাশীরের চিন্তাধারা পাল্টানোর উদ্দেশ্যে শক্তরাচার্য প্রথম এই তীর্থে এসেছিলেন। কথিত
আছে, শারদামন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করলে দেবী নাকি তাঁকে সেখানে চুক্তে নিম্নে
করেছিলেন। কারণ, শক্তরাচার্য যৌনজ্ঞান লাভের জন্য এক মৃত রাজার দেহের মধ্যে চুক্তে
নারী সঙ্গম করেছিলেন।

কাশীরের পণ্ডিতেরা শারদা মণ্ডলেই শক্তরাচার্যের সঙ্গে তর্কসভার আয়োজন করেন।
কিন্তু তাঁকে যুক্তিতর্কে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়নি। তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন বৌদ্ধ
পণ্ডিতেরা। তর্কে জয়লাভ করে শক্তরাচার্য কাশীরকে বৌদ্ধ প্রভাব থেকে মুক্ত করেন।
পুরাণে বলা হয়েছে, কাশীরের শারদা বনে শাঙ্গিল্য মুনি ত্রিশক্তি রূপে শারদা'র দর্শন

পেয়েছিলেন। শোনা যায়, শঙ্করাচার্যও শারদাপীঠের গহুর থেকে আবির্ভূতা সরস্বতী, শক্তি এবং দুর্গার সম্মিলিত রূপ দেখেছিলেন।

মূল শারদামন্দিরটি প্রাকারবেষ্টিত। মন্দিরের পিছনে উঁচু পাহাড় থেকে একটা ঝর্ণা এসে নিচে পড়েছে, যার নাম অমরকুণ্ড। প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশপথের সম্পর্কে অতীতে কারও কোনও ধারণা ছিল না। বর্তমানে পশ্চিম দিক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়।

ঐতিহাসিক কল্হনের মতে, এই মন্দিরের বয়স দু'হাজার বছরেরও বেশি। শারদা মা'র নামের ওপর ভিত্তি করে কাশ্মীরের আর একটি নাম শারদাস্থান।

মন্দিরে কোনও বিগ্রহ নেই। আছে একটি চতুরঙ্গ সিঁদুর লেপা শিলা। এই শিলা কষ্টপাথর নয়, রক্ষ। কয়েক ইঞ্চি পুরু। একসময় সেখানেও মূর্তি ছিল। অল্বিরঝী তাঁর বিবরণীতে বলেছেন, 'মহাসিঙ্গানদের পথে বোলর গিরিশ্রেণীর মধ্যে এক দারুমূর্তি, শারদা-সরস্বতী।' কাশ্মীরের একজন কবি বিল্হন একাদশ শতাব্দীতে শারদা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'রাজহংসেশ্বরীর মতো সুবিশাল মূর্তির পিছনে আছে স্বর্ণমণ্ডিত চালচিত্র। মধুমতী-গঙ্গার স্বর্ণরেণুকণায় বিদ্রোত সেই মূর্তি। তিনি জ্যোতির্ময়তা বিকীর্ণ করছেন বিশ্বভূবনের দিকে। স্ফটিক স্বচ্ছতায় নিত্য তিনি উজ্জ্বল।'

pathagar.net

বৃন্দাবনে পড়েছে দেবীর কেশজাল

পীঠনির্ণয়ের মতে দ্বাত্রিংশৎ সতীপীঠ রয়েছে বৃন্দাবনে। পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে—

‘বৃন্দাবনে কেশজাল মুমানান্নী চ দেবতা।

ভূতেশো ভৈরবস্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ ॥’

অর্থাৎ বৃন্দাবনে পড়েছে সতীর কেশজাল। দেবীর নাম ‘উমা’ এবং ‘ভূতেশ’। এই পীঠ সম্পর্কে অন্যত্র ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। যেমন—

‘বৃন্দাবনে কেশজালে কৃষ্ণনাথস্তু ভৈরব

কাত্যায়নী তত্ত্ব দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়নী ।’

কবি ভারতচন্দ্র তাঁর অনন্দামঙ্গলে লিখেছেন,

‘কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।

উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥’

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্থান হিসেবে বৃন্দাবনের পরিবর্তে দিয়েছেন কেশজালের নাম।

পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে, ‘বৃন্দাবন’ হচ্ছে অন্যতম শাঙ্কুপীঠস্থান। কিন্তু শিবচরিতে বৃন্দাবনকে ‘কেশজাল’ বললেও উপপীঠের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বৃন্দাবনে উমার মন্দির আছে যমুনার তীরে। ‘কেশিঘাট’-ই সেই পীঠস্থান। উমাবনের কাছেই আছে উমার মন্দির।

বৃন্দাবন শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে? মন্ত্রবৈবর্ত পুরাণে আছে, রাধার অনেক বৃন্দ বা সখী ছিল, যা থেকে বৃন্দাবন নামটি এসেছে। অন্য মতে, কেদোরাজের কন্যা বৃন্দা এখানে তপস্যা করে কৃষ্ণকে পেয়েছিলেন বলে এই জায়গার নাম হয়েছে বৃন্দাবন।

এই বৃন্দারই অপর নাম তুলসী, যিনি ছিলেন রাজা শুশ্কবজের মেয়ে।

পুরাণে বৃন্দাবনকে নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। ব্রজধামে তখন নানান সমস্যা চলছে। কৃষ্ণের মন্ত্রণায় নন্দরাজা ব্রজধাম ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এলেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা নাকি এক রাতে এই জায়গাটি তৈরি করেন। মথুরা থেকে মাইল দশেক দূরে বৃন্দাবনের অবস্থান। এখানে যে কত বন তার সঠিক কোনও হিসেব নেই। শোনা যায়,

এখানে আছে দ্বাদশ বন, দ্বাদশ উপবন, দ্বাদশ প্রতিবন, দ্বাদশ অধিবন, দ্বাদশ সেবাবন, দ্বাদশ তপোবন, দ্বাদশ মোক্ষবন, দ্বাদশ কামবন, দ্বাদশ অর্থবন, দ্বাদশ ধর্মবন ও দ্বাদশ সিদ্ধিবন।

বৃন্দাবনের মদনমোহনের মন্দির। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণদাসের গল্প। প্রবাদ আছে, কৃষ্ণদাস যখন পণ্ডিবোঝাই করে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন কালিয়দহ ঘাটের কাছে বালির চরে তাঁর নৌকা আটকে যায়। তিনি দিনের অক্রান্ত পরিশ্রমের পরেও যখন নৌকা নড়ানো গেল না, তখন তিনি শরণাপন্ন হলেন কৃষ্ণদাস সনাতন গোস্বামীর। সনাতন গোসাই তাঁর একমাত্র আরাধ্য মদনমোহনের কাছে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য শরণাপন্ন হলেন। নৌকা সচল হল। তাই ফেরার পথে কৃষ্ণদাস অর্জিত সব অর্থ দিয়ে দিলেন মদনমোহনের মন্দির তৈরির জন্য।

আকবরের সভাসদ রায়সিংহ তৈরি করান বৃন্দাবনের গোপীনাথের মন্দির। ভাঙা মন্দিরটি নতুন করে সারানোর ব্যবস্থা করেছেন নন্দকুমার বসু।

রায়সিংহের বড় ভাই লোনকরণ তৈরি করিয়েছেন যুগলকিশোরের মন্দির। আর রাধাবল্লভজীর মন্দির তৈরি করিয়েছেন বৈষ্ণব কবি সুরদাস।

কৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দির আর শ্রীরঙ্গজীর মন্দির তৈরি করিয়েছেন যথাক্রমে লালাবাবু আর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীচাঁদ।

কংসকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন তার নাম বিশ্রান্তিঘাট, নন্দের কন্যা যোগনিদ্বাকে কংস যে ঘাটে আছড়ে ছিলেন তার নাম যোগঘাট, কালিয়নাগের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেখান থেকে জলে নেয়েছিলেন তার নাম কালিয়দমন ঘাট। এগুলি আক্ষরিক অর্থে বৃন্দাবনের অন্যতম আকবণ।

বংশীত্তের ছায়ায় কৃষ্ণ বিশ্বা বাজাতেন। আর অক্ষয় বট—তার জন্ম কবে তা কারও জানা নেই।

নিকুঞ্জ বন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের জূলস্ত সাক্ষী। আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধারানী তখন কৃষ্ণের ভজনায় মন্ত। কালীভক্ত আয়ান। একজন গ্রামবাসী তাকে গিয়ে বলল, আয়ান দাদা তোমার রাধা নিকুঞ্জ বনে। ছুটে গেলেন স্বচক্ষে দেখবেন বলে। আয়ান দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণের দুই রূপ—অর্ধেক কালী, অর্ধেক কৃষ্ণ।

ছোট একটা মন্দির আছে বৃন্দাবনে। রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রয়েছেন দুই সখী—ললিতা ও বিশাখা। সঙ্ক্ষ্যাবেলা আরতির পরে একঘটি জল আর দাঁতন সাজিয়ে রেখে পাওয়া দরজা বন্ধ করে দেন। রাতে সেখানে কারও প্রবেশাধিকার নেই। সকালে মন্দিরের দরজা খুললে দেখা যায়, শ্যায়ার ব্যবহারের চিহ্ন তো রয়েছেই, কেউ দাঁত মেজে মুখ ধূয়ে গেছে।

বিরহময় অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ অক্রুণঘাট। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,

'একদিন অঙ্গুর ঘাটের উপরে।
 বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে—
 এই ঘাটে অঙ্গুর বৈকুঠ দেখিল।
 ব্রজবাসী লোক গোলক দর্শন পাইল॥
 এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে।
 ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে॥
 দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল।
 ভট্টাচার্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল॥

দেবৰ্ষি নারদ হাজির হলেন কংসের কাছে। কথায় কথায় জানালেন, রোহিণীর পুত্র
 বলরামই দেবকীর সপ্তম সন্তান। দেবকীর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হয়নি। যশোদার পুত্র নামে
 খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান। বসুদেব কংসের ভয়ে নিজের ছেলেকে
 যশোদার কাছে রেখে, তাঁর মেয়েকে এনে কংসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কংস তখনই
 বসুদেবকে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু নারদ অনেক বুঝিয়ে কংসকে শাস্ত করেন। কংস
 বসুদেবকে প্রাণে না মেরে তাঁকে সন্ত্রীক কারাগারে নিষ্কেপ করেন। তারপর বলরাম ও
 কৃষ্ণকে বধ করার জন্য কেশীদেত্যকে বৃন্দাবনে পাঠান।

কেশীদেত্য বৃন্দাবনে এসে অশ্বমূর্তি নিয়ে ভীষণ চিৎকাৰ করে ব্রজবাসীদের ভয় দেখাতে
 লাগল। একদিন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার সামনে এসে মুদ্রের আহান জানালেন। কেশী পদাঘাত
 করল কৃষ্ণকে। কিছুই হল না। তারপর মধুসূদন তার পা দুটি ধরে কয়েকবার শূন্যে ঘুরিয়ে
 তাকে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। জ্ঞান হারাল কেশী। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে প্রচণ্ড
 বড় হাঁ করে কৃষ্ণকে গিলে খেতে এল। কৃষ্ণ তাঁর মুখের ভিতর বাঁ হাতটি ঢুকিয়ে দিলেন।
 দমবন্ধ হয়ে কেশী মারা গেল। সেই কেশীবধের স্মরণে জায়গাটি কেশীঘাট নামে চিহ্নিত।
 এখানেই পড়েছে দেবীর কেশজাল। এই জায়গাটি বৃন্দাবনের সবচেয়ে বড় ঘাট।

আজমীরে পড়েছে সতী'র মণিবন্ধ

ষড়বিংশতি শাঙ্কপীঠ হল; মণিবেদিক, আবার কারও মতে মানবেদক। পীঠনির্ণয়ের মতে,

‘... মণিবেদকে।

মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্বানন্দস্ত্র ভৈরবঃ ॥’

বাংলায় তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায়, মণিবেদকে পড়েছে সতী'র কঙ্গ (মণিবন্ধ), দেবীর নাম ‘গায়ত্রী’, ভৈরবের নাম ‘সর্বানন্দ’।

মণিবেদ সম্পর্কে ভারতচন্দ্র তাঁর রচিত অন্নদামঙ্গলে লিখেছেন,

‘মণিবেদে মণিবন্ধ পড়িল তাঁহার।

স্থাগু নামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥’

তিনি বলতে চেয়েছেন, ‘মণিবেদ’ নামক স্থানে সতী'র মণিবন্ধ পড়েছে। ভৈরবের নাম ‘স্থাগু’, দেবীর নাম সাবিত্রী।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রই পীঠের নাম দিয়েছেন ‘মণিবন্ধ’। তিনি লিখেছেন,

‘মণিবন্ধে বাম মণিবন্ধ অভিরাম।

সর্বানন্দ ভৈরব, গায়ত্রী দেবী নামামা।’

যার অর্থ হল, সতী'র বাম মণিবন্ধ পড়েছে মণিবন্ধে। ভৈরবের নাম ‘সর্বানন্দ’, দেবীর নাম ‘গায়ত্রী’। প্রশ্ন হচ্ছে, জায়গাটি কোথায়? কারও কারও মতে, মণিবেদকের ‘মণি’ আছে, মণিপুরে। কিন্তু মণিবেদকের মণিবন্ধের ঠিকানা হল, রাজস্থানের আজমীরে। এখানে পুষ্কর হৃদের পাড়ে আছে সাবিত্রী পাহাড়। মাটি থেকে পুষ্কর হৃদের উচ্চতা হল ১৫৩৯ ফুট। সেখানেই দেবীর অবস্থান।

পুষ্কর তীর্থ হিন্দুদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ। কাছেই রয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহাতীর্থ আজমীর শরিফ।

ঈশ্বরের কি বিচিত্র রূপ। একদিকে রয়েছেন ভৈরব সর্বানন্দ, আর দেবী সাবিত্রী। মাঝখানে পুষ্কর। বছ হিন্দু পুণ্যার্থী এখানে পিত্তপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। তারপরই রয়েছে আজমীর শরিফ। যেখানে প্রার্থনা করার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলমান মানুষজন একত্রিত হন। সাবিত্রী মন্দির আর পুষ্কর হৃদকে ঘিরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী থেকে পূর্ণমা অবধি মেলা বসে। থাকার জন্য অনেক বিশ্রামাগার, টুরিস্ট লজ আছে। যানবাহনের ব্যবস্থা বিশেষ অপ্রতুল নয়। সরাসরি দিল্লি থেকে এখানে যাওয়ার জন্য অনেক গাড়ি পাওয়া যায়।

